শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্তিকা

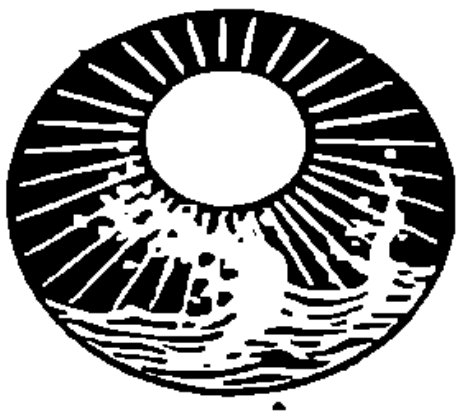

১৭৭

২১শে. ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭

150
1122/25

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭)

vol - 37

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

বসুমতী মা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৫
সাবিত্রী	শ্রীঅরবিন্দ	৭
পরাজিত রাবণ	শ্রীঅরবিন্দ	১৪
ঋষি বিশ্বামিত্রের অভিনিবেশ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১৮
কয়েকটি কবিতা	সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত	২৬
আগন্তুক	সুমিত্রা রায়	৩০
বাঘেরা	রণজিৎ সরকার	৩১
সাহস	রণজিৎ সরকার	৩২
প্রতিচ্ছবি	মীরা মুখোপাধ্যায়	৩৩
মায়ের সঙ্গে কথা		৩৪
পয়লা বৈশাখ	সত্য বসু	৪৫

পত্রিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

P. 7307

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০		২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০		৫২০·০০
বাহিরের মলাট	২০০·০০		৬০০·০০

শাখা
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by : **Nolini Kanta Gupta**
Published by : Sri Aurobindo Pathamandir
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-73
Printed by : Amiyo Ranjan Ganguli
At Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry-2

22.3.57

In this new activity
the knowledge of the past
must be illumined by the
revelation of today

With my blessings

মধুময়ী মা

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

চতুর্থ পর্যায়

(১)

সন্তকবি রামপ্রসাদ বলছেন :

মন রে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমি রৈলো পড়ে, আবাদ করলে ফলত সোণা।

সত্যসত্যই এই মানুষী দেহ এক বহুমূল্য ক্ষেত্র, তা চাষ করলে সোনার ফসল তোলা যেত। কারণ একমাত্র এই দেহেরই আছে সেই বিশেষ সৌভাগ্য—স্বয়ং পরম ভগবানের সোনার স্পর্শ জড়ায়তনে পাবার এবং তা ধারণ করবার, পোষণ করবার সৌভাগ্য। ভগবানের এই জড়-রূপায়ণ, রূপান্তরের পরম যাদু এক, একমাত্র দেহ যার অধিকারী। ভগবানের সঙ্গে মিলনের অন্যান্য আরও সব রূপ আছে—চেতনার বিভিন্ন রূপ, মনের, প্রাণের সূক্ষ্ম প্রত্যক্ষের, চিন্তার, ভাবাবেগের এমনকি ইন্দ্রিয়বোধেরও—তাদের প্রত্যেকটিই আনন্দঘন কিন্তু অপ্রাকৃত, জড়রূপে প্রকট নয়। এমনকি দেহ ব্যতিরেকেই তাদের অনুভব ও উপলব্ধি করা যায়, তারা সত্য ও বাস্তব তাদের নিজস্ব অধিকারে। কিন্তু দেহ নিয়ে আসে একটা নূতন উপাদান, সম্পূর্ণ বিভিন্ন পর্যায় এক। তা বস্তুকে জীবন্ত করে ধরে, জড়রূপে বাস্তব সত্য করে তোলে। মানুষী দেহের আছে এই অদ্ভুত স্পর্শের ধর্ম---দৈহিক সংস্পর্শ—যা মৃত (জড়)-কে করে তোলে জীবন্ত—মৃতং কঞ্চন বোধয়ন্তি (ঋগ্বেদ)। আমরা জানি বাইবেলের বাণী "পিঠার প্রমাণ তার ভক্ষণে"। এই ভক্ষণ-ক্ষমতা একমাত্র দেহেরই বিশেষ অধিকার। কেবল দেহই পারে এ প্রমাণ দিতে যা বস্তুকে প্রত্যক্ষ স্পর্শগোচর সত্য করে তোলে। রামপ্রসাদ কেন উচ্চারণ করেছিলেন সেই বাক্য...সভ্য শ্রুতির কাছে কিছু কর্কশ এবং গ্রাম্য অশালীন ভাষাতেই—"এবার কালী, তোমায় খাব।...তরকারী বানায়ে খাব।"

ভক্তিতে আনন্দ আছে, আত্মসমর্পণে আনন্দ আছে, প্রেমে আছে উল্লাস কিন্তু কোথায় মেলে শারীর আলিঙ্গনে যে একান্ত একাত্মতা তার অবর্ণনীয় অপূর্ব আস্বাদ—যেমন ধর শ্রীরাধার অভিজ্ঞতায় ?

শ্রীরাধা হলেন মানুষের সঙ্গে ভগবানের পরম একাত্মতার মূর্তরূপ, অথবা বলা যেতে পারে মানুষী আধারের উপাদানের মধ্যে ভাগবতপুরুষের আত্মনিলীন হয়ে যাওয়া। রাধা বলছেন : তাঁর দেহের প্রতি রক্তবিন্দু, প্রতি অস্থিমাংসকণা শ্রীকৃষ্ণের দেহের প্রতি রক্তবিন্দু প্রতি অস্থিমাংসকণার সঙ্গে মিলনের জন্য অধীর আকুল। পুরুষীকরণের যাদুক্রিয়ার যেমন রাধা যেন শ্রীকৃষ্ণের দেহের প্রতি অণু-পরমাণুটি তাঁর নিজ দেহের প্রতি অণু-পরমাণুটির সঙ্গে বদল করে নিজ দেহটি তিলতিল করে নূতন করে গড়েছেন। তাঁর অনুভব তাই তিনি কৃষ্ণ বই অন্য কেউ নন, এমনকি দেহেও তিনি শ্রীকৃষ্ণ। এ এক একান্ত মিলন ও একাত্মতা—শুধু বৈশাস্তিক ধরনে নয়, সমূর্ধ্বে আত্মার মধ্যে—এ হল এখানে এই নিম্নেও

এ প্রকৃতির মধ্যেও মিশ্রণ, একীকরণ, একীভবন। এ যেন পরমা অপ্রমেয় শক্তির উৎস, অণুতন অণু মিশ্রণক্রিয়ার অনুরূপ কিছু। এই পরম মিলন ও একাত্মতার জন্যই—এই নিম্নে জড়দেহ অবধি—রাধা অনুভব করেন তাঁর দেহ আর তাঁর নিজের দেহটি নয়, এ কৃষ্ণতনু. সুতরাং পরম পবিত্র. একান্ত পুণ্যাধার। তিনি বলে উঠেছেন—বৈষ্ণবকবির ভাষায়—

না পোড়ায়ো রাধা অঙ্গ, না ভাসায়ো জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখ তমালের ডালে।
[আখর] (আমি, তমাল বড় ভালবাসি
কৃষ্ণ কালো, তমাল কালো
তাই, তমাল বড় ভালবাসি।)

পৃথিবী, জড়দেহ যা একবার পরম ভগবানের পার্থিব উপাদানে গড়া তনুর স্পর্শ পেয়েছে, তা আর কখনও সে সংযোগের গুণটি হারায় না। মর্ত্য মানুষী তনুর উপাদানের গভীরে সে সংস্পর্শ থেকে যায়; তা থেকে যায় পুষ্পরেণুর অন্তরে লুকান কুসুমসৌরভের গোপন আভাসের মত। যতদিন সে পুষ্প আছে, সে সৌরভও থাকবে—থাকবে তার পরেও. যখন তা ঝরে গেছে তখনও।

সাবিত্রী

শ্রীঅরবিন্দ

৩য় পর্ব—৩য় সর্গ

অন্তঃপুরুষের গৃহ—নবসৃষ্টি

(২)

সহসা তখন নেমে এল এক দৃষ্টি অধোমুখী
সাগর যেন আপন গভীর দেখে গভীরে তলিয়ে ;
জীবন্ত একত্ব এক বিস্তৃত হয় আপন হৃদয়-কন্দরে
যুক্ত করে ধরে তারে অগণিত সত্তা-সংঘদের সঙ্গে।
আনন্দ, জ্যোতি, শক্তি, বহ্নিশুভ্র প্রেম
সকলকে সংগৃহীত করে রাখে এক অভিন্ন বিপুল আলিঙ্গনে
অস্তিত্ব লভে সত্তা তার একত্বের বক্ষতলে,
প্রত্যেকেই হয়ে ওঠে সকলের আপন সত্তা আর আপন প্রসার।
বিপুল যত বিশ্বছন্দ হয়ে ওঠে এক অন্তঃপুরুষের হৃদয়স্পন্দন,
অনুভব হল ভগবানের বহ্নিবান আবিষ্কার
সকল মন বহুলতন্ত্রীর অখণ্ড বীণা এক
সকল জীবনের মিলন-সঙ্গীত,
জগৎ বহুধা, কিন্তু আত্মা এক অভিন্ন।
এই জ্ঞান হয়েছে এখন নববিশ্ব-বীজ এক
এই বীজ সুরক্ষিত এখন জ্যোতির কোষকোটরে,
প্রয়োজন নাই তার আর অজ্ঞানের পরিচ্ছদ।
সেই বিরাট আলিঙ্গনবন্ধের সমাহিতি হতে,
সেই অদ্বিতীয় হৃদয়ের স্পন্দ হতে,
সেই অসম্বৃত আত্মার বিলয় হতে
উঠে এল এক নূতন অপরূপ সৃষ্টি।
অগণনীয় আনন্ত্য সব ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে
ছড়িয়ে দেয় অপরিমেয় পুলকের হাসি,
সংখ্যাতীত একত্বের জীবন তাদের ;
এসব জগতে সত্তা হল বন্ধনহীন, দূরপ্রসারিত
দেহবন্ধ গড়েছে অচিন্ত্যরূপে অহংশূন্য আত্মাকে,
রভসাপ্লুত শক্তিরাজির উল্লাস
কালের সঙ্গে যুক্ত করেছে কালাতীতকে, একই রভসের দুই প্রান্ত
শুভ্র প্রসার সব দেখা দেয়, সেখানে সকলই আবৃত সকলের মধ্যে।
বিরোধ নাই সেখানে, নাই বিচ্ছিন্ন অঙ্গ সব,

সকলই সকলের সঙ্গে সংযুক্ত অধ্যায়ের বন্ধনে,
বদ্ধ অবিচ্ছিন্নভাবে অদ্বিতীয়ের সঙ্গে
প্রত্যেকেই অনন্য তবে প্রত্যেকেই গ্রহণ করে সকলের জীবন যেন তার আপনার,
প্রত্যেকেই অনুসরণ করে অনন্তের এই এক এক সুরধারা
আপনার মধ্যে সাক্ষাৎ করে বিশ্বসত্তাকে।
অনন্তের ঘূর্ণি, তারই সমুজ্জ্বল কেন্দ্রবিন্দু
উঠেছে গিয়ে যেন তার সমুচ্চ তুঙ্গস্থানে তার শেষ পরিসীমা অবধি,
অনুভব করে তারই আপন আত্মানন্দের দিব্যস্বরূপ
পুনঃপুনঃ রূপায়িত হয়েছে যেন অসংখ্য অপর আত্মসত্তাদের মধ্যে।
ভ্রান্তিহীন তুলে নেয় সে আপন পরিধির মাঝে
অরূপের রূপ যত আকার যত,
যেন দিব্য এক গণিতের সহায়ে দীর্ঘায়িত করে চলেছে,
বহুগুণিত মহোল্লাসের গুণফল আশ্রয়ে,
শাশ্বতের পুনরাবর্তিত শাশ্বত বিন্দুশ্রেণী।
কেহ বিচ্ছিন্ন রয় না, শুধু নিজের জন্য নিজে কেহ নয়,
প্রত্যেকের জীবন তার মধ্যে সকলের মধ্যে ভগবানের জন্য,
প্রত্যেকের একত্ব সমগ্রটিকে ধারণ করে রয়েছে অনির্বচনীয়ভাবে।
সেখানে একত্ব একাকার নয়
ধরে দেখায় তা আপনার সহস্র রূপাবলী,
তার দীপ্ত অব্যয় স্থাপুত্ব
তুলে ধরেছে এক অটল প্রতিষ্ঠার উপরে চিরনিবিষ্ট,
স্বেচ্ছায় বাধ্য স্বতঃস্ফূর্ত লাসত্বে,
সেই নিত্যপরিবর্তিত অপরিমেয় পদক্ষেপ,
সেই আপাত-নিরঙ্কুশ নৃত্যের সূক্ষ্ম পরিকল্পনা
বিশাল বিশ্বশক্তিদের সেই পরিপূর্ণ লীলায়।
বাহ্যরূপ দৃষ্টি ফেরায় তার প্রচ্ছন্ন সত্যের দিকে,
পার্থক্য হয়ে ওঠে একত্বের হাস্যময় খেলা ;
ব্যক্তিরা সকলে অদ্বিতীয়ের ভগ্নাংশসব,
সকলে আবার সত্তার প্রচ্ছন্ন এককসংখ্যা।
সকল সংঘর্ষ পরিণত হয় প্রেমের মধুর দ্বন্দ্বে
অবশ্যম্ভাবী আলিঙ্গনের সামঞ্জস্যে বাঁধা বৃত্ত যেন।
একাত্মতার সম্মিলনী সুখসায়
পার্থক্যে এনে দেয় শুদ্ধ অভয়পদ।
বিপদসঙ্কুল শেষ সীমায় মেশে যেখানে এসে দ্বন্দ্বের ধারা
সেখানেই পরমলীলা লীলায়িত হয়ে ওঠে চরমমাত্রায়,
সেখানেই আত্মপ্রাপ্তি হয় দিব্য আত্মলয়ের সহায়ে,

সেখানে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে একত্বের পরম পুলক,
তার প্রতিভার অভিন্ন মধুরিমা অনুভব করে
পরাৎপরের সঙ্গে সমবায়তা।
সেখানে কোথাও নাই কোন দুঃখের কাতর কণ্ঠ;
অভিজ্ঞতা উঠে চলে পুলকের চূড়া হতে চূড়ান্তরে
আনন্দ সেখানে বস্তুর অন্তর্নিহিত শুদ্ধ নিত্য সত্য।
সমগ্র প্রকৃতি সেখানে ভগবানের সচেতন বাহ্যমূর্তি:
জ্ঞান কাজ করে চলে সর্বত্র, আত্মনিয়ন্ত্রিত, আত্মপ্রতিষ্ঠ,
অসীম আলোকের পরিপূর্ণতা,
আসে অন্তর্জ্ঞানী সত্য আপন প্রমাণ আপনি নিয়ে,
আসে সৃষ্টিকর্ত্রী শক্তির মহিমা আর প্রবেগ।
অব্যর্থ চিরন্তনী হতে উন্মেলিত,
ক্ষণিকের চিন্তা অনুপ্রাণিত করে ক্ষণিকের ক্রিয়াকে,
বাক্য এক, ভাষ্য এক উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে নীরবতার বক্ষ হতে,
আকাশের প্রশান্তিতলে সৌন্দর্যের ছন্দদোল,
মহাকালের অতল হৃদয়গর্ভে জ্ঞান সে।
সকলেই সকলের দিকে উন্মুখী, কোথাও নাই পশ্চাদ্দৃষ্টি
অভিন্ন উল্লাস এক নিরবচ্ছিন্ন,
প্রেম অন্তরঙ্গ শিহরিত একাত্মতা
সেই জ্যোতির্ময় বিশ্বভূত জীবনের স্পন্দিত হৃৎপিণ্ড যেন।
বিশ্বদৃষ্টি এক এক করে ধরে সকলকে,
সহৃদয় স্নায়ু সাড়া দেয় সহৃদয় স্নায়ুকে,
শ্রবণ সেখানে শোনে চিন্তার আন্তর ধ্বনি
অনুসরণ করে হৃদয়ের ছন্দায়িত অর্থ যত
স্পর্শ সেখানে হস্তের অপেক্ষায় রয় না অনুভবের জন্য, আলিঙ্গনের জন্য
এসবই চেতনার সহজাত উপায় সব,
উপচিত করে ধরে আত্মার সঙ্গে আত্মার অন্তরঙ্গতা।
অধ্যাত্মশক্তিদের বিরাট সঙ্গীত-সমবায়,
অন্তরাত্মা-বিনিময়ের মূর্ছনাসমারোহ
সম্মিলিত হয়েছে গভীর অন্বয় এক একত্বে।
এই নবজগৎসকলের মধ্যে আগন্তুক সে
হয়ে উঠেছে বিশ্বভূত দৃষ্টির অংশ এক,
সর্বব্যাপী জ্যোতির অধিষ্ঠান,
একই শান্তিসমুদ্রে ক্ষুব্ধ তরঙ্গ এক।
মন তার সাড়া দেয় অগণিত সহযোগী মনে,
বাক্য তার বিশ্বভাষার বর্ণমালা,

জীবন তার বিপুল বিশ্ব-স্পন্দনের ক্ষেত্র।
অনুভব করে সে লক্ষ এষণার পদক্ষেপ
একই লক্ষ্যে সমতালে চলেছে যারা।
প্রবাহ সে নিত্য নবজাত, মৃত্যু তার নাই,
আপন সমগ্রতা স্রোতের রভসোচ্ছল ধারায় বন্দী সে,
শিহরিত আপন অমৃতময় মাধুর্যের ঘূর্ণিপাকে,
অঙ্গে অঙ্গে তার কুসুমিত হয়ে বয়ে চলে
অন্তহীন পুলকের অচঞ্চল গতিধারা,
কোটি কোটি সংহত একত্বের আনন্দসার।

পূর্ণসিদ্ধির বিধানে এই যে বিপুল প্রস্ফুরণ
চাপিয়ে দিয়েছে স্থিরতা তার এই অস্থির জগতের পরে
দেখে সে এখানে আলোকরাজ্যে ক্রমোন্নত শ্রেণীমালা
একে একে উঠে গিয়েছে সমুন্নত হয়েছে সর্বোচ্চ ভগবৎ-লোকে।
একই মহাসত্যের সঙ্গে তারা মিলিয়ে ধরেছে তাদের আপন আপন সত্যকার স্বারাজ্য
প্রত্যেকেই বহন করে সমুল্লসন মাত্র এক পুলকের
একক আপন সৌন্দর্যে, সর্বাঙ্গসুষ্ঠু আপনধারায়,
প্রতিমা এক গড়ে তোলা হয়েছে গভীর সত্যের এক পরাকাষ্ঠা হতে :
সকলেই সংযুক্ত এক সুসঙ্গত পার্থক্যের মধ্যে।
প্রত্যেকেই তার শক্তি দান করে তার প্রতিবেশীদের সম্পদবৃদ্ধির জন্য,
এই দানের ফলে নিজের কোন হ্রাস ঘটে না
অলৌকিক এক আদানপ্রদানের ফলে সকলেই হয় লাভবান,
সকলেই সমৃদ্ধ হয় দানের ফলে এবং গ্রহণের ফলে উভয়তঃ,
অপর সকলকেই তাদের মনে হয় যেন তারা আপনার দোসর সত্তা,
সকলে একীভূত বহুত্বের শক্তি এবং আনন্দের মধ্যে।
এমনকি যখন এক অদ্বিতীয় আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে ধরে
পৃথক সত্তাদের পৃথক সত্তায় আনন্দ উপভোগের জন্য,
তখনও সেই নিঃসঙ্গ অদ্বিতীয় সকলের দিকে আনত থাকে
আর সকলেই ফিরে দৃষ্টি দেয় সেই একের অভিমুখে।
সর্বপ্রকাশক সর্বস্রষ্টীকর মহানন্দ এক
খুঁজে চলে রূপ সব ভাগবত সত্য ব্যক্ত করবার জন্য,
শ্রেণীবদ্ধ করে ধরে তাদের অর্থবহ রহস্যের আশ্রয়ে
অনির্বচনীয়ের মত প্রতীক দীপ্তিরাশি,
সমুল্লসন হয়ে ওঠে, বর্ণমালা যেন বর্ণহীন বাক্যের পরে,
সাক্ষী পুরুষের শুভ্র শুদ্ধতার পরে।
এই বর্ণশ্রেণী পরাৎপরের আপনারই বর্ণভঙ্গ,

তারই সৌন্দর্য, শক্তি, সৃষ্টি-হেতু তারই আনন্দ।
বিপুল এক স্বতন্ত্র চেতনা এই চিহ্নসব তুলে ধরে আপনার মধ্যে
প্রত্যর্পণ করে ভাগবত এক শিশুর হৃদয়ের মধ্যে
চেয়ে থাকে যে তাদের দিকে হাস্যময় আনন্দময়,
পুলকাপ্লুত এই সব লোকাতীত মূর্তি নিয়ে
জীবন্ত যারা বাস্তব যারা তাদেরই আপন অন্তরবাসী সত্যের মত।
চিৎ-পুরুষের শুভ্র নিরপেক্ষ সত্তা হয়ে ওঠে
অলৌকিকের লীলাক্ষেত্র, মিলনভূমি এক
রহস্যময় কালাতীতের প্রচ্ছন্ন সব শক্তিদের :
তার কল্যাণে আকাশ হয়ে উঠেছে ভগবানের অপরূপ ভবন,
কালের স্রোতে ঢেলে দিয়েছে সে তার কালজয়ী শক্তির কর্মাবলী,
অনবগুণ্ঠিত করেছে, মুক্তকর আনন্দময় আনন যেন,
তার প্রেমের তার শক্তির অত্যাশ্চর্য আর সৌন্দর্য।
চিরন্তনী ভগবতী বিচরণ করে তার বিশ্বরূপী ভবনের মাঝে,
লীলা তার ভগবানের সঙ্গে, শিশুর সঙ্গে মায়ের যেমন
ভগবানের কাছে বিশ্ব হল ভগবতীর প্রেমপূর্ণ বক্ষ,
তার খেলার পুতুল সব হল অমর সত্তারাজি।
এখানে যা-কিছু হারিয়েছে আপনাকে, সেখানে গিয়ে লাভ করে তা নিজস্থান।
এখানে যেসব শক্তি আমাদের হৃদয়কে প্রতারণা করে, ভুল পথে চলে,
সেখানে স্বরাট তারা সত্যে, আনন্দে পূর্ণপ্রতিষ্ঠ,
দোষলেশহীন সৃষ্টিতে তারা হল অধিকর্তা,
তাদের আপন আনন্দের অধিরাজ তারা।
মন সেখানে দৃষ্টিসম্বলিত রশ্মিরাজির প্রদীপ্ত সূর্য,
বস্তুকে গড়ে তোলে সে আপন চিন্তারাজির মহিমা দিয়ে,
আপন স্বপ্নের ঐশ্বর্যমাঝে বিচরণ করে সে।
কল্পনা মহান্ যাদুদণ্ড
ডেকে আনে অজ্ঞাতকে, তার জন্য গড়ে দেয় নীড় এক,
ছড়িয়ে দেয় প্রভূত প্রাচুর্য সোনার বাতাসে
সত্যের রামধনুবর্ণ ডানাসব অবাধ কল্পনার,
কিংবা গেয়ে চলে পুলকে অন্তর্জ্ঞানী হৃদয়ের অভিমুখে
অপরূপের স্বপ্নালু সুর সব, সদ্বস্তুকে নিয়ে আসে একান্ত সমীপে।
তারই আপন শক্তি অজ্ঞেয়কে কাছে নিয়ে আসে, সত্য করে তোলে,
আদর্শ মনোময় লোকের মন্দিরে স্থাপন করেছে সেই অদ্বিতীয়কে :
চিন্তাকে মনোবৃত্তিকে তৃপ্ত ইন্দ্রিয়কে জনাকীর্ণ করে
পূর্ণ করে তোলে ভগবৎশক্তির উজ্জ্বল মূর্তিসব দিয়ে
আর দিয়ে অদ্বিতীয় পরমের জীবন্ত ব্যক্তিরূপ সব,

বাক্য সেখানে কণ্ঠ দেয় অনির্বচনীয়কে
আলোকরশ্মি ব্যক্ত করে ধরে অদৃশ্য সত্তাদের,
প্রথম রূপ সব যাদের আশ্রয়ে অরূপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে,
বাক নিয়ে আসে দিব্য অভিজ্ঞতাসব,
আদি ভাবসব পূর্ণ করে ধরে অসীমকে।
ছেদ নাই কোন চিন্তায় আর ঘটনায়;
পরস্পরে সর্বদা সাড়া দেয় তারা বিহঙ্গ যেন ডাকে বিহঙ্গকে,
সংকল্প চিন্তার বাধ্য, ক্রিয়া বাধ্য সংকল্পের,
জীবে জীবে গাঁথা সমন্বয়সূত্রে।
শাশ্বতের সঙ্গে উদ্বাহে কাল অর্জন করেছে দিব্যসত্তা।
জীবনধারা সেখানে অনুসরণ করে—তার বিলাস অবিশ্রান্ত,
হৃদয়তলে পুলক, ওষ্ঠাধরে হাস্য—
এই যে সমুজ্জ্বল অভিযান ভগবানের যদৃচ্ছ লীলা।
জীবনীশক্তি তার খেয়ালী আবেগচাতুর্যে
তার রূপান্তরকারী উদ্বেল পুলকে মহাকালের উপরে এঁকে দিয়েছে
ঘটনাবলীর এক নূতনতর প্রহেলিকা,
নিত্য নূতনের ঝাঁকে ঝাঁকে লুব্ধ হয়ে চলে সে
অফুরন্ত আবিষ্কার-আবিষ্কারের পথে।
কঠোর বাধাসব তুলে ধরে সে দৃঢ়সংকল্প যেন ভেঙে দেয় তাদের,
নূতন সৃষ্টিসব এনে ধরে সম্মুখে চিন্তাকে বিস্মিত ক'রে
আর দুর্বোধ অভিযান সব দুঃসাহসী হৃদয়ের তরে;
সত্য সেখানে পুনঃপুনঃ দেখা দেয় অপ্রত্যাশিত রূপ ধরে
অথবা পরিচিত পুরাতন প্রবোধের পুনরাবর্তন
মধুর সুর-মূর্ছনার পুনরুক্তি যেন।
লুকোচুরি খেলা যেন জ্ঞানদাতার বক্ষের পরে,
শিল্পী যেন তার বিশ্ব-ভাবনা-ভাণ্ডার নিয়ে চলেছে,
অসংখ্য চিন্তাবলী, শেষ হয় না কভু তার,
বিপুল অভিযান তার চিন্তায় আকারে নিত্যরূপায়িত,
নব নব জীবনের স্বপ্নসব লুব্ধ করে তারে পরীক্ষার তরে।
পুনরাবৃত্তি শ্রান্ত করে না তারে, শ্রান্ত করে না নিত্যপরিবর্তন,
অন্তহীন খুলে ধরেছে সে চলন্ত তার কর্মধারা,
রহস্যময় নাটক এক দিব্য আনন্দের,
বিশ্ব-উল্লাসের জীবন্ত কাব্য,
অর্থপূর্ণ বিবিধ আকারের কাকেমোনো* যেন,

---

* জাপানী আলখেল্লা।

ক্রমবিকশিত দৃশ্যাবলীর সম্পুটিত পটধারা,
স্বয়ংপ্রকট মূর্তিসব পরস্পরের অনুসরণ করে আলোক ছড়িয়ে,
অন্তরাত্মা খোঁজে অন্তরাত্মাকে তীব্র আবেগে যেন শিকারের,
দেবতার অভিসার, দেবতার মিলন যেন।
জড়-সেখানে আত্মার গাঢ় কাঠিন্য,
আত্মসত্তার সানন্দ বহিঃপ্রকাশের শিল্পচাতুর্য যেন,
চিরস্থায়ী মূর্তিকলের সঞ্চিত-ভাণ্ডার,
ইন্দ্রিয়ানুভব সেখানে গড়ে তোলে বিশুদ্ধ আনন্দের জগৎ এক
চিরন্তন মহাসুখের নীড়,
কালক্রম আশ্রয় গ্রহণ করে সেখানে প্রীতিকর পাঠশালা যেন।
ইন্দ্রিয়রাজি সেখানে অন্তরাত্মার প্রকাশ-পথ ;
মনের তুচ্ছতম শিশুচিন্তা অবধি
উর্ধ্বতমের স্পর্শকিছু নিয়ে এসে রূপদান করে।
সেখানে উপাদান হল আত্মসত্তার নিকুণিত বীণা,
ফাঁদ যেন অধ্যাত্ম চেতনার নিরন্তর বিলসন ধরবার জন্যই,
প্রেমের তীব্র চুম্বকশক্তি যেন,
তার আকুল হৃৎস্পন্দন আর আকুতির কণ্ঠ
ভগবানকে নিয়ে আসে নিকটে, মধুর, অপরূপ।
নিরেট দৃঢ়তা এখানে হল স্বর্গে গড়া ঘনবস্তুভার
তার স্থাণু নিত্য মনোহর মাধুর্য
পরম আনন্দের উচ্ছল পাদপীঠ হয়ে উঠেছে।
তার দেহসব ওতপ্রোত এক দিব্য ইন্দ্রিয়ানুভবে,
আত্মার সঙ্গে তাই আত্মার আলিঙ্গন নিবিড় দীর্ঘস্থায়ী
স্থূলস্পর্শ হয়ে ওঠে অন্তরঙ্গ লীলা এক,
ফুটে ওঠে সেখানে হৃদয়ের উল্লাসে দীপ্তি আর স্পন্দ,
মন উঠে যায় উর্ধ্বে উচ্ছল চিন্তারাজি নিয়ে, অন্তঃপুরুষ নিয়ে আসে তার আত্মানন্দ
প্রাণপুরুষ ধরে রাখে চিরতরে তার রভসের অগ্নিশিখা এক ঊর্ধ্বমুখী কণ্ঠ।
ক্ষণস্থায়ী যা-কিছু এখন অমর হয়ে রয়ে যায় সেখানে,
গর্বোন্নত সৌন্দর্য আর নির্দোষ সুসঙ্গতি
লভে জড়সত্তা, অবনত হয়ে অধ্যাত্মের আলোতে।
শৃঙ্খলিত তার নিমেষাবলী ঘোষণা করে সনাতন বিধিকে ;
দিব্যদৃষ্টি স্থিরপ্রতিষ্ঠিত নিবিড় মৃত্যুঞ্জয়ী রূপের আশ্রয়ে ;
কাল হয়ে ওঠে শাশ্বতের স্বচ্ছ পরিধান।
স্থপতি যেন আত্মসত্তার জীবন্ত শিলা হতে কেটে তোলে,
বাহ্যপ্রকৃতি গড়ে দেয় সদ্বস্তুর গ্রীষ্মাবাস
অনন্তের মহাসাগরের সৈকতপরে।

পরাজিত রাবণ

শ্রীঅরবিন্দ

সবসেরা রক্ষোবৃন্দ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি
ভূমণ্ডলে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রক্ষমরী পুরী
সমুদ্র-চুম্বিত দ্বীপে উচ্চ মহাশিলে
বাঁধিয়া রহিবে যারা স্বতেজে নিঃশঙ্কে
দেবেন্দ্ররে উপেক্ষিয়া, বিশ্বে অবহেলি'।
কিন্তু এ কি শব্দ শোন লঙ্কার প্রাচীর
ঘেরে এ কি কোলাহল অপূর্ব্ব এ দেশে
গর্জ্জে এ কি তুচ্ছ সেনা হর্ষে উপহাসে
বিজয়ে গুণায় নারী রক্ষঃ মাতা কি রে।
কার ভয়ে আছি যুদ্ধবন্দী এ নগরে?
হেরি নীরবে সে নৃত্য, শুনি সে গর্জ্জন
হেরি নীরবে সে নৃত্য, শুনি সে গর্জ্জন
ক্ষণদীপ্তি কিবি সে দর্প?
রক্ষণ রক্ষিত মোরা অলঙ্ঘ্য সাগরে
বিশ্বভোগী ছিনু মোরা। এক ক্ষুদ্র দ্বীপ
দলিয়া গরবভরে যারা নরজাতি
কোটি কোটি মানবের পৃথু বসুন্ধরা
নিজস্ব করিয়া ভুঞ্জে। দৃপ্ত পুরন্দর
ত্রৈলোক্য-সম্রাট নামে বন্ধ দাসকর্ম্মে
তোমাদের ভুজবলে লঙ্কাপুরে আজি।
সেই রক্ষ মোরা, সেই লঙ্কা এই পুরী।
পরিণত কি করিবে সেই ভুজবল
ক্ষীণ দীপ্তি কিসে দর্প বল রক্ষগণ,
গিয়েছে কি শক্তি উড়ে অলক্ষিতা রাত্রে
নিদ্রা বয়েছিনু যবে নিশায় নির্ভরে?
কে করেছে চুরি তেজঃ, কৃষ্ণ, মহাদেব,
অন্য বা সাহসী কেহ নিস্তব্ধ নিশীথে
কাঁপিতে কাঁপিতে পশি সুপ্ত লঙ্কাপুরে?
হায়, এ কি উপহাস অদৃষ্টের, শেষে
ক্ষুদ্র যুদ্ধে পরাজিত এ অজেয় জাতি,
সামান্য মানব জয়ী রাক্ষসের দেশে।

বুঝিলাম, যদি নামি রুদ্র শূলপাণি
ভয়িয়া প্রমথে দৈত্যে বিপুবল তার
রাতদিন শতবর্ষ যুঝি যদি বিধি
লণ্ডভণ্ড করে শেষে লঙ্কা দৈববলে।
বুঝিলাম, যদি পাতি কূটনীতি-জাল
রক্ষঃ-বুদ্ধি আঁধারিয়া হরে মহাবিষ্ণু
রক্ষঃ-লক্ষ্মী। বাহুভুজে বিজিত আমরা,
মানব-দলিত লঙ্কা রাবণের পুরী।
হাস সুখে, পরাজিত দেবগণ স্বর্গে,
নাই দণ্ডভয় যার। হাস সুখে, ইন্দ্র,
দাস্যমুক্ত পুত্রবর। নিন্দিনা তোমারে
লজ্জা ভুলে যদি গর্ব্ব কর এ বিজয়ে,
জ্যোতির্ম্ময় স্বর্গপুরী, সুচির বসন্ত,
নন্দনকানন ভুঞ্জ মর্ত্তের প্রসাদে।
মর্ত্যভুজে পরাজিত রাবণ দেবারি।

পরাজিত! শোন শোন দূর মহাশিলে
শুনিয়া এ উক্তি হাসে উগ্র প্রতিধ্বনি
লঙ্কাদ্বীপে শৈলসুতা বিকট আরবে।
পরাজিত! টুটে এই শব্দ উচ্চারিয়া
প্রাণধন, ফুটে না এ কথা রক্ষনুখে।
লৌহবলে দৃপ্ত রক্ষঃ লৌহ অস্ত্রধারী
অতৃপ্ত পাখিন জয়ে ত্রিদিবে ত্রিদিবে
অতৃপ্ত আক্রমি চূড়া ত্রৈলোক্য অস্থির।
পরাজিত সেই জাতি! অলীক এ সত্য
মিথ্যা এই ইতিহাস। ভ্রাতা, মিত্র, পুত্র
হত মোর, রত্নময় বিশাল প্রাসাদে
ভৃত্যজন পূর্ণ কক্ষে বিচরি একাকী
বৃথা খুঁজি বন্ধুমুখ। পূর্ণ অন্তঃপুরে
পুত্রহীনা নারীগণে হেরি শুষ্ক প্রাণে
বিচরি একাকী। সভাস্থলে, রণক্ষেত্রে
নিরানন্দ পানভূমে, নীরস ক্রীড়ায়
লঙ্কার গৌরব যত বৃথা খুঁজি চোখে।
নীরব সে সিংহনাদ, এ কর্ণকুহরে
পূরিত আনন্দ স্রোতঃ, বিজয়ের তূরী,
যুদ্ধের আশীর্বাণী, দৃপ্ত সিংহনাদ

সোদর কুম্ভকর্ণের। যক্ষ, ইন্দ্রজিৎ
নীরব কেন তোমরা এ বিপৎকালে।
হর্ষায় না কেন কান, বৎস চিরজয়ী
তোদের সে কণ্ঠধ্বনি। এতই কি দূঢ়,
এতই মধুর মরণের আলিঙ্গন,
বৎস মোর। ক্ষমা কর, রক্ষগণ, আজি
রাবণ দলিতা ধরা তিতিল প্রথম
রাবণের অশ্রুজলে।
হোক হত তারা
আছি আমি। লিখিবে কি ইতিহাস পৃষ্ঠে,
লিখিবে কি সত্য তবে আরব অক্ষরে,
ভুবন বিজয়ী রক্ষ পরাজিত শেষে
কুলতেজে বাবহস্তে। এ ঘোর অকীর্তি
দিবনা লিখিতে কভু রক্ষ-ইতিহাসে।
শুনিয়া অতীত কথা বিস্মিত জগত
দিব না লিখিতে কভু রক্ষ-ইতিহাসে।
শুনিয়া অতীত কথা বিস্মিত জগৎ
বলুক নারায় দৈবে ক্ষণকালজয়ী
রক্ষের অবহেলায় ছিল দাশরথী।
বলুক অদ্ভুত বার্তা অতুল এ ভবে
বীরপ্রাণ উন্মাদিনী, হত মুখ্যবীর,
হতপুত্র, হতমিত্র রাক্ষস রাবণ
আবার উঠিল গর্জি উন্মত্ত আহবে,
বিনাশি অযুত শত্রু অল্প লঙ্কাবাসী
অল্পদিনে অল্পায়াসে বিদ্রোহী জগৎ
করিয়াছে পুনঃ পরাধীন। উঠ তবে
মুছে এস শোক স্মৃতি, মুছ প্রাণপটে
বিষাদের ছায়া যত, আঙ্গারিত চোখে
উজ্জ্বল ক্রোধাগ্নি। ভুলে যাও দয়া, ক্লান্তি
হে স্বর্গবিজেত্রী জাতি। লৌহময় দেহে
লৌহময় প্রাণচিত্ত সাজে রক্ষগণে।
সংহার করিব পুনঃ। মহাসিন্ধু লঙ্ঘি
নির্জন করিব বায়ুপুত্র জন্মভূমি,
অগনন বন্দী দাসে শূন্য লঙ্কাদ্বীপ
করিব জনসঙ্কুল, জন্মাব সুরতে
শত্রুদের জায়াগর্ভে নবীন সন্ততি।

যাহা গেল, তাহা ছাড়ি। আবার গড়িব,
আবার ভাঙ্গিব। নহি ক্ষুদ্র নরচেতা,
থামে না রাবণ তৃষ্ণা অল্প রক্তস্রাবে,
অল্প পরিহিংসা-পরিতৃপ্ত শোকবহ্নি
নিভেনা এ বিশাল হৃদয়ে। অল্প ভোগে
ম্লান নহে এ ইন্দ্রিয় তেজঃ। রক্ষ আমি।
ভুবনবিজয়ী পুনঃ ভুঞ্জিব অসীমে।

নচেৎ হৃষ্ট হ তোরা, শিবার শৃগাল,
হৃষ্ট হ গৃধিনী যত, সহস্র সহস্র
নরকপিণ্ডে মহা শৈলসম রচি
পাতিব মরণতল্প কিম্বা হুতাশনে
ঐশ্বর্য্য সৌন্দর্য্য শিল্প প্রাচীন লঙ্কার
ইন্ধন কল্পনা করি ফেলিব, ফেলিব
এ অতুল কীর্ত্তি। এ অখিল মহাপুরী
সাজাব রাক্ষসী চিতা। তুষিব পৃথিবী
জিনিয়াছি যুদ্ধে, বাঁধিয়াছি দেবগণে,
ভুঞ্জেছি অতুল্য যশঃ; বিশ্বচক্ষু জুড়ি
সূর্য্য যেন জ্বলে নভে গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে,
উত্তাপে জগৎ কিষ্ট রুদ্রদীপ্তি পূজে।
জ্বলিয়াছি ভূমণ্ডলে কিরণ প্রকাশি।
রঞ্জিয়া নিজ রুধিরে গগন নীলিমা
সূর্য্য যেন অস্তাচলে ডোবে মহাতেজা,
ডুবিব মৃত্যুসাগরে। ছিলাম উদয়ে,
ভোগকালে উচ্চশির মহাতেজা। অস্তে
রহিব, মরণে, নাশে অজেয় তেজস্বী।

ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিমন্ত্র

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

৩য় মণ্ডল—৩য় সূক্ত

১। বৈশ্বানরায় পৃথুপাজসে বিপো রত্না বিধন্ত ধরুণেষু গাতবে।
অগ্নিহি দেবাঁ অমৃতো দুবস্যত্যথা ধর্মাণি সনতা ন দূদুষৎ ॥১॥

বৈশ্বানরায়—বিশ্বপুরুষের জন্য।
পৃথু-পাজসে—বিপুল বল যার তার জন্য
বিপঃ—বিপ্রেরা, জ্ঞানীরা
রত্না—আনন্দরাজি
বিধন্ত—সৃষ্টি করেছে
ধরুণেষু—প্রতিষ্ঠা সকলের মধ্যে বা উপর দিয়ে
গাতবে—গমনের জন্য
অগ্নিঃ—অগ্নিদেব
হি—কারণ
দেবান্—দেবতাসকলকে
অমৃতঃ—অমর
দুবস্যতি—কর্মে নিযুক্ত করে
অথ—তাই
ধর্মাণি—ধর্মসকল, সত্যবিধিসকল
সনতা—চিরন্তন
ন—না
দূদুষৎ—বিকৃত করে, কলুষিত করে, দূষিত করে

মহাবলী বিশ্বপুরুষের জন্য জ্ঞানীরা সৃষ্টি করেছে আনন্দধারা, প্রতিষ্ঠাসকলের উপর দিয়ে পথযাত্রার জন্য, অমর অগ্নি দেবতাদের কর্মে নিযুক্ত করেছে, তাই সনাতন ধর্ম সকলকে কেউ কলুষিত করে না ॥১॥

২। অন্তর্দূতো রোদসী দস্ম ঈয়তে হোতা নিষত্তো মনুষঃ পুরোহিতঃ।
ক্ষয়ং বৃহন্তং পরি ভূষতি দ্যুভির্দেবেভিরগ্নিরিষিতো ধিয়াবসুঃ ॥২।

অন্তঃ—মধ্যে
দূতঃ—দূত
রোদসী—স্বর্গ ও মর্ত্যের
দস্মঃ—কর্মী
ঈয়তে—চলেছে
হোতা—হোতা, আহ্বাতা

নি-সত্তঃ—অন্তরে আসীন
মনুষঃ—মানুষের
পুরঃ-হিতঃ—পুরোধা
ক্ষয়ম্—গৃহকে
বৃহন্তম্—বৃহৎ
পরি+ভূষতি—পরিবৃত করে, ঘিরে রাখে
দ্যুতিঃ—দীপ্তি দিয়ে
দেবেভিঃ—দেবতাদের দ্বারা
অগ্নিঃ—অগ্নি
ইষিতঃ—প্রচালিত
ধিষ্ণ্য-বন্তঃ—ধী-সম্পদযুক্ত

কর্মী দূত হয়ে চলেছে স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে, আহূতা সে, মানুষের অন্তরে আসীন পুরোধারূপে, বৃহৎ তার গৃহকে আলোক দিয়ে ঘিরে রেখেছে, ধী-সম্পন্ন অগ্নিদেবকে দেবতারা অনুপ্রাণিত করেছে ॥২॥

৩। কেতুং যজ্ঞানাং বিদথস্য সাধনং বিপ্রাসো অগ্নিং মহয়ন্ত চিত্তিভিঃ।
অপাংসি যস্মিন্নধি সন্দধুর্গিরস্তস্মিন্নৎসুম্নানি যজমান আ চকে ॥৩॥

কেতুম্—চেতনার রশ্মি
যজ্ঞানাম্—যজ্ঞসকলের
বিদথস্য—জ্ঞানের
সাধনম্—সাধনশক্তি
বিপ্রাসঃ—জ্ঞানীরা
অগ্নিম্—অগ্নিকে
মহয়ন্ত—মহৎ করে তুলেছে
চিত্তিভিঃ—(তাদের) জ্ঞানরশ্মিদের সহায়ে
অপাংসি—কর্মাবলী
যস্মিন্—যার মধ্যে
অধি+সম্-দধুঃ—সংসাধিত করেছে, সম্পাদন করেছে
গিরঃ—বাক্যাবলী
তস্মিন্—তার মধ্যে
সুম্নানি—সুখরাজি
যজমানঃ—যাজক, যজ্ঞকর্তা
আ+চকে—কামনা করে

যজ্ঞসকলের চিন্ময় শিখা, জ্ঞানের সাধন-উপায় অগ্নিকে জ্ঞানীরা মহীয়ান করে ধরেছে তাদের চেতনাশক্তির সহায়ে, তারই মধ্যে দিব্যবাক্ কর্মাবলী উদ্‌যাপন করে চলেছে, তারই মধ্যে যজমান আকাঙ্ক্ষা করে তার সকল সুখসম্পদ ॥৩॥

৪। পিতা যজ্ঞানামসুরো বিপশ্চিতাং বিমানমগ্নির্বয়ুনং চ বাঘতাম্।
আ বিবেশ রোদসী ভূরিবর্পসা পুরুপ্রিয়ো ভন্দতে ধামভিঃ কবিঃ ॥৪॥

পিতা—পিতা
যজ্ঞানাম্—যজ্ঞসকলের
অসুরঃ—বলবান, অধীশ্বর, শক্তিমন্ত
বিপঃ-চিতাম্—বিজ্ঞদের, জ্ঞানীদের
বি-মানম্—পরিমাণ, পরিমিতি
অগ্নিঃ—অগ্নি
বয়ুনম্—প্রকাশ, অভিব্যক্তি
চ—আর
বাঘতাম্—বাক্‌সিদ্ধদের, বাক্‌পতিদের
আ + বিবেশ—প্রবেশ করেছে
রোদসী—উভয়লোকে (দ্যুলোকে-ভূলোকে)
ভূরি-বর্পসা—বহুল রূপ দিয়ে
পুরু-প্রিয়ঃ—বহুল-প্রেমধারী
ভন্দতে—আনন্দ গ্রহণ করে
ধামভিঃ—ধামত্রয় লোকের সহায়ে
কবিঃ—দ্রষ্টা

যজ্ঞসকলের পিতা আর জ্ঞানীদের বীর অধীশ্বর অগ্নি বাঙ্‌ময় জ্ঞানের পরিমিতি ও প্রকাশ নির্দেশ করেন, তিনি প্রবেশ করেছেন উভয়লোকের অন্তরে তাঁর বহুল তনু ধারণ ক'রে, সকল প্রেয়ের আধার দ্রষ্টা কবি এই, সকল আবাসস্থানের আনন্দ তিনি গ্রহণ করেন ॥৪॥

৫। চন্দ্রমগ্নিং চন্দ্ররথং হরিব্রতং বৈশ্বানরমপ্সুষদং স্বর্বিদম্।
বিগাহং তূর্ণিং তবিষীভিরাবৃতং ভূর্ণিং দেবাস ইহ সুশ্রিয়ং দধুঃ ॥৫॥

চন্দ্রম্—আনন্দময়
অগ্নিম্—অগ্নিকে
চন্দ্র-রথম্—আনন্দের রথ যাঁর
হরি-ব্রতম্—কর্মধারা যাঁর জ্যোতির্ময়
বৈশ্বানরম্—যিনি হলেন বিশ্বদেবশক্তি
অপ্সু-সদম্—জলমধ্যে যাঁর আসন
স্বঃ-বিদম্—স্বর্লোক-বেত্তা যিনি
বি-গাহম্—যিনি গভীরচারী
তূর্ণিম্—ত্রাণ তারণকর্তা যিনি, ক্ষিপ্রগামী (সায়ণ)
তবিষীভিঃ—তেজোরাশি দিয়ে, বীর্যরাশি দিয়ে
আ-বৃতম্—আবৃত

ভূর্ণিম—ভর্তাকে
দেবাসঃ—দেবতারা
ইহ—এখানে
সু-প্রিয়ম্—সুশ্রী, শ্রীময়
দধুঃ—স্থাপন করেছে

আনন্দময় অগ্নি, আনন্দময় রথ তাঁর, কর্মধারা তাঁর জ্যোতির্ময়, বিদ্যুদ্দেবশক্তি তিনি, জলাধারে আসন তাঁর, স্বর্লোক তিনি আবিষ্কার করেছেন, গভীরে চলে গিয়েছেন, পারান্তরে চলে যান অবিলম্বে, আপন তেজোরাশি দিয়ে আবৃত তিনি, এই পরম শ্রীময় ভর্তাকে দেবতারা এখানে স্থাপন করেছেন ॥৫॥

৬। অগ্নির্দেবেভির্মনুষশ্চ জন্তুভিস্তন্বানো যজ্ঞং পুরুপেশসং ধিয়া।
রথীরন্তরীয়তে সাধদিষ্টিভির্জীরো দমূনা অভিশস্তিচাতনঃ ॥৬॥

অগ্নিঃ—অগ্নিদেব
দেবেভিঃ—দেবতাদের সঙ্গে
মনুষঃ—মানুষের
চ—আর
জন্তুভিঃ—প্রাণীদের সঙ্গে
তন্বানঃ—গঠন ক'রে, গড়ে তুলে
যজ্ঞম্—যজ্ঞকে
পুরু-পেশসম্—বহুরূপময়
ধিয়া—বুদ্ধির সহায়ে
রথীঃ—রথী সে
অন্তঃ—অন্তরে
ঈয়তে—চলেছে
সাধদিষ্টিভিঃ—তাদের অভীষ্ট সাধন করে
জীরঃ—ক্ষিপ্রগামী
দমূনাঃ—স্বগৃহবাসী
অভিশস্তি-চাতনঃ—শত্রুনিপাতক সে

অগ্নি দেবতাদের ইতরপ্রাণীদেরও সঙ্গে মানুষী বুদ্ধির সহায়ে বহুরূপী যজ্ঞকে গড়ে চলেন, রথী তিনি উভয়লোকের অন্তরে চলেছেন সকল ইষ্ট সাধন করে, ক্ষিপ্রগামী স্বগৃহবাসী হয়েও প্রতিরোধীদের বিনাশ করেন তিনি ॥৬॥

৭। অগ্নে জরস্ব স্বপত্য আয়ুন্যূর্জা পিন্বস্ব সরিষো দিদীহি নঃ।
বয়াংসি জিন্ব বৃহতশ্চ জাগৃব উশিগ্দেবানামসি সুক্রতুবিপাম্ ॥৭॥

অগ্নে—হে অগ্নি
জরস্ব—প্রিয় হও তুমি, সমীপে এস

P, 7307

ভূ-অপত্যে—অপত্যসমৃদ্ধ
আয়ুনি—জীবনধারায়
ঊর্জা—ওজঃশক্তির সহায়ে
পিন্বস্ব—(আমাদের) পুষ্ট কর
সম্—সম্যক
ইষঃ—প্রেরণাসকল
দিদীহি (সম্+)—(সম্যক) উজ্জ্বল কর, প্রদীপ্ত কর
নঃ—আমাদের
বয়াংসি—প্রসার সব
জিন্ব—জয় কর, জীবন্ত কর
বৃহতঃ—বৃহতের
চ—আর
জাগৃবে—হে সদাজাগ্রত
উশিক্—আকাঙ্ক্ষী, ঊর্ধ্বাশী, অভীপ্সাময়
দেবানাম্—দেবতাদের
অসি—তুমি হও
ভূ-ক্রতুঃ—ইচ্ছাশক্তিময়
বিপ্রাম্—জ্ঞানী দ্রষ্টাদের

হে অগ্নি, আমাদের সমীপে এস, আমাদের জীবনকে অপত্যসমৃদ্ধ করে ওজঃশক্তি দিয়ে আমাদের পরিপুষ্ট কর, আমাদের প্রেরণাসব সমিদ্ধ কর, জীবন্ত করে ধর বৃহতের সকল প্রসার, হে নিত্যজাগ্রত, তুমি হলে দেবতাদের আর জ্ঞানোজ্জ্বল বিপ্রদের ইচ্ছা-শক্তিময় অভীপ্সা ॥৭॥

৮। বিশ্পতিম্—যজ্ঞবতিথিং নরঃ সদা বন্তারং ধীনামুশিজং চ বাঘতাম্।
অধ্বরাণাং চেতনং জাতবেদসং প্র শংসন্তি নমসা জূতিভির্বৃধে ॥৮॥

বিশ্পতিম্—লোকপালক
যজ্ঞম্—বীর্যময়
অতিথিম্—অতিথিকে
নরঃ—মানুষেরা
সদা—সর্বদা
বন্তারম্—প্রেরক, নিয়ন্তা
ধীনাম্—চিন্তাবলীর
উশিজম্—ঊর্ধ্বাশী
চ—আর
বাঘতাম্—বাক্‌সিদ্ধদের, মন্ত্রকর্তাদের, বাক্‌পতিদের
অধ্বরাণাম্—যজ্ঞযাত্রাদের

চেতনন্—চেতয়িতা, উদ্বোধয়িতা
জাত-বেদসম্—জন্মজ্ঞানী
প্র-শংসন্তি—প্রকাশ করে ধরে
নমসা—প্রণতি দিয়ে
হবিভিঃ—সকল প্রবেগ দিয়ে
বৃধে—বৃদ্ধি, অভিবৃদ্ধির জন্য

যিনি লোকপতি, ওজঃময় তিনি, তিনি অতিথি, চিন্তারাজির নিত্য-নিয়ন্তা তিনি, মন্ত্রকর্তাদের অন্তরে উর্ধ্বাধী তিনি, গন্তব্যযাত্রায় তিনি চেতনা দান করেন, সকল জন্মের জ্ঞাতা তিনি, তাঁকেই মানুষেরা প্রণতি দিয়ে, সকল প্রবেগ দিয়ে প্রকাশ করে ধরে অভিবৃদ্ধির জন্য ॥৮॥

৯। বিভাবা দেবঃ সুরণঃ পরি ক্ষিতীরগ্নির্বভূব শবসা সুমৎরথঃ।
তস্য ব্রতানি ভূরিপোষিণো বয়মুপ হ্বয়েম দম আ সুবৃক্তিভিঃ ॥৯॥

বিভা-বা—সর্বত্র দীপ্তিমান
দেবঃ—দেবতা
সু-রণঃ—সুখময়
পরি—ঘিরে
ক্ষিতীঃ—আবাস
অগ্নিঃ—অগ্নি
বভূব (পরি+)—(ঘিরে) রয়েছে
শবসা—সামর্থ্য দিয়ে
সুমৎ-রথঃ—সুখময় রথ যার
তস্য—তাঁর
ব্রতানি—কর্মধারা
ভূরি-পোষিণঃ—বহুরূপে বা প্রচুরভাবে পোষণ করে যে তাঁর
বয়ম্—আমরা
উপ+হ্বয়েম—আমরা যেন প্রকাশ করি, অনুসরণ করি
দমে—গৃহে, আবাসে
আ—সর্বথা
সুবৃক্তিভিঃ—পূর্ণ শুদ্ধি সব দিয়ে

সর্বত্র প্রদীপ্ত দেবতা পূর্ণ আনন্দে তাঁর সুখময় রথে করে নিজ সামর্থ্য দিয়ে আমাদের আবাস ঘিরে রয়েছেন, তিনি পরিপোষণ করে চলেছেন বহুল বিবিধরূপে তাঁর কর্মধারা সব, আমরা যেন অনুসরণ করি আমাদের গৃহাভ্যন্তরে আমাদের পূর্ণ শুদ্ধি নিয়ে ॥৯॥

১০। বৈশ্বানর তব ধামান্যা চকে যেভিঃ স্বর্বিদভবো বিচক্ষণ।
জাতে আপৃণো ভুবনানি রোদসী অগ্নে তা বিশ্বা পরিভূরসি ত্মনা ॥১০॥

বৈশ্বানর—হে বিশ্বদেবশক্তি
তব—তোমার
ধামানি—নিবাস সব
আ+চকে—আমি কামনা করি
যেভিঃ—যাদের কল্যাণে
স্বঃ-বিৎ—স্বর্লোক জেনেছ, স্বর্লোকবেত্তা, স্বর্লোক-আবিষ্কারক
অভবঃ—হয়েছ
বি-চক্ষণ—হে সর্বদ্রষ্টা
জাতঃ—জন্মগ্রহণ করে
আ+অপৃণঃ—তুমি পূর্ণ করেছ
ভুবনানি—সকল লোক
রোদসী—স্বর্গ-মর্ত্য
অগ্নে—হে অগ্নি
তা—সেই
বিশ্বা—সকল জিনিস
পরি-ভূঃ—ঘিরে, চারিদিক দিয়ে
অসি—হয়েছ
ত্মনা—আপনাকে দিয়ে

হে বিশ্বদেব, তোমার ধামসব আমি কামনা করি যাদের কল্যাণে, হে সর্বদর্শী, তুমি সূর্যলোকের জ্ঞানলাভ করেছ, জন্মমাত্রই তুমি সকল ভুবন দ্যুলোক-ভূলোক পূর্ণ করেছ, হে অগ্নি, সে সবই তুমি নিজেকে দিয়ে ঘিরে রয়েছ ॥১০॥

১১। বৈশ্বানরস্য দংসনাভ্যো বৃহদরিণাদেকঃ স্বপস্যয়া কবিঃ।
উভা পিতরা মহয়ন্নজায়তাগ্নির্দ্যাবাপৃথিবী ভূরিরেতসা ॥১১॥

বৈশ্বানরস্য—বিশ্বদেবের
দংসনাভ্যঃ—ক্রিয়াবলী হতে
বৃহৎ—বৃহৎ
অরিণাৎ—দিয়েছে
একঃ—এক, অদ্বিতীয়
সু-অপস্যয়া—সুষ্ঠু কর্মেচ্ছা দিয়ে, সু-কর্মৈষণা দিয়ে
কবিঃ—দ্রষ্টা
উভা—উভয়
পিতরা—মাতা-পিতাকে
মহয়ন্—মহান করে
অজায়ত—জন্ম নিয়েছে
অগ্নিঃ—অগ্নি

দ্যাবাপৃথিবী—দ্যুলোক-ভূলোক

ভূরি-রেতসা—প্রভূত বীর্যবান, প্রভূত ধারাময়

বিশ্বদেবতার ক্রিয়াবলী হতে অদ্বিতীয় দ্রষ্টা কবি তাঁর কর্ম-এষণাবলে বৃহৎকে এনে দিয়েছেন, তিনি পিতামাতা দ্যুলোক-ভূলোক উভয়কে মহান করে ধরেছেন, তাদের বিপুল বীর্যধারা হতে জন্ম তাঁর ॥১১॥

কয়েকটি কবিতা

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

অমল মন্দির

অমল মন্দির দূরে
চলো কাছে যাই
রয়েছে ভুবন জুড়ে
খুঁজেছি বৃথাই।

হৃদয়ফুলের মত
প্রস্ফুট কমল
আলোর সোপান যত
রৌদ্রকরোজ্জ্বল।

নিসর্গে অম্লান দেখি
ঈশ্বরের মুখ
প্রসন্ন হাসিতে সে কি
তাকায় উৎসুক!

অমল মন্দির তাঁর
পরম আপন
খোলে যে হৃদয়দ্বার
শুভ্র সিংহাসন
সে দেখে আছে স্থির—
মর্ত্যে তাঁর অমল মন্দির।

চেনা

তোমারে সবাই ঘুরে, তোমাতেই ফিরি
অবিশ্বাসী যেমন ঈশ্বরে
অতিক্রমি মরু-নদী-গিরি
কোন এক আশ্চর্য প্রহরে
অন্তরঙ্গ বন্ধু রূপে জানে।

ঘরে ফেরা ক্লান্ত যাত্রা শেষে
হৃদয়ের আকুল সন্ধানে
সহসা দাঁড়ায় স্থির এসে
বারবার যারে ফেলি দূরে।

অনাবিল ভালোবাসা একান্তশরণ
বৃথা কি বিরহে মরি ঘুরে
একান্ত নির্ভর সে যে জীবনমরণ।

যার কাছে নিত্য চিরঋণী
বহুদুঃখে সত্য বলে চিনি।

জানা

তোমাকে জানব বলে কত প্রয়াস
ধীরে ধীরে নিজেকেই আমি জানি।
খুঁজছি অবিরত এ-ঘর, সে-ঘর
দেখি অবারিত আপন স্বরূপ।
যেন কিছুই ধরতে ছুঁতে পাই না
অথচ সারা ভুবন ছুঁয়ে দেখি আছি।

চলতে চলতে পথকে
যখন সত্য বলে জানি
জানি সেই আলোকিত পথ
তোমারই রচনা।
তবু চলতে হবে আমাকেই
চলতে চলতে
সত্যের মুখোমুখি হতে
আমি নিজেকেই খুঁজে চলব।

অমল কবিতা

কথা কি কবিতা হবে, কবিতা জীবন?
ধ্বনি দীপ্ত মন্ত্র উচ্চারণ
প্রকাশ নির্মল অকুণ্ঠিত
বৃন্তে পুষ্প অম্লান সুস্মিত।

ভাস্বর মুহূর্ত অবিচ্ছেদ
দূর হবে ভ্রান্তি বাধা ভেদ
আপনার অমল মহিমা
ধরা দেবে ভেঙে তার সীমা।

কলেপ কলেপ এই আয়োজন
অন্তরে বাহিরে দিবা রণ
নিরন্তর শুদ্ধির উৎসব
ব্যক্ত করে অপার বৈভব।

সৃষ্টি এক অমল কবিতা
উন্মীলিত শুষ্টিত সবিতা।

আগন্তুক

সুমিত্রা রায়

আমরা ছাড়া, আরও একদল
এই পৃথিবীতে বাস করে।
আসলে তারাই রাজত্ব করে, বাসহার করে আমাদের
রঙ্গমঞ্চের মত।

অতি ধূর্ত তারা, অদৃশ্য, অনাহূত অতিথি,
একা এসে দ্বার খুলে
আহ্বান জানায় শত সহস্রকে।
প্রতিটি রক্তবিন্দু মেদ, মজ্জা স্নায়ুতন্ত্রে
আসন নেয়, যেন তাদেরই বাড়ি ঘর,
বাগ বাগিচা, খেলার মাঠ।

অবিকৃত আমরা—অভিনয় করে যাই,
তাদের কান্না হাসি সৌন্দর্য্য আর মহত্বের খেলা,
তাদের ক্রোধ হিংসা, যুদ্ধ আর ধ্বংসের লীলা।
সর্বত্রগামী, এমন ওতোপ্রোত ভাবে মিশে যায়,
ভুল হয় স্বধর্ম্ম ব'লে।

অগণিত তাদের জনসংঘ, স্বভাবে যাযাবর
কখনও তো স্থিতি লাভ করে না।
অনুমতিও নেয় না অনুপস্থিত গৃহকর্ত্তার।

কিন্তু তাদের অভিনয়ের পর্দাটি
দিনে দিনে সচেতন আর সচকিত হয়ে ওঠে।
তৃষিত হয়ে থাকে, কখন অঙ্কিত হবে রাসলীলা,
ব্যথিত বিক্ষুব্ধ হয়, সংগ্রাম ক্ষেত্র হতে
নিজেকে দোষ দেয়, সযত্নে পরিহার করা চলে তাদের,
আর সেই সব সুন্দর ও মহৎদের আপন স্বগোত্র স্বকীয়ভাবে।
মহত্ত্ব আর পশুত্ব গলাগলি করে ক্রূর হাসে
এই পরাস্ত শিকারের পর্যুদস্ত অবস্থা দেখে।

কিন্তু একদিন সে নিজেকে ফিরে পাবে,
প্রতিষ্ঠিত হবে তার কর্ত্রীত্বে।
বুঝবে গৃহ কেবল গৃহকর্ত্তার
ধনী দরিদ্র উভয়েরই আশ্রয়দাত্রী সম্রাজ্ঞী।

বাঘেরা

রণজিৎ সরকার

বাঘেরা আমার ঘুমে জল খেতে আসে।
জল খেয়ে চাঁদের রুমালে মুখ মোছে
মাটির হরিণ হাঁস ঘুমোয় না আর।
বাঘেরা আমার মনে বিস্ময় বিছায়।

সুন্দরী গাছের ছায়া হাড়ের খাঁচায়
অনেক ধরেছি আগে। এখন আমার
দুই হাত ক্লান্ত বড়, তাই চুপ ক'রে
বসে থাকি অরণ্যের গহন কুণ্ঠায়।

বাঘেরা আমার চোখে প্রতিবিম্ব রেখে যায়।
আমি কিন্তু অরণ্যের সজীব তিমিরে
মরণের চিহ্ন আঁকি। প্রহরী পাখিরা
চলে যায় অনারোগ্য আমার উদ্দেশে।

বাঘেরা আমার ঘুমে সূর্য হয়ে যায়।

সাহস

রণজিৎ সরকার

তরঙ্গের তরল শিখরে
পান ক'রে ফেনায় মত্ততা
অন্তরের দুখ অবসরে
ভুলে যাই বন্দরের কথা।

ঢেঁড়া পালে গর্জে অকস্মাৎ
দিগন্তের মাতাল তুফান।
ঢেউএর ক্ষুব্ধিত আর্তনাদ
ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেয় প্রাণ।

নিবে যায় সূর্য তারা। মরে
বন্দরের কম্পিত নিশানা।
সমুদ্রের প্রলয় প্রহরে
মুছে যায় পৃথিবীর মানা।

তবু বলে রাখি জনান্তিকে
সাহস হয়নি ঝোটে ফিকে:

প্রতিচ্ছবি

মীরা মুখোপাধ্যায়

শ্বেতসরষূর সূক্ষ্ম কাজলরেখা
হিমের রাতে ঘ্রাণে অগ্নিশিখা,
মন্দমধুল করুণ অভিমানে
দগ্ধনারী অর্ধভস্মচিতা।
অশোককুঁড়ির শান্ত দীপান্বিতা
স্বরসাগরে মগ্ন শুচিস্মিতা,
কদম্ববনে পুষ্প আড়ম্বরে
নিমন্ত্রিতা তন্বী বনলতা।

কবিতাটির ইংরাজীতে মুক্ত ভাবানুবাদ দিয়েছেন নলিনীকান্ত গুপ্ত—

An Impression

A frail aspiring flame flickers out,
A little soul crosses over
to the other shore,
leaving its burning body.
It reappears as a bud of light,
a wave of music,
a blissful smile,
In the woodland of Heaven!
A creeper damsel seeking its
Kadamba-shelter;
A darling, invited guest to
the festival of Rasa.

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

১৪ই জুলাই, ১৯৫০

(এই ১৪ই জুলাইএর বাড়ি পোড়ানো ও বোমা ফাটার তুমুল শব্দের জন্য মায়ের উক্তিগুলি লিপিবদ্ধ করতে অসুবিধা হয়েছিল)

প্রশ্ন : মধুময়ী মা, শ্রীঅরবিন্দ কি ভগবান এবং শক্তি এই দুটি কথা বিভিন্ন অর্থে বলেছেন? কারণ তিনি তাঁর The Mother বইখানিতে বলেছেন যে আমাদের সমস্ত চিত্ত ও বিত্ত ও কর্ম ও চেতনাকে সমর্পণ করতে হবে ভগবানের কাছে—এবং শক্তির কাছে?

উত্তর : তিনি মূল পরাৎপর সত্তাকে বলেছেন ভগবান। ঐ অধ্যায়টির গোড়াতেই কি "ভগবান" বলেননি?

(প্রশ্নকারী পড়ে শোনালো—"ভগবান সব কিছু কাজ করেন শক্তির মাধ্যমে")

হাঁ, শক্তিকে বলেছেন কর্মকারক শক্তি, সৃষ্টিকারী সক্রিয় চেতনা।

প্রশ্ন "সমর্পণ করা চাই চেতনার সকল স্তরে",—এর অর্থ কি?

উত্তর তার মানে সমর্পণ করতে হবে তোমার দেহের ও প্রাণের ও মনের ও চৈত্যের সবগুলি স্তরে। আর কোনো স্তরের চেতনা থাকলে তারও স্তরে।

প্রথমত তোমাকে চিনে নিতে হবে তোমার সত্তার মধ্যে অধস্থিত বিভিন্ন অংশগুলিকে, আর স্পষ্টভাবে চেনা হলে তখন একে একে সেগুলিকে যথাক্রমে সমর্পণ করতে থাকবে।

প্রশ্ন মা, "যোগমায়া" কথাটির অর্থ কি?

উত্তর যোগ-মায়া? এখানে এই মায়া শব্দটি কোন অর্থে বলেছেন জানিনা। হয়তো বাহ্য অভিব্যক্তিগুলির সম্পর্কেই কি তাই বলেছেন? প্রশ্নকর্তা পড়ে শোনালো সেই পংক্তির শেষের কথাগুলি—"যোগ মায়ার আবরণে সে আবৃত হয়")

মা: হাঁ, যোগের ক্রিয়ার বাহ্য মায়ার দ্বারা আবৃত। ওর প্রকৃত অর্থই তাই, জগৎ ব্যাপারে যে বাহ্য অভিব্যক্তি থাকে আর ব্যক্তিসত্তার মধ্যে যে বাহ্য অহং থাকে, তাই মায়া।

প্রশ্ন : পড়ে বললে—"সে জীবের অহংএর মধ্যে ক্রিয়া করে"।

উত্তর হাঁ, ঐ একই কথা। "মধ্যে", অর্থাৎ যেখানে তার অহং আছে।

প্রশ্ন মধুময়ী মা, এখানে রয়েছে—"নিম্নপ্রকৃতি যতক্ষণ আছে সক্রিয় ততক্ষণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার লেগে থাকা চাই।" নিম্নপ্রকৃতি কেমন ক'রে সক্রিয় থাকে তা আমি বুঝিনা।

উত্তর : সাধারণ ভাবে নিম্নপ্রকৃতি সর্বদাই তো রয়েছে সক্রিয় হয়ে। কেবল আত্মসমর্পণ যখন পুরোপুরি সাধিত হয় তখনই তার ক্রিয়া থামে। পূর্ণ সমর্পণের ফলে যখন নিম্ন চেতনাতে কিছু নেই তখন সে প্রকৃতি আর তেমন কাজ করে না। কিন্তু সে যতক্ষণ কাজ করছে ততক্ষণ তোমাকে প্রচেষ্টা রাখতে হবে।

বস্তুত যতক্ষণ তোমার সে চেতনা নিজেকে একজন স্বতন্ত্র মানুষ বলে বিশেষ ক'রে জানছে ততক্ষণ তোমার নিজের চেষ্টাগুলিও অব্যাহত থাকা চাই। যখন নিজেকে আলাদা কেউ বলে ভাবা ঘুচে যাবে, অর্থাৎ তোমার সমর্পণ সার্থকভাবে ঘটবে আর ভগবানের অস্তিত্বের মধ্যে মিশে এক হয়ে যাবে, তখন আর চেষ্টার দরকার হবেনা। কিন্তু ঐ স্বাতন্ত্র্য-বোধটুকু যতক্ষণ আছে ততক্ষণ চেষ্টাও অবিরাম থাকবে। ওকেই তিনি বলেছেন নিমুচেতনার ক্রিয়া।

(নীরব হলেন)

প্রশ্ন : মা, সত্য কথা বলতে ভয় পাই কেন?

উত্তর : হাঁ, কেন পাও? আমিও তাই জানতে চাই। কেন সেটা হয়? কিন্তু তাই হয়ে থাকে। কারণটা বোধ হয় এই যে নিজের যেটা বাহ্যপ্রকৃতি সেমনভাবে আছে সেটা নিজেকে তার থেকে বদলাতে চায়না। তাই কোনো সত্য শক্তি যদি তাকে সত্যের দিকে টানতে যায় অমনি সে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

(হঠাৎ বাড়ির বোমা ফাটার তুমুল শব্দ সমস্ত কণ্ঠস্বরকে ডুবিয়ে দিলে)

মা এ ভালো হলো, আমাদের সকল কথাবার্তা ওর মধ্যে হারিয়ে যাবে। (বিশ্বনাথের দিকে ফিরে) ঐ শব্দটা বন্ধ করতে পারো? আমরা ওর রেকর্ড করতে চাই না। (হাস্য)

প্রশ্ন বই থেকে পড়ে—"তামসিক সমর্পণ কোনোরূপ শর্তই মানে না"—তবে সে তো সমর্পণই হলোনা!

উত্তর তা তো ঠিকই, কিন্তু অনেকে সমর্পণ করছি মনে ক'রে ভাবে—"আমি এই তো ভগবানের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছি, এবার যা কিছু করা দরকার তা তিনিই ক'রে দেবেন, আমার কিছু আর করতে হবে না।" এই মনের ভাবটিকেই তারা বলে সমর্পণ। অর্থাৎ সেই আলস্য ও তামসিকতার জন্যে তারা নিজে কিছু খাটতে রাজী নয়, যা করবার তিনি করুন, যেহেতু সেটাই সুবিধাজনক।

প্রশ্ন : "হৃদয় দিয়ে চাওয়া" কাকে বলে?

উত্তর : হৃদয় থেকে চাওয়া মানে আবেগময় সত্তায়...(আবার বোমা ফাটানোর বিকট শব্দে ছেলেরা চেঁচিয়ে উঠল)

শব্দটা হচ্ছে কোথায়? অন্যদিকে হচ্ছে বলে দেখা যাচ্ছেনা, কেবল শব্দই কানে আসছে।

হৃদয়ের চাওয়া মানে তোমার আবেগসত্তা অনুভব করতে চাইছে ভগবানের সঙ্গে একটা হৃদয়ের সম্পর্ক। একটা ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ। এই আসল কথা! (আবার প্রবল শব্দ হওয়াতে মা বিশ্বনাথকে বললেন সেটা থামিয়ে দিতে)

জনৈক শিশু। না মা, না মা।

মা : আমি যে ওতে অন্য কিছু শুনতেই পাচ্ছিনা। (পূর্বের শ্রোতার প্রতি) আর কি আছে?

প্রশ্ন মা, আমরা অকারণ এত বেশি কথা বলি কেন?

উত্তর লোকে কেন এত বেশি কথা বলে? সেটা ঠিক কথা, বোধ করি মানুষ যে অক্লেশে কথা বলতে পারছে, সেইটুকু ক্ষমতার গর্বেই আপন প্রবৃত্তি থেকে অনেক বলতে থাকে! জগতে কেবল মানুষই হলো একমাত্র প্রাণী যে এই সুযোগটি লাভ করেছে, সু-নিয়ন্ত্রিত শব্দের দ্বারা ইচ্ছামত বলতে পারছে! এ যেন সেই...ছোটো শিশুরা যখন প্রথম কথা বলতে পারে তখন যেমন খেলনা পেয়ে খুশি হবার মতো তাই নিয়ে কথা বলার খেলাতে মেতে ওঠে, তেমনি মানুষ যখন কথা বলার শক্তি পেলে, যা পৃথিবীর অন্য কোনো জীবরা পায়নি তখন থেকে এমনি বেশি কথাই বলতে থাকল। এটাই কারণ বলে মনে হয়।

এ ছাড়া রয়েছে আবার মানুষের বোকামি।...আমি তাই বলেছিলাম যে অনেকে যখন মুখে কথা বলা আরম্ভ করে কেবল তখনই তারা মনের মধ্যে চিন্তার কাজ করতে পারে। কথা বলা ছাড়া চিন্তাই তাদের মধ্যে থাকেনা! নীরব থেকে চিন্তা করা যায়না বলেই তারা কথা বলাটা অভ্যাস করে। কিন্তু মানুষের জ্ঞানের বুদ্ধির বিকাশ যতই বেশি হতে থাকে ততই কথা বলার প্রয়োজন তার কমে আসে। যতক্ষণ সে নিম্নস্তরে থাকে ততক্ষণ বেশি কথা বলাই তার দরকার। কিন্তু যার চেতনা উন্নত ও বুদ্ধিদীপ্ত হয়েছে সে কেবল দরকারের সময়টিতেই কথা বলে। অন্য সময়ে বাজে কথা সে বলে না। সমাজের বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী এই রকম দেখা যায় —যারা সর্বনিম্ন স্তরের অন্তর্গত তারা অনেক বেশি কথাই বলবে! কারণ তারা জানেনা যে কোথায় থামতে হবে। সব কিছুকেই কথায় ব্যক্ত করতে চাইবে। আর বিবর্তনের ক্ষেত্রে যতই মানুষ উপরের স্তরে উঠবে ততই বেশি কথা বলার প্রয়োজনটা কমে আসবে।

দুই রকমের কারণে এমন হয়। প্রথমত, নতুন কিছু করার ক্ষমতা পেলে তখন একটা প্রবৃত্তিই আসে সেটাকে বেশি বেশি প্রয়োগ করতে। আর দ্বিতীয়ত কথা বলার ভিতর দিয়েই স্পষ্ট করে জানতে পারা যায় নিজের ভিতরকার চিন্তাকে। বাক্যে উচ্চারণ করাতে থাকলেই সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাটি সুগঠিত হয়ে ওঠে। কিন্তু কথা বলাই যাদের পেশা, যেমন শিক্ষক, রাজনৈতিক বক্তা, বুদ্ধিজীবী, যারা কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ভাবপ্রকাশ করে, তারা ছাড়া এমনিতেই যাদের জ্ঞান যত সীমাবদ্ধ তারা সেই পরিমাণে কথা অনেক বেশি বলে।

প্রশ্ন বেশি কথা বলা কমানোর কি উপায়?

উত্তর : মনে চিন্তা করো। আরো একটু বেশি করে ভাবো। কিছু বলার আগে যদি সেটা ভেবে নিয়ে তার পরে বলতে অভ্যাস করো, তাহলে তাতেই অনেক বলাও অর্ধেক কমে আসবে। যা বলতে চাও তা আগে ভেবে নেওয়া আর যেটুকু দরকার সেইটুকু মাত্র বলা, এই অভ্যাসটা হলেই দেখবে যে বাস্তবিক বলা দরকার খুব কমই—কেবল যখন অপরের সঙ্গে কাজ করো তখন বলা দরকার হয়, "এইটা করো" বা "এটা ওটা দাও", বা "এমনি হওয়া চাই।" কিন্তু ওর মধ্যেও কথা কমানো যায়, নতুবা...

(আবার হলো বিকট শব্দ)

ওগুলো বোধহয় উড়ন্ত চাকি, অনেক উপরে উঠবে। এ ব্যাপার আর কতক্ষণ চলবে?

প্রশ্ন আরো আধঘন্টা।

অন্যজন দশটা পর্যন্ত চলবে।

উত্তর দশটা পর্যন্ত? তাহলে আমাদেরও চলুক। আর কার কি প্রশ্ন আছে? এবার কার বলার পালা?

প্রশ্ন মধুময়ী মা, কখনো কখনো দেখি যে ধ্রুব সত্য বলে যেটা জানি তাকেও সন্দেহ করতে থাকি, এমন জিনিস কেন হয়? (পুনরায় বিকট শব্দ হওয়াতে কিছু শোনা গেলনা)

উত্তর কি বলতে চাইছ তা পরিষ্কার ক'রে আবার বলো, তোমার তাতেও একটা এক্সারসাইজ হবে (হাস্য)।

প্রশ্ন অর্থাৎ সত্যকে সত্য জেনেও তাকে সন্দেহ করতে থাকা।

উত্তর এর সোজা জবাব, তুমি বোকা বলে তাই (হাস্য)। আসল কথা। দেহ-গত যে স্থূল মনটি সেই হলো নির্বোধ। এ কথা অনায়াসেই প্রমাণ করা যাবে। ঐ মন এমন খুঁতখুঁতে ভাবে তৈরি, কেবল দেখে কোথাও কিছু ভুল ত্রুটি করা হচ্ছে না তো। সেটাই তার স্বভাব, আর সন্দেহ করাই হয়তো আগেই অভ্যাস করে থাকে।

আমি একবার এই নিয়ে একটু পরীক্ষা করেছিলাম সে কথা হয়তো বলেছি তোমাদের। একবার আমি এই সন্দিগ্ধ স্থূল মনের উপর শাসন যাতনা ক'রে রাখলাম,—আর একটা ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে যখন অন্য ঘরে যাচ্ছি তখন ঐ স্থূল মন বললে—"ও ঘরের দরজাটা বন্ধ করেছ কি? যাও, একবার দেখে এসো।" ওর কথায় বাধ্য হয়ে আমি ফিরে গিয়ে দেখলাম যে দরজা ঠিকই বন্ধ করা হয়েছে। যখন ফিরে যাচ্ছি তখন আবার ঐ মন বললে, "চোখ দিয়ে ভালো ক'রে লক্ষ্য করেছ কি? আবার ভালো করে দেখে এসো।" তাই আবারও যেতে হলো। এমনি বার কয়েক হতে থাকলে তখন আমি বললাম—" "থাক থাক, যথেষ্ট হয়েছে, আর আমি দেখতে যাবো না।" জোর ক'রে এমন না বললে সারাক্ষণই ঐ মন ঐভাবে খুঁতখুঁত করতো।—এই ব্যাপারই ঐ মনের দ্বারা হয়ে থাকে। কেবল যখন তোমার উচ্চস্তরের বিবেচক মন তাকে ধমক দিয়ে বলে "তুমি চুপ ক'রে থাকো," তখন সে চুপ করে। নইলে নিত্যই সে ঐ রকম করতে থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে যখন তুমি ঐ মনের খপ্পরে গিয়ে পড়ো, তখন যেটা ঠিক সত্য বলে জানো আর তার প্রমাণও পেয়েছ, তখনও ঐ দরজা বন্ধ করার সন্দেহের মতো ঐ মন সন্দেহ জাগাতে থাকবে। কারণ সন্দেহের উপাদান থেকেই সে তৈরী হয়েছে। সর্বদা সব জিনিসের বেলাতেই সে ঐরকম বলবে—"তুমি কি সঠিকভাবে জানো যে ও কথা সত্য?...ওটা কি তোমার ধারণা মাত্র নয়? ভেবে দেখ, তাই কি মনে হচ্ছে না?" এমনি ভাবে সে তার কাজ চালিয়ে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে নীরব হতে শিক্ষা না দাও।

প্রশ্ন এখানে লেখা রয়েছে—"এটা ঠিক জেনে রাখো যে তামসিক সমর্পণ, মানে যাতে বলে যে ভগবান নিজেই সব কিছু ক'রে নেবে যা না করা দরকার—

উত্তর হাঁ হাঁ, কিন্তু ঐ প্রশ্ন সম্পর্কে তো এইমাত্র আমি বলছিলাম! ঐ প্রশ্নই কে একজন করেছিল।

প্রশ্ন কিন্তু ভগবানই হচ্ছেন সাধনা, তা কি ক'রে হবে?

উত্তর অর্থাৎ ভগবানই তোমার সত্তার মধ্যে থেকে সাধনার কাজ করেন। ভিতরে তিনি না থাকলে সাধনাই হবেনা। তবে তুমি তা জানতে পারোনা, মনে করো—মোহবশত—যে তুমিই তা করছো। আর যতক্ষণ ঐরূপ মোহ থাকবে ততক্ষণ তোমাকে প্রয়াসও ক'রে যেতে হবে। কিন্তু বস্তুতপক্ষে তিনিই তোমার মধ্যে সাধনা করছেন, তিনি ছাড়া সাধনা হতে পারেনা।

প্রশ্ন কিন্তু লেখা রয়েছে—"ভগবানই সাধনা ও সাধক"।

উত্তর তাই তো, তিনিই তো সব কিছু, তাই নয় কি?

প্রশ্ন হাঁ, তা ঠিক বটে।

অন্য জন কিন্তু না, তাহলে ব্যক্তিগত চেষ্টার দরকার কি? ভগবানই যখন সে কাজ করছেন, তখন তিনিই শুধু করুন, আমার ব্যক্তিগত ভাবে করবার কি দরকার?

উত্তর হাঁ, যারা অলস হয় তারা ঐরকম কথাই বলে। কিন্তু তুমি নিশ্চয় তেমন অলস নও, তুমি তা বলবে না (হাস্য)।

প্রশ্ন ব্যক্তিগত চেষ্টা করার অর্থ কি?

উত্তর যে চেষ্টার কাজ তুমি নিজে করছো বলে ভাববে। নিজেকে যতক্ষণ স্বতন্ত্র একজন বলে জানবে ততক্ষণ তাই হবে। তুমি কি ভাবো যে বাস্তবিক তুমি ভগবান, তাই সত্যসত্য বোধ করো কি? না (হ্যা), কিন্তু ভগবান তো প্রকৃতপক্ষে তাই। নিজেকে যতক্ষণ তুমি মনোজ বলে মনে করো, ততক্ষণ চেষ্টার কাজ মনোজই করবে। যখন ঐ আলাদা ভাবের মনোজ পরিচয় আর থাকবে না, তখন ভগবান ছাড়া অন্য কিছু নেই, তখন অবশ্য চেষ্টার কাজটিও ভগবানই করবেন। কিন্তু মনোজ যখন আছে তখন চেষ্টাও হবে তার।

প্রশ্ন: যখন মনোজ যখন চেষ্টার কাজ করছে, তখন তো বস্তুত ভগবানই তার ভিতর থেকে তা করছেন?

উত্তর: হয়তো তাই, কিন্তু মনোজ নিজে তা জানে না (হাস্য) আমি বলতে চাইছিলাম যে ভগবান না থাকলে মনোজ সে চেষ্টা করতেই পারতো না। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সে বোধ তার না আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার ব্যক্তিগত চেষ্টা চাই।

প্রশ্ন আচ্ছা, এখন সে কথা জানলাম, আপনি যখন বলছেন।

উত্তর ও, হো হো হো (হাস্য) তোমার ঐ মনের ধারা জানা তো আসলে জানাই

হলোনা, ভিতরে বাস্তবরূপে সেটা অনুভব হওয়া চাই। তা না হলে, ছেলেরা,—তাহলে তো বহু পূর্বেই আমরা রূপান্তর পেয়ে যেতাম, কারণ অনেক আগের থেকেই তো জেনেছি যে রূপান্তর হবে। (হাস্য)

আর কিছু বলবার আছে? থাকলে বলে যাও।

প্রশ্ন মধুময়ী মা, সমর্পণ, আত্মদান, ও নিবেদনে কি পার্থক্য?

উত্তর: পার্থক্য? এ কথা তো আমাদের পড়া হয়েছিল কোথাও থেকে, নয় কি? Elements of Yoga বইটির মধ্যেও তো বলা হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা ছেলেরা যদি...

প্রশ্ন ওতে আছে বিশ্বাসের সম্পর্কে প্রভেদের কথা।

উত্তর: অ্যাঁ! তাই কি?

প্রশ্ন ওতে আছে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ও আস্থায় কি পার্থক্য।

উত্তর তাই আছে? তাহলে অন্য কোথাও যেন পড়েছি।

প্রশ্ন মা, পাঞ্চল বলছে যে এ প্রশ্ন সেই করেছে।

অন্য জন ওটি আছে Prayers and Meditations সম্পর্কে।

উত্তর ও, Prayers and Meditations সম্পর্কে?

প্রশ্ন হাঁ, মা।

উত্তর আচ্ছা আমি সেখানে কি বলেছিলাম? এটা বেশ কৌতূহলের বিষয় (হাস্য)

(মা কিছুক্ষণ নীরব রইলেন)

পবিত্র ওর সঙ্গে আরো একটি যোগ করা যায় "উৎসর্গ"।

উত্তর বোধহয় সবগুলির অর্থ মোটামুটি একই রকমের হবে, কেবল ওর গুরুত্বের ও গভীরতার দিক দিয়ে কিছু ইতরবিশেষ করা হয় মাত্র। একই লাইনের মধ্যে একটি শব্দের স্থানে অন্যটিকে ব্যবহার করা চলে। সেই পংক্তির মধ্যে কোথায় কোন শব্দটি শোনাচ্ছে ভালো, তারই উপর নির্ভর করে। অনেকটা সাহিত্যের তরফের প্রশ্ন। তবে ইচ্ছা করলে তুমি বিভিন্ন শব্দে বিভিন্ন অর্থ আরোপ করতে পারো, যেমন অর্থ তুমি নিজে বোধ করবে।

আমি তো বলে রেখেছি যে ফরাসী ভাষাতে সমর্পণকে যে soumission বলা হয় তা ঠিক অর্থজ্ঞাপক নয়, কারণ ওর প্রকৃত অর্থ হলো সমর্থণ বা সায় দেওয়া। কিন্তু সমর্পণেতে থাকা চাই সম্পূর্ণ সংযোগ। তার স্থলে ঐ ফরাসী soumisson শব্দটি ঠিক খাপ খায়না।

(নীরব থেকে)

যদি চুলচেরা ভাগ ক'রে দেখতে চাও ঐ তিনটি শব্দের অর্থ পার্থক্য নিয়ে—সমর্পণ

ও আত্মদান, ও নিবেদনের মধ্যে—তাহলে সেখানে অন্য কিছু উপসর্গ যোগ করতে হয়। নতুবা যেখানে যে শব্দটি তোমার লিখিত লাইনের ছন্দের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে সেখানে তাই বসানো চলে। কিন্তু তার অর্থকে পরিষ্কার করতে হলে তার সঙ্গে উপযুক্ত বিশেষণ যোগ করতে হবে। যেমন "আত্মদানের" বেলা বলতে হবে "পূর্ণ আত্মদান", সমর্পণের সঙ্গে হয়তো বলবে "আংশিক সমর্পণ"। এমনি কোনো কিছু বিশেষণ চাই।

এ প্রশ্নটি কে করেছে? তুমি? লিখবার বেলাতে তুমি ওর যে কোনো একটি বেছে নিতে পারো, কিন্তু ফরাসী সেই soumission শব্দটি নিলে তাতে সমুচিত ভাব প্রকাশ হবে না, ওর অর্থ হবে সায় দেওয়া ও সহযোগিতা করার মাঝামাঝি একটা কিছু। এক স্থলে হলো পূর্ণ সংযোগ আর অন্য স্থলে দাঁড়ালো যেন অগত্যা সায় দেওয়া। পুরো সংযোগ বলা হলো না।

আর কিছু প্রশ্ন আছে?

প্রশ্ন যেদিন আপনি বললেন, পাথরেরও একটা চেতনার গ্রহিষ্ণুতা আছে।

উত্তর হাঁ।

প্রশ্ন সে গ্রহিষ্ণুতা কেমন রকমের বলা যায়?

উত্তর তাকে এক রকমের চেতনার কাজও বলতে পারো। আর এমন সম্পূর্ণ ও নিখুঁত গঠনের মণি-পাথর আছে যাকে বহুমূল্য হীরক বলো। যার সেই পূর্ণতা থাকা মানেই—তা চেতনার ধারণের লক্ষণ—তেমন বিশেষ রকম পাথরের মধ্যে তুমি বিশেষ কিছু চেতনা ও শক্তি আরোপ ক'রে দিতে পারো। শক্তিকে সেখানে কেন্দ্রীভূত ক'রে রাখতেও পারো। সেই স্থলে সে গ্রহিষ্ণু হয়ে থাকে, নতুবা শক্তিকে ধারণ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। যেমনভাবে ব্যাটারির মধ্যে ইলেকট্রিসিটি চার্জ করা যায় তেমনি ভাবে ঐরূপ পাথরের মধ্যে শক্তিকে চার্জ করা যায়। পাথর তখন সেই শক্তিকে কারো উপরে প্রভাবদান করতে পারে। নিশ্চয় তার মধ্যে সেই গ্রহিষ্ণু রাখা আছে, নতুবা এমন কাজ করা সম্ভব নয়।

এই গ্রহিষ্ণুতা আছে ফুলের মধ্যে খুব বেশি। আমি যে সব ফুলের নানারকম অর্থ দিয়েছি, তারা সেই ধরনের শক্তিকে গ্রহণ করতে পারে বলেই, আর তা অন্যকে সাহায্য দিতেও পারে। গ্রহিষ্ণু না হলে সকলে তা নিতে পারে না, সুতরাং সেখানে সেই ফুলের মধ্যে যে শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে তা ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু ফুলের গ্রহিষ্ণু হওয়াতে আশ্চর্যভাবে শক্তিকে গ্রহণ ও ধারণ করতে পারে।

বহুপূর্বে এ সত্য আমি জেনেছি, প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। বিশেষ গুহ্যবিদ্যার একজন গুণী ব্যক্তি ছিলেন যাঁর কাছে আমি দু'বছর যাবৎ শিক্ষা নিয়েছি। তাঁর স্ত্রীরও ছিল এক আশ্চর্য ক্ষমতা, তিনি শক্তিকে সঞ্চারিত করতে পারতেন। এঁরা থাকতেন নেয়্‌সেনে, আর আমি প্যারিসে। তখনও এঁদের চোখে দেখিনি, কেবল পত্রালাপ চলতো। একবার তাঁর চিঠির মধ্যে পাঠালেন তিনি কিছু ডালিয় ফুলের পাপড়ি (ভগবৎ প্রেম)। এ ফুলের সেই নাম তখনও দেওয়া হয়নি। চিঠিটার মধ্যে তিনি লিখলেন যে এই তাঁর পাঠানো ফুলের মারফতে আমার মধ্যে শক্তি ও সহায়তা সঞ্চারিত করা হলো।

ঐ সময়ে আমার ঘড়ির সঙ্গে একটা চেন লাগানো থাকতো। (তখনও রিষ্ট ওয়াচের চল হয়নি। আর তাতে ঝোলানো থাকতো অষ্টাদশ শতাব্দীর একটা আতসী কাঁচ, ছোট্ট দুটি লেন্স দেওয়া এবং একটি সোনার ফ্রেমে আঁটা। ফুলের পাপড়িগুলি গুঁজে রাখলাম সেই দুটি লেন্সের মাঝখানে, যাতে সর্বক্ষণ তা আমার সঙ্গে থাকে। কারণ আমি বিশ্বাস করতাম ঐ মহিলাকে ও তাঁর শক্তিকে, ওগুলি কাছে রেখে আমি একটা শক্তির ও আশ্বাস এবং উষ্ণতার স্পর্শ অনুভব করতাম। অবশ্য সেটা চিন্তা করা ছাড়া এমনিই তা বোধ হতো।

কিন্তু অকস্মাৎ একদিন বিনা কারণে নিজেকে যেন খুব রিক্ত ও দুর্বল ও শক্তিহারা বোধ হতে লাগল। কেন যে এমন বিশ্রীরকম বোধ হচ্ছে তা বুঝলাম না, কারণ তেমন কিছু অপ্রীতিকর ব্যাপার তো ঘটেনি। তাহলে আমার এ হলো কী? ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যার সময় ঘড়ি ও চেন হাতে নিয়ে দেখি যে ঐ দুটি লেন্সের মধ্যে একটি কোথায় পড়ে গেছে, আর সেই সঙ্গে পাপড়িও গেছে, সেই পাপড়িগুলির একটিও নেই। তখন বুঝলাম যে পাপড়িগুলি কতখানি শক্তিধর ছিল, তাই সেগুলি খোয়া যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজের শক্তিও হ্রাস পেলো আমার অজ্ঞাতসারে। তাই ভিতরটা যেন শূন্য বোধ করছিলাম। তখন জানলাম যে ঐ ফুলের পাপড়িগুলি থেকে কত শক্তি পেয়েছিলাম। তাতেই জানলাম যে ফুলের মধ্যে ঐরূপ শক্তি প্রয়োগ করা যায় যার তারা এত বেশি গ্রহিষ্ণু।

(পুনরায় নিকট বুন্ বুন্ শব্দ)

আচ্ছা এই যথেষ্ট। আর কোনো প্রশ্ন আছে?

প্রশ্ন : মা, ফুল নষ্ট হয়ে গেলেও কি তার শক্তি অটুট থাকে?

উত্তর : না গো ছেলে, নষ্ট হলে আর থাকে না, তবে শুকিয়ে গেলে থাকে। নষ্ট হওয়া মানে তার অস্তিত্বই আর রইল না, তার শক্তিটা তখন হয়তো মাটির সঙ্গে মিশে যায় এবং তা হয়তো অন্য ফুল জন্মাতে সারের কাজ করে। কিন্তু এমনি শুকিয়ে যাওয়া অন্য কথা, তার শক্তি তখনও অনেকটা অক্ষুণ্ন হয়ে থাকে।

কালী পূজার দিনে আমি তোমাদের যে ফুলের পাপড়ি ছোটো ছোটো খামের মধ্যে ঢুকিয়ে দিই, তার মধ্যে তার শক্তিটা পুরো এক বছর পুরোপুরি বজায় থাকে, তাই প্রতি বছরেই আমি নতুন করে ফুল দিই। ...জানি যে দশের মধ্যে তোমরা একজনও তার সদ্ব্যবহার করো না...তবুও দিই, কারণ কেউ না কেউ তার থেকে উপকার পাবে। এক বছর তার শক্তি ঠিক থাকে, তাই বৎসরান্তে নতুন ফুল যখন দিই তখন আগেকারটা ফেলে দিতে পারো। ততদিনে ফুল হয়তো গুঁড়িয়ে যায়, যদিও সবগুলি নয়...কিন্তু সেই খামের মধ্যে শক্তি ঠিকই থাকে।

প্রশ্ন : মধুময়ী মা, প্রত্যহ ফুল নিয়ে কি আচরণ করবো?

উত্তর : যতক্ষণ তাজা আছে ততক্ষণ তাকে যত্ন ক'রে রাখবে আর যখন তা থাকবে না তখন সেগুলিকে জড়ো করে তোমার চেনা কোনো মালিকে দেবে, সার তৈরি করার জন্য। অর্থাৎ মাটির কাছে যা পেয়েছিলে মাটিকেই তা ফিরিয়ে দেবে যাতে তা উর্বর হয়।

প্রশ্ন না, কোনো কোনো ফুল কেবল নির্দিষ্ট ঋতুতেই ফোটে তার মানে কি তখন তার মধ্যে বেশি শক্তি জন্মায় ?

উত্তর এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। তবে আমি এক ভাবে ঐ নিয়ে পরীক্ষা করেছি।

তোমাদের স্মরণ হবে কি না জানিনা, যারা তখন উপস্থিত ছিলে—আমি সমস্ত ফুলগুলি গুণতাম। প্রকৃতির সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করা ছিল। ফুলকে কেবল তার বিশেষ রকম নামই দিতাম না, তার একটা বিশেষ মূল্য দিতাম। যেমন মনে করো "রূপান্তর" নামক ফুলটি সম্পর্কে। যদি তোমরা মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করো তাহলে দেখবে যে ঋতুতে ঋতুতে যখন ফুলের বদল হয় তখন তাদের পরস্পরের তাৎপর্যের একটা ক্রমিক ধরনের যোগসূত্র থাকে, যাকে তুমি সারা বছর ধরে অনুসরণ করতে পারো। আবার স্থায়ী রকমেরও ফুল আছে। ...কিন্তু এই রূপান্তর নামের ফুলটি তার বিশেষ ঋতুতেই ফোটে, যদিও দীর্ঘকাল ধরে।

"উপলব্ধি" নাম দেওয়া যে ফুলটি তাও দীর্ঘ ঋতুর ফুল, যদিও "রূপান্তরের" সঙ্গে এক ঋতুর নয়। ...ওদের মধ্যে একটির কাল ফুরোলে তখন অন্যটি ফোটে। সকল ফুলের বেলাতেই এমনি আপন আপন ঋতুতে যথাক্রমে তারা অজস্র মাত্রাতে ফুটতে থাকে। এমনি ভাবেই বিভিন্ন ফুলের প্রকাশ সাজানো হয়েছে ঋতু হিসাবে। এখানেই তোমার প্রশ্নের জবাব দেওয়া হলো, নয় কি তবে কোনো কোনো ঋতু ফুলের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

কিন্তু সকল ফুলেরই নিজস্ব একটা সংখ্যাগত বৈশিষ্ট্য আছে। সেটা নির্ণয় করতে আমি প্রত্যেক রকমের ফুলের সংখ্যা গুণে লিখে রাখতাম। সেই সংখ্যা লেখার জন্যে এত লম্বা লম্বা কাগজ দেখছ তো (হাত ছড়িয়ে ইঙ্গিত করলেন) সেই সব সংখ্যাকে যোগ করতে কাগজ আরো লম্বা করতে হয়েছে। এ সম্পর্কে আমার একটা মতলব ছিল। এই নিয়ে অনেক খেটেছি, কিন্তু বেশি সময় নিচ্ছে বলে আমি এ কাজ ছেড়ে দিলাম। সংখ্যা যোগ দিতে দিতে কাগজ যখন আরো বেশি লম্বা করা দরকার হলো, তখন অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো (মা হাত বিস্তার ক'রে ইঙ্গিত করলেন), তাই বাধ্য হয়ে থেমে গেলাম। কিন্তু ফুলের কেবল সংখ্যামূল্য ছাড়াও অন্য বিশেষ মূল্য আছে।

তাই প্রকৃতির সঙ্গে আমার এই বোঝাপড়া করা রইল যে আমার কাজের দরকার বুঝে প্রকৃতি বিশেষ বিশেষ ফুলের সংখ্যা নিরূপণ করবে, আর শুধু তাই নয়, তাদের তাৎপর্যও বিভিন্ন রকম থাকবে। যেমন, "রূপান্তর " নাম দেওয়া ফুলটি তার ঋতুতে যখন হাজার হাজার সংখ্যাতে ফুটবে, তখন তার দ্বারা হাজার লোকের রূপান্তরের কাজও হবে (প্রকৃতির সঙ্গে এই রকমই ছিল ব্যবস্থা)। সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী যখন কাউকে দুই তিন চার বা পাঁচ সংখ্যাতে ঐ ফুল দিতাম তখন তার মানে সেই ব্যক্তির ভিতরকার পাঁচরকম উপাদানেরও রূপান্তর আনার শক্তি দিতাম। অবশ্য তা মস্তিষ্কের ভিতর দিয়ে নয়, কারণ মস্তিষ্কে কিছু ঢুকলেই মানুষ তাই নিয়ে নানারকম ক্রিয়া শুরু ক'রে দেয় এবং আসল জিনিসকে নষ্ট করে ফেলে। তাই আমি মূলের কথায় কিছুই বলতাম না।

সকল রকম ফুলেরই বেলাতে ঐ রকম। যেমন "আশ্লিষ্ট" নাম দেওয়া যে ফুলটি তা ঋতুর সময়ে আসতো পাত্র ভরে হাজার হাজার সংখ্যাতে এবং তাও গোণা হতো, তার

প্রত্যেকটিরই মধ্যে থাকতো আত্মপ্রকাশশক্তি। আজকাল যখন আমি "প্রার্থনা" নামক ফুলটি বিতরণ করি তখন বলি, "অবহিত হও, প্রার্থনা মঞ্জুর হবে"। এটা তোমাদের মনে থাকতে পারে। আর বলি, "প্রার্থনা সম্বন্ধে সাবধান হবে"। অর্থাৎ প্রার্থনা করবে কেবল তারই জন্যে যা তোমার প্রকৃতই প্রয়োজন। সে প্রার্থনা সফল হবে। কারণ ফুলটি যখন দিচ্ছি তখন প্রার্থনার সাফল্যের সম্ভাবনাও দিচ্ছি। তাই প্রকৃতিকে বিশেষ ক'রে বলা আছে যে "তুমি যদি তাতে রাজী না হও তাহলে এ ফুল আমাকে দিও না।" ওর কমাবাড়া হয়ে থাকে; যখন চাইছি তখন অজস্র পরিমাণে আসছে আবার হঠাৎ কোনো সময় তা একেবারে থেমে যায়...কারণ বোঝা যায় না...প্রকৃতি চাইছে না...ওর বদলে অন্য ফুলই প্রচুর দিতে থাকে।

কিন্তু ওর কাজগুলো সবই হতে থাকে অন্তরাল থেকে।

(আবার বিকট শব্দ)

মা আমি কেবল ঐ শব্দটাই শুনতে পাচ্ছি।

প্রশ্ন ঐ একই প্রশ্নের পুনরুল্লেখ করা হলো।

উত্তর সেটা নির্ভর করবে তুমি যেমনভাবে তাকে নেবে তারই উপরে। আমি হয়তো নিজের হাতে তোমাকে কিছু দিলাম, সে আলাদা কথা ...আর তুমি আপন পছন্দ অনুসারে আংটি বা ছবি দেওয়া কিছু চেয়ে নিলে, সে আলাদা কথা। যদি তোমার সত্য বিশ্বাস থাকে যে তার দ্বারা তুমি বিপদে রক্ষা পাবে তাহলে তা ঠিকই সফল হবে। আর আমি যখন নিজের হাতে কিছু দিই তখন সেই সঙ্গে আরো বিশেষ কিছু দিয়ে থাকি। তা ছাড়া অন্য কিছুরই বেলাতে সেই বিশেষ জিনিসটি দেওয়া থাকে না।

শ্রীঅরবিন্দ কি বলতেন, জানো তো, তাঁর ছবিবসানো আংটি পরলেই সকল বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে, এ শুধু একটা অন্ধ সংস্কার মাত্র! কিন্তু নিজে যদি তিনি তোমাকে ঐ রকম কিছু দিয়ে বলেন যে "এটি কাছে রেখো, এটিতে শক্তি সংযোগ করা হয়েছে"— তাহলে সেখানে তা হবে সম্পূর্ণ আলাদা কথা।

আমি ছোটো একটা গল্প বলি শোনো। অনেককাল আগের কথা। তখনকার কালে যে পয়সা বা মুদ্রা প্রচলিত ছিল তার মধ্যে কোনো ফুটো করা থাকতো না। কিন্তু এমনি একটা সংস্কার সকলের মধ্যে ছিল যে দৈবাৎ কোনো ফুটোওয়ালা মুদ্রা বা পয়সা পাওয়া গেলে তা হবে বিশেষ সৌভাগ্যের লক্ষণ। এখনকার দিনে অবশ্য সে সংস্কার আর নেই, কারণ কোনো কোনো দেশে এখন ফুটোকরা পয়সাই চলছে। কিন্তু তখনকার কালে এমন মুদ্রা সৌভাগ্যদায়ক বলে সকলে ধারণা করতো।

ঐ কালে একজন অফিসে নিযুক্ত দরিদ্র কেরাণী ব্যর্থ ও দুঃখের জীবন যাপন করতে করতে হঠাৎ তার কেমন করে মিলে গেল একটি ফুটো পয়সা। সযত্নে সেটিকে পকেটে লুকিয়ে আপন মনে বললে "এবার আমার ভাগ্য ফিরে যাবে।" এই ভাবটি মনে মনে লালন ক'রে সে দ্বিগুণ উৎসাহ উত্তেজনা ও আশা নিয়ে কাজ করতে লেগে গেল, সর্বদা এই বিশ্বাসটি রেখে যে "ভাগ্যমুদ্রা যখন কাছে আছে তখন জয়লাভ আমার হবেই।" এবং তার কাজের

উন্নত ধারা দেখে অরবিন্দ তার পদোন্নতিও হলো আর আয় বেড়ে গেল। সবাই বলতে লাগল, "কি চমৎকার কাজের মানুষ ইনি, কি নিপুণভাবে সকল দিক সামলে নিয়ে কাজ হাসিল করতে পারেন।" ক্রমে সে হয়ে উঠল একজন লোকমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি। আর প্রত্যহ আপন কোটটা গায়ে চড়াবার সময়ে পকেটে হাত দিয়ে অনুভব ক'রে দেখতো যে মুদ্রাটি ঠিক আছে কিনা। আছে বুঝেই সে নিশ্চিন্ত হতো। ...কিন্তু কয়েক বছর পরে হঠাৎ একদিন মনে হলো যে একবার দেখি তো কেমন আছে সেই মুদ্রাটি—আর সেদিন সকালে প্রাতরাশ খেতে বসে স্ত্রীকে সেই কথা সে বললে। স্ত্রী তার জবাবে বললে, "কি দরকার দেখবার, যা আছে তা ঠিকই আছে।" "তা হোক, তবু আমি একবার চোখে দেখতে চাই," বলে পকেটের ভিতর থেকে বের করলে সেই ছোটো ব্যাগটি যার মধ্যে সেই মুদ্রা যত্নে রাখা হয়েছিল। কিন্তু সে ব্যাগ খুলে দেখে যে তার মধ্যে একটা মুদ্রা আছে বটে, কিন্তু তা ফুটো নয়।

"একি? এতো আমার সেই জিনিসটি নয়? কেমন ক'রে সেটা বদ্‌লে গেল? কে বদ্‌লে দিয়েছে সেটি?"

স্ত্রী তখন বললে, "শোনো বলি, তোমার কোটটাতে যখন খুব ধুলো জমেছিল তখন ওটা জানলার বাইরে ঝেড়ে ঝাড়তে গিয়ে তোমার সেই মুদ্রাটি কোথায় ছিট্‌কে পড়ে হারিয়ে গেল। ওটির কথা ঝাড়ার সময় আমার মনে ছিল না। তার পর বেরিয়ে অনেক খোঁজা-খুঁজি করলাম, কিন্তু কোথাও সেটি পেলাম না। কেউ হয়তো কুড়িয়ে নিয়ে থাকবে। কিন্তু ওটা হারিয়ে গেছে জানলে তুমি মনে দুঃখ পাবে, তাই ঐ স্থানে অন্য একটি মুদ্রা আমিই দিয়ে রেখেছি।" (হাসা)

বরাবরই সেই ব্যক্তির মনে একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সেই মুদ্রার প্রভাবেই তার যা কিছু সৌভাগ্যলাভ হয়েছে।

বস্তুত এই বিশ্বাস, এই আশা জিনিসটাই সব কিছু কাজ করে। বস্তুত ফুটো পয়সার কোনো গুণ নেই। ...এ জিনিস তুমি পরীক্ষা করে দেখতে পারো। যদি তোমার তেমন দৃঢ়বিশ্বাস থাকে, যাকে বলে আন্তরিক বিশ্বাস

আচ্ছা, আজ এই পর্যন্তই যথেষ্ট।*

—শ্রীমা

* Bulletin of S.A.I.C.E. থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

পয়লা বৈশাখ

(১৪ই এপ্রিল ১৯৭৭)

সত্য বসু

আজ এই শুভনববর্ষে শ্রীমায়ের একটি পুরাতন নববর্ষের বাণী পাঠ করে নববর্ষকে স্বাগত জানাই—

"ভগবান আমাদের মধ্যে সব কিছু যাতে তোমার সিদ্ধি প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠে, তাই কর।

নববর্ষের দুয়ারে দাঁড়িয়ে প্রণতি জানাই, হে পরম সিদ্ধিদাতা।"

শ্রীমা এই বাণীটি দিয়েছিলেন ১লা জানুয়ারি ১৯৩৮ সালে। এই ছোট্ট বাণীর ভিতর এক বিরাট তত্ত্ব ও আদর্শের কথা নিহিত আছে—এ যেন বিন্দুতে সিন্ধু। এবং যা আমাদের কাছ থেকে যা চাইছেন তাও অত্যন্ত গভীরের কথা।

শ্রীমায়ের এই বাণীটি পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের একটা কথা মনে পড়ে। তিনি বলতেন "সারা জীবন ধরে ফর্দ করে গেলি বাজার করতে বেরুবি কবে।" আমাদেরও হয়েছে সেই দশা। মায়ের আশীর্বাদ ও করুণা অবিরত আমরা পেয়ে এসেছি কিন্তু সে সব আমরা কতখানি কাজে লাগালাম নিজেকে গড়ে তোলবার জন্য। এই সব হিসাব-নিকাশের প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে নতুনের প্রথম দিনে।

শ্রীমায়ের বাণীটি ভাল করে নিরীক্ষণ করলে আমরা বুঝতে পারব শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ কি—আর আমাদের কাছ থেকে তাঁরা কি চান। এই বাণীটিতে মায়ের দুটো কথা দেখতে পাচ্ছি। ভগবানের সিদ্ধি প্রতিষ্ঠার কথা এবং তার জন্য আমাদের প্রস্তুত হয়ে উঠবার কথা।

তাহলে প্রথমেই দেখা যাচ্ছে যে শ্রীঅরবিন্দের সাধনা ও সিদ্ধি নিজের জন্য নয়। তাঁর অস্তিত্বই নিজের জন্য নয়, তা হলো সমগ্র মানব জাতির জন্য—যাতে মানবসমাজ দিব্য চেতনায় ফুটে উঠে ভগবানের সকল ঐশ্বর্য্যকে এই পার্থিব জগতে প্রকাশ করতে পারে। একমাত্র এই লক্ষ্য নিয়ে শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দ কঠোর সাধনা করে গেছেন। সমগ্র মানব সমাজ যেদিন এই উচ্চ পদবীতে উঠতে পারবে সেই দিন হবে তাঁদের সিদ্ধি প্রতিষ্ঠা।

সুতরাং আমরা যারা শ্রীঅরবিন্দের সাধনার পথ বেছে নিয়েছি তাদের স্মরণ রাখতে হবে যে আমাদের ব্যক্তিগত সাধনা ও সিদ্ধির একান্ত কোন সার্থকতা নেই, আমাদের ব্যক্তিগত সাধনা ও সিদ্ধি সেই সমবেত মানব জাতির সাধনা ও সিদ্ধিরই অঙ্গীভূত।

ব্যক্তিগত সিদ্ধি ও মুক্তির জন্য আমাদের দেশে অনেক সাধনার পথ ও আদর্শ ছিল, আজও আছে। এই আদর্শের পথপ্রদর্শকেরা বা মহাপুরুষেরা মানব জাতির দুঃখ, কষ্ট, জরা ও মৃত্যুর কথা যে ভাবেননি তা নয়। এ সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁরা আখাড়াও গড়ে তুললেন, সকলকে সাধনার কৌশল দেখালেন—ভগবানের সঙ্গে কি করে যুক্ত হয়ে, নির্বাণ লাভ ও জীবন মুক্ত হওয়া যায়। তাঁরা বিরাট যুক্তি দিয়ে রায় দিয়ে গেলেন—একমাত্র

ব্রহ্ম সত্য আর এই যে বৈচিত্র্যময় জগৎ আমরা যা দেখছি তা মিথ্যা, মায়া, মরিচীকা। যাই হোক, এ সবের মূল্য মানবজাতির কাছে কতখানি তা নিয়ে আলোচনা আজ আমাদের বিষয়বস্তু নয়। তবে এটা ঠিক যে, তাদের ব্যক্তিগত সাধনা ও সিদ্ধি বা সংঘের সাধনা ও সিদ্ধি বৃহৎ মানবসমাজের অঙ্গীভূত ছিল না।

শ্রীঅরবিন্দ বললেন—A yoga that required me to give up the world is not for me. তাহলে শ্রীঅরবিন্দের সাধনার পথ যারা বেছে নিয়েছে তারা যদি ব্যক্তিগত সাধনা ও সিদ্ধির কথা ভাবে এবং তাই নিয়ে মেতে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই ভুল হবে। প্রতিপদে এটা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে।

শ্রীমা আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন—আমরা যেন সব কিছুর ভিতর দিয়ে প্রস্তুত হয়ে উঠি ভগবানের সিদ্ধি প্রতিষ্ঠার জন্য। এখন প্রশ্ন জাগে—আমরা তো সামান্য মানুষ, আমরা কি ভাবে নিজেদের প্রস্তুত করে তুলবো।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—All life is yoga. জগতের কোন কিছুকে বাদ দিয়ে আমাদের যোগ নয়। নানা কর্মের ভিতর দিয়ে, বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে আমাদের সাধনা করতে হবে—কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনীয়ার, কেউ আইনবিদ্, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ সাহিত্যিক ইত্যাদি—যাকে যে ভাবে মা নিযুক্ত করেছেন, তার ভিতর দিয়ে নিজেকে দিব্য চেতনায় ফুটিয়ে তোলবার জন্য সাধনা করতে হবে। ভগবানের ঐশ্বর্য আমরা গ্রহণ করব, সবকিছুই আয়ত্ত করব, কোন কিছু ত্যাগ করে নয়। তবে সেইসঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে-সব ঐশ্বর্য প্রাকৃত জীবনে ভোগের উপকরণ—হাতের নাগাল এলেও এ নিয়ে যেন মেতে না থাকি, তাতে এতটুকু আসক্তি না থাকে যেন। সাধকের জীবনে এটা চরম পরীক্ষা—এখানে একটা ফাঁক ও ফাঁকি থাকার সম্ভাবনা আছে। আমরা যা কিছু করি এবং পাই তা যেন হয় ভগবানের প্রকাশের জন্য। দারিদ্র্যের ক্ষুদ্রতা বা ঐশ্বর্যের উল্লাস এই দুয়ের মধ্যে যেন সমত্ব থাকে। All life is yoga—এর মূল কথা হলো আমাদের জীবন হয় যেন, স্বাভাবিক, সহজ, সরল এবং জীবন্ত—সাধনা চলবে এরই ভিতর দিয়ে।

সাধনার দিক থেকে আগে নিজেকে অধ্যাত্ম চেতনায় ফোটাতে হবে—এই হলো প্রথম ধাপ, এটি খুব কঠিনসাধ্য নয়। কিন্তু দ্বিতীয় ধাপটি সাধনার পথে সর্বাপেক্ষা কঠিন—তা জেনে এর জন্য চেষ্টা করতে হবে, প্রস্তুত হতে হবে।

সাধনায় আমাদের যদি ব্যক্তিগত কিছু লাভ বা সার্থকতা এসে থাকে, তবে বুঝতে হবে তা মানব জাতির সমবেত চেতনার ক্ষুদ্র সম্পত্তি রূপে এসেছে—সে সম্পত্তির মালিক আমি একা নই। প্রকৃতির ভিতর একত্ব বোধের তাগিদ রয়ে গেছে। তাই মানুষ গড়ে তোলে সমধর্মী বা সমপন্থীদের নিয়ে গোষ্ঠি, কেন্দ্র বা সংঘ। সংঘজীবনের প্রয়োজনীয়তা আছে, কারণ আমাদের ব্যক্তিগত সাধনার ভিতর দিয়ে সমগ্র মানব চেতনার সাধনা চলেছে আমাদের সত্তাকে আশ্রয় করে, ভর করে দিব্য চেতনায় উঠবার জন্য সচেষ্ট। শ্রীঅরবিন্দের সাধনার বৃহত্তর অর্থ এইদিক দিয়ে—তাই আমাদের কর্তব্য, দায়িত্ব ও ব্রত হবে এই দিক দিয়ে।

কেন্দ্র বা সংঘের প্রয়োজন আছে সত্যই কিন্তু কেন্দ্র চালাবার দায়িত্ব অনেক বেশী।

সেখানে গঠনে ও চলনে একটা আমূল পরিবর্তন ও রূপান্তর দরকার। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, সংঘের সঙ্গে সংঘের সম্বন্ধ গড়ে তুলতে হবে নবচেতনার ভিত্তিতে।

আমরা সত্যই কেউ কাউকে জানিনা। অহংবোধ নিয়ে পরস্পর হতে আমরা অনেক দূরে সরে আছি। ব্যক্তিগত অহং এর উপরে উঠতে হবে, চেতনার সঙ্গে চেতনার মিলন আনতে হবে। তবেই সমধর্মী বা সমপন্থীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বা একত্ব-বোধ আসবে। সংঘের ভিতর ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈচিত্র্যের অক্ষুন্নত ঐশ্বর্য্য থাকবে কিন্তু তা বলে বিরোধ থাকবে না।

ব্যক্তি-অহং সহজে যায় না—দল বাঁধলেও মানুষের অহং মরতে চায় না। ব্যক্তি অহং বড় হয়ে তখন গোষ্ঠি অহং এ পরিণত হয়। তাই গোষ্ঠির সঙ্গে গোষ্ঠির ঠোকাঠুকি চলে।

আমাদের কেন্দ্রগুলিকে আমরা কিভাবে চালনা করব বা গঠন করব সেইটাই মূল প্রশ্ন। যারা কেন্দ্র চালাবার জন্য এগিয়ে এসেছেন—শ্রীমায়ের অনুমোদনক্রমে কেন্দ্র চালাবার ভার পেয়েছেন, পদ বা পদবী পেয়েছেন, তাদের একটা কথা জেনে রাখা দরকার—শ্রীমা কাহাকে পদ বা পদবী দেন না, কাজ চালাবার জন্য কেবল দায়িত্ব দেন উপযুক্ত সাধকের হাতে। শ্রীমা নানা কেন্দ্র বা প্রতিষ্ঠান চালাবার ভার দিয়েছেন—তাদের কাউকে সভাপতি, সম্পাদক, সমিতির সভ্য, ট্রাষ্টের সভ্য, এইসব পদে নিযুক্ত করেছেন সত্যই কিন্তু কাজ চালাবার সুবিধার জন্য এখন যদি কেউ এই সব পদ পেয়ে মস্ত ফেঁপে উঠে এবং নিজের কর্তৃত্ব বজায় রেখে, নিজের বুদ্ধি ও অহং দিয়ে কেন্দ্র বা প্রতিষ্ঠান চালাবার চেষ্টা করে তাহলে সেইসব কেন্দ্র বা প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠবে শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দের আদর্শের বাহিরে একটা কিছু। বুদ্ধির কসরত দিয়ে নানা আদর্শের ছাঁচে সমাজ গড়ে তোলবার চেষ্টা পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক নজির আছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তা কোনটাই ধোপে টেঁকেনি। বড় পদ বা পদমর্যাদা, ধনদৌলতের মানের কাছে কোন মূল্য নেই, তা শূন্য।

শ্রীমা বাংলাদেশে ভারতে এবং ভারতের বাহিরে বহু কেন্দ্রে গড়ে তুলেছেন। কেন তা গড়লেন, কি-ই বা তার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন? শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় কেন্দ্রের বিশেষ তাৎপর্য ও প্রয়োজন আছে। প্রতিটি কেন্দ্র হবে আধ্যাত্মিক সাধন পীঠ—সাধকেরা সেখানে ভাগবতী শক্তিকে পুঞ্জীভূত করবে সংহত করবে; কেন্দ্রগুলো হবে শক্তিকূট। আর প্রতিটি কেন্দ্র থেকে প্রদীপের আলোর শিখার মত মায়ের শক্তি ছড়িয়ে পড়বে। দিব্য-জীবনের সাধক যারা তাদের ব্যক্তিগত আদর্শই হবে সংঘজীবনের আদর্শ—সংঘ জীবনের আদর্শ ও সিদ্ধি হবে মানব সমাজের সম্পত্তি। এই ভাবেই পৃথিবীর বুকে একদিন ফুটে উঠবে দিব্য মানুষের সমাজ। তখনি হবে শ্রীঅরবিন্দের সিদ্ধি প্রতিষ্ঠা।

তাহলে কেন্দ্রের প্রয়োজন কত বিরাট তা আমরা হয়তো কিছুটা বুঝলাম। প্রতিটি কেন্দ্রের সভাপতি শ্রীমা নিজেই—এই বোধ যদি আমাদের ভিতর থাকে তাহলে কেন্দ্র সমূহের ভিতর একত্ববোধ সহজেই গড়ে উঠবে। তখন কেন্দ্রের সঙ্গে কেন্দ্রের ঠোকা-ঠুকির প্রশ্নই থাকবে না। আসলে প্রথমে নিজেকে বদলাতে হবে, দিব্য চেতনায় ফুটে উঠতে হবে। নিজে বদলাব না আর মানবজাতি বদলে যাবে—এ এক অযৌক্তিক আশা।

আমাদের মধ্যে থাকে যেন একটা চরম নম্রতাপূর্ণ নিরহঙ্কার, একান্ত আত্মবিলোপ—এই মহাব্রত নিয়ে আমরা যেন সংঘের কাজ চালাই। শ্রীমায়ের শক্তি ও করুণা আমাদের সঙ্গে সব সময়েই রয়েছে ও কাজ করে চলেছে। আমরা কিছু করিনা, কিছু করবার উপায় আমাদের নেই, আমরা হলাম যেন নারায়ণী সেনা—আমাদের সকলকে চলতে হবে সমান তালে, সমান বেগে। কেউ কাউকে ফেলে এগিয়ে যেতে পারে না, যদি কেউ যায় সে যাবে নির্ব্বাণের পথে, আর যদি কেউ অতিরিক্ত পেছিয়ে থাকে সেও যাবে আর এক নির্ব্বাণের পথে ধ্বংসের পথে। আসুন শ্রীমায়ের শতবার্ষিকীতে আমরা যেন নিজেদের এই ভাবে প্রস্তুত করি। নববর্ষের দুয়ারে দাঁড়িয়ে শ্রীমায়ের কাছে আমাদের সমবেত প্রার্থনা জানাই।*

---

* 'সেবায়ন' প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ।

Our Homage to Sri Aurobindo and The Mother

Mitra Engineering & Construction Co.

(ENGINEERS OF REPUTE)

Phone 46-3957

Specialist in Insulation Work, Air Conditioning & Refrigeration, Electrical Engineers & Builders.

16/1, Chandranath Chatterjee Street
Calcutta—25

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field :
Sreepore Bagharghole
P.O. Bonhooghly, 24 Parganas

Head Office
34: 1, Puddapukur Road
Calcutta-20

Phone : 47-2869

With the best Compliments from :—

Ellora Enterprise

Paper & Board Merchants

57/2A, College Street
Calcutta-12

Phone: 34-3720

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরের প্রকাশিত পুস্তকাবলী

Tales of Prison Life	Sri Aurobindo	In Press
Words of Sri Aurobindo	1st Series	2·50
Words of Sri Aurobindo	2nd Series	4·00
	3rd	5·00
	4th ,,	5·00
যোগসাধনা ও যোগের উদ্দেশ্য	শ্রীঅরবিন্দ	১·৫০
শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর আশ্রম		২·০০
গীতার ভূমিকা	শ্রীঅরবিন্দ	২·৫০
মৃত্যু ও মৃত্যুর পরে	শ্রীঅরবিন্দ	০·৭৫
যোগসাধনার ভিত্তি	শ্রীঅরবিন্দ	৩·৫০
মানবজাতির ভবিষ্যৎ বিবর্তন	শ্রীঅরবিন্দ	৯·০০
মায়ের আলাপ	শ্রীমা	৩·০০
শিক্ষা	শ্রীমা	২·০০
শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর বাণী		২·০০
যোগসমন্বয় প্রসঙ্গ	অনির্বাণ	১৫·০০
মা কি বলেন	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৩·০০
শতাব্দীর প্রণাম		৩·৫০
স্মৃতির পাতা ১ম পর্যায়		৬·০০
স্মৃতির পাতা ২য় পর্যায়		৪·০০
শ্রীঅরবিন্দায়ন (সচিত্র শ্রীঅরবিন্দের জীবন বাণী ও সাধনা)	নীরদবরণ	৪·০০
শ্রীঅরবিন্দ-প্রসঙ্গ	দীনেন্দ্রকুমার রায়	১·৮০
শ্রীমা-প্রসঙ্গ	কে, আর, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার	২·৮০
শ্রীঅরবিন্দ—জীবন ও যোগ	প্রমোদকুমার সেন	৭·০০
বিশ্বমানবের এগিয়ে চলা	চারুচন্দ্র দত্ত	৩·৫০
কে এই মা ?	পশুপতি ভট্টাচার্য	৭·০০
দিব্য জীবনের সন্ধানে		৪·০০
শ্রীঅরবিন্দ ও মায়ের নূতন বার্তা	,, ,,	১·৫০
মা আজও আছেন	,,	৪·০০
শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্মযোগ	সুধা বসু	৫·০০
Sri Aurobindo on Man	D. P. Chattopadhyaya	1·80
শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ		৭·০০

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট

কলিকাতা–৭০০০৭৩

ফোন : ৩৪-২৩৭৬

আমার দৃষ্টিতে

শ্রীঅরবিন্দের দি লাইফ ডিভাইন

শম্ভু গুহের অনুবাদ

প্রথম খণ্ড :	প্রথম চার অধ্যায়	দাম—২·০০
দ্বিতীয় খণ্ড :	পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়	২·০০
তৃতীয় খণ্ড :	সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়	২·০০
চতুর্থ খণ্ড	নবম ও দশম অধ্যায়	২·০০
পঞ্চম খণ্ড :	একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়	২·০০
ষষ্ঠ খণ্ড :	ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়	২·০০
সপ্তম খণ্ড :	পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ অধ্যায়	২·০০
অষ্টম খণ্ড :	সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়	২·০০
	প্রথম খণ্ড থেকে অষ্টম খণ্ড একত্রে বাঁধাই	২০·০০

—প্রাপ্তিস্থান—

চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স

১-১-১ এ·বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অথবা

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীমায়ের সমগ্র রচনা সংগ্রহ

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা–৭০০০১২

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ শ্রীমায়ের জন্ম-শতবার্ষিকী। শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির বহুভাবে শতবার্ষিকী জয়ন্তী পালন করবে। জয়ন্তীর একটি অংশ পালিত হবে শ্রীমায়ের সমগ্র রচনা প্রকাশনের মাধ্যমে। শ্রীমায়ের সমগ্র রচনা মূল ফরাসী এবং ইংরাজী থেকে বাংলায় অনূদিত ১৫ খণ্ডে প্রকাশ হবে। তাতে থাকবে তাঁর লেখা ধ্যান ও প্রার্থনা, পুষ্পাণো লেখা, প্রশ্ন ও উত্তর, প্রবন্ধ, পত্রাবলী ইত্যাদি। আশা করা যায় সবগুলি খণ্ড ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ তারিখের মধ্যে প্রকাশিত হবে।

প্রাক প্রকাশনী মূল্য—১০০৲ টাকা (সডাক ১৫০৲ টাকা) (গ্রাহকদের জন্য)
প্রকাশ হবার পরবর্তী মূল্য—৪৫০৲ টাকা (সডাক ৫০০৲ টাকা)

[শ্রীমায়ের সমগ্র রচনা সংগ্রহ জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ মোট ১৫ খণ্ডে প্রকাশ করা হবে। লাইনো টাইপে ছাপা ও সুন্দর কাপড়ে মজবুত বাঁধাই হয়ে সুদৃশ্য জ্যাকেটে মোড়া হবে। খুব কম সংখ্যা ছাপানো হবে।]

7 SEP 1977

—গ্রাহক হবার নিয়মাবলী—

১। ৩০৲ টাকা অগ্রিম দিয়ে গ্রাহক হতে হবে।
২। প্রতিটি খণ্ড প্রকাশ হলে গ্রাহকদের জানানো হবে এবং ২০৲ টাকা দিয়ে বই সংগ্রহ করতে হবে।
৩। শেষ দুই খণ্ড অর্থাৎ ১৪ ও ১৫ খণ্ড সংগ্রহ করবার সময় গ্রাহকের জন্য ৩০৲ টাকার সঙ্গে হিসাবনিকাশ করা হবে।
৪। যোগাযোগ করার স্থান :—

(ক) শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির,
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা–৭০০০৭৩

(খ) শ্রীঅরবিন্দ ভবন,
শ্রীঅরবিন্দ-ভবন, ৮ শেক্সপীয়র সরণী, কলিকাতা–৭০০০৭১

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্তিকা

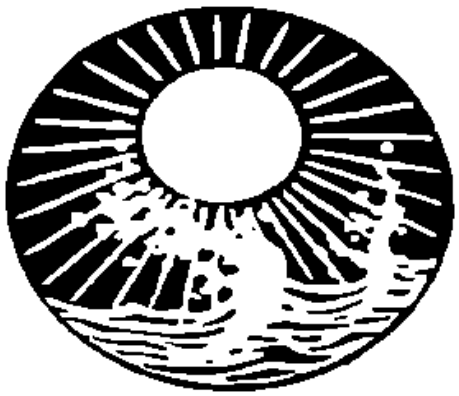

২৪শে এপ্রিল, ১৯৭৭

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২৪শে এপ্রিল, ১৯৭৭)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

মধুমতী মা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৫
সাবিত্রী (অনুবাদ)	শ্রীঅরবিন্দ	৮
ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিমন্ত্র	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১২
চিন্তা প্রসঙ্গে	শ্রীমা	২০
বেদ	শ্রীঅরবিন্দ	২৬
শ্রীঅরবিন্দের পত্র	...	২৭
পাখি ডাকে (কবিতা)	রবি গুপ্ত	২৯
মায়ের সঙ্গে কথা		৩০

বার্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি, পি, যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০		২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০		৫২০·০০
বাহিরের মলাট	২০০·০০		৬০০·০০

শাখা
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by : **Nolini Kanta Gupta**
Published by : Sri Aurobindo Pathamandir
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-73
Printed by : Amiyo Ranjan Ganguli
At Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry-2

Each lie uttered
is a step taken towards
Disintegration

মধুময়ী মা

(চতুর্থ পর্যায়)

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

(২)

দিব্য মানুষী স্পর্শ

কিসে তবে রয়েছে সেই মানুষী স্পর্শ ? কি সে বস্তু যা বিশেষভাবে এবং একান্তভাবে মানুষী, যা আর কোথাও মেলে না, যা মানুষকে করে ধরে মানুষী,—নিছক পশুধর্মীও নয়, কিংবা কেবলমাত্র দেবধর্মীও নয় ?

এ হল অমরত্বের মধ্যে সে মর্ত্য উপাদান, মরতা এক যা পরিণত হয়েছে অমরতায়। পশু শুধুই মরত্ব, দেবতা কেবলই দেবত্ব, মানুষ দুয়ের মধ্যে সেতু, দুয়েরই অংশীদার। মরত্বকে যা অপূর্ব ও তীব্র—অমরত্বের মতই দিব্য প্রকৃতপক্ষে—করে তুলেছে, তা হল সেই বস্তু যা স্পর্শ করেছিল মহাকবি ভর্জিলকে, তার জন্য তিনি পেয়েছিলেন একটি নাম—নামই প্রায়—এবং তা বহুজনবিদিত "Lacrimae rerum"—বস্তুর অশ্রুধারা। মর্ত্যতার গভীরে রয়েছে এক উৎস, তা হতে উৎসারিত হয় অশ্রুকণা। সকল মর্ত্যাবয়ব গঠনের মধ্যেই রয়েছে এমন এক করুণরস যার প্রবণতাই হল যেন চক্ষুকে তরল, সজল করে তোলা। অশ্রুপাত দেবতাদের জন্য নয়, দেবতারা হল spirit যতই হোক, প্রশান্ত নীরব চিন্ময় পুরুষ, "প্রার্থনারত ক্ষুদ্র কণ্ঠের অতীতে (beyond the little voice that prays)" তারা।*

এই প্রসঙ্গে আমি উদ্ধৃত করতে পারি আরও কবিদের পংক্তি সব যেখানে তাঁরা অমরত্বকে দেখিয়েছেন এমন কিছুরূপে যা উদাসীন, লোকাতীত, ওপারের কিছু, সুদূর নিরাসক্ত, তাপহীন, নির্বিকার।

এখানে মনে করা যাক মহাভারতের বিখ্যাত কাহিনী রাজকুমারী দময়ন্তীর স্বয়ম্বর কথা। দময়ন্তীকে নির্বাচন করতে হবে তাঁর প্রিয় নলরাজাকে উপস্থিত সব দেববৃন্দের মধ্যে—দেবতারা সকলেই রূপসী দময়ন্তীর পাণিপ্রার্থী। দময়ন্তীকে বিভ্রান্ত ও হতবুদ্ধি করার উদ্দেশ্যে দেবতারা সকলেই নলের রূপ ধারণ করেছেন। এখন কি করে বোঝা যাবে ? কি করে চেনা যাবে ? দময়ন্তীর সহায় হল নলের আঁখিপাত মানুষের চোখে পলক পড়ে, খোলে, বন্ধ হয়, দেবতাদের আঁখিপল্লব মুদ্রিত হয় না কখনও, তারা চিরস্থির। এমনি করেই দময়ন্তী তাঁর মানুষী জীবনসঙ্গীকে চিনে নিয়েছিলেন।

---

* "Like winds or waters were her[1] ways:
They heed not immemorial cries;
They move to their high destinies
Beyond the little voice that prays."
—A. E.

([1] The One Will in the Cosmos)

এবং বিশেষ করে এই নিমেষপাতই বলা চলে, নিয়ে আসে অশ্রুবিন্দু—মানুষী প্রকৃতির এই হল অভ্রান্ত চিহ্ন। পলক ফেলা বা চোখ মিটমিট করা অর্থ কালের অন্তর্ভুক্ত, কালের সৃষ্ট অর্থাৎ নশ্বর—আর তার অনিবার্য ফল অশ্রুসজল নেত্র। অন্য পক্ষে অপলক নেত্র অর্থ অক্ষুণ্ণ অবাধ বিস্তার আনন্ত্যের, অর্থাৎ অবিনশ্বর। পার্থিব নশ্বর জিনিসের এই যে দুর্বলতা, তাই খুলে দেয় মানুষী আত্মায় একটি গোপন উৎসধারা। এ এক অনুভূতি, মৌলিক অনুভূতি যা স্বভাবতঃই দেখা দেয় হয়তো দিব্য মানুষী জীবের চেতনায়, সম্বন্ধের ক্ষেত্রে, যেমন ঘটেছিল বুদ্ধের বেলায়। সে ক্ষেত্রে তার নাম দেওয়া হয়েছিল "করুণা", যাঁর সত্তা এই গভীর সহানুভূতিতে (করুণায়) দ্রব, তিনিই 'করুণার্দ্র'—কারুণ্যবান। খৃষ্টীয় ধারায় একে বলা হয়েছে "pieta" (যদিও এ ঠিক "pity"নয়), খৃষ্ট-ধর্মের ভিত্তিই হল এই অনুভূতি—"Charity", এর আদিরূপ ছিল "caritas", এ এক অপরূপ অনুভূতি যাকে স্থূল ভাষায় বলা হয় সৌহার্দ্য (fellow-feeling), এ এক গভীরতর সহানুভূতি যাকে প্রায়ই আজকাল নাম দেওয়া হয়েছে "empathy", মূল অর্থে তা হল অন্তরঙ্গ সৌহার্দ্যের বোধ। এ ঠিক ভালবাসা নয়, ভালবাসা বা প্রেম মানুষী অনুভূতির অন্য স্তরের বস্তু। এক ভাবে এ হল ভালবাসার মর্ম্মজাগত উপাদান, ভালবাসা যেখানে তার মূল বা বস্তুসত্তায় রূপান্তরিত ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপ পেয়েছে সেখানেই বোধহয় মানুষী উপাদানের দিব্যে রূপায়ণের শেষ সম্ভাব্য সীমা। তারপরে হল মৃত্যু,—অথৈতং অক্ষরং অনন্তম্—পুনার্—ভাগবতী ভাব মানুষী ভাব হতে ক্রমশঃ মুক্ত হয়ে চলেছে ; এই ভাগবতী ভাবে প্রায় সম্পূর্ণ রূপান্তরিত মানুষী উপাদানের অপূর্ব পরিচয় পাওয়া যায়—মানুষীভাবের এই residuum সেখানে ভাগবতীভাবে উর্ধ্বায়িত করে তুলে ধরা হয়েছে—এর বর্ণনা দিয়েছেন সোফোক্লীজ (Sophocles) তাঁর "আন্তিগোনী" (Antigone) নাটকে।*

আন্তিগোনীর মুখে তার ভগ্নীকে সম্বোধন করে যে উক্তি তার প্রথম কথা কটি অদ্ভুত সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছে এই অনুভূতিটি যা আমি এখানে প্রকাশ করতে চেষ্টা করছি—একাত্মবোধের ও কারুণ্যের এই যে অনুভূতি ফুটে উঠেছে ভাষার অপূর্ব সৌন্দর্যে। এতে রয়েছে মানুষী দুর্বলতার সুর একটি—সেই দুর্বলতা যার জন্য শেক্সপীয়র স্ত্রীজাতিকে দোষারোপ করেছেন ; তবু এ দুর্বলতা গ্রহণ করতে, আয়ত্ত করতে দিব্যসত্তারা কিন্তু দ্বিধা করেন না। এ হল দুয়ের আশ্চর্য সমন্বয়—যেন যুগ্ম ছন্দতাল—দুয়ের মিলেমিশে এক হয়ে, যাওয়া বা একের অন্যের মধ্যে সম্পূর্ণ লীন হওয়া বা হারিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া নয়—এ যেন দুটি সুর-তরঙ্গের মিশ্রণে এক যাদুময় সুরসঙ্গতির মূর্ছনা।

মানুষ কতদূর পর্যন্ত দিব্য বা ভাগবত হয়ে উঠতে পারে ? অবতাররূপে ভগবান মানুষ হয়ে ওঠেন বা পড়েন প্রায় সম্পূর্ণভাবে—অন্ততঃ বাহ্যরূপে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে শ্রীকৃষ্ণের যত স্খলন-পতনই শুধু নয়, দুষ্কর্ম অবধি—তার ভূরি ভূরি কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। তার অর্থ নয় তাঁর মধ্যে মানুষী সত্তা দিব্য ভাগবত হয়ে উঠেছে,

* O lovely head of Iamene, common to both,
born of the same self.

এ তবু হল ভগবান মানুষী প্রকৃতি ও গুণাবলী গ্রহণ স্বীকার করেছেন—এ একটা ছদ্মবেশ মাত্র আসলে, এ হল আরোপ মাত্র—ব্রহ্মের উপর মায়ার অধ্যারোপ। ভগবান মায়ার অতীত। প্রশ্ন রয়ে যায় তবে মানুষ তাহলে কতদূর পর্যন্ত মানুষী থেকে তা সত্ত্বেও সত্যসত্যই ভাগবত সত্তা হয়ে উঠতে পারে? পুণ্য সন্তবনী মানুষীজীবে হৃদয়ের এই যে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা যাকে আমরা নানা নামে বর্ণনা করেছি—অনুকম্পা (caritas), করুণা, কারুণ্য—মনে হয় সেখানেই মানুষের ভাগবত রূপায়ণের সীমানা। "প্রেম" আছে বৈকি, কিন্তু এ এক অস্পষ্ট বাক্য। প্রেমের মূল সত্য ও স্বরূপ হল আনন্দ—সৎ-চিৎ-আনন্দের আনন্দ। আমার আশঙ্কা সে আনন্দে মানুষী ভাবটি লীন হয়ে যায়।

ভগবানের নয়নে অশ্রুবিন্দু মনে হয় ভগবানের মধ্যে মানুষীভাবের পরম পরাকাষ্ঠা—তারও ওপারে যাওয়া যায় কি?

আমাদের মায়ের মধ্যে আমরা দেখেছি তাঁর করুণার প্রকাশ সেই অশ্রুবিন্দু রূপান্তরিত হয়েছে তাঁর হাসিতে—সে হাসি একান্তভাবেই ভগবানের তবু তা আবার একান্তই মানুষী—উভয়েরই পরম পরাকাষ্ঠা মিশে এক হয়ে গিয়েছে সেখানে।

সাবিত্রী

শ্রীঅরবিন্দ

৩য় পর্ব—৩য় সর্গ

অন্তঃপুরুষের গৃহ—সবস্থষ্টি

(৩)

এই যত অধ্যাত্মস্থিতির মহিমা, তাদের সঙ্গে সঙ্গে
তাদের সমান্তরালে অথচ তাদের বিরোধী
ভেসে চলেছে, চলেছে দুলে দুলে, রাহুগ্রস্ত যেন ছায়াসব,
সংশয় যেন হয়েছে স্থূলবস্তু, চঞ্চল, বিবর্ণ
এই যে বিকল্প ব্যবস্থা, দুটি নেতিকে ধরে রয়েছে তারা।
জগৎ একটা যেন, জানে না যে তার অন্তর্যামী আত্মাকে,
শুধু করে চলে তার কারণ তার অস্তিত্বের প্রয়োজন আবিষ্কার তরে ;
আর, চিন্ময় সত্তা এক আপন সৃষ্ট জগৎকে জানে না যে,
জড় তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, প্রাণ তাকে দিয়েছে ছদ্মবেশ,
প্রয়াস তার—প্রকট হবে, মুক্ত হবে, জ্ঞানার্জন করবে, শাসন করবে।
এ দুটিতে এক বিসম্বাদে আলিঙ্গনবদ্ধ,
ভিন্নমুখী তবু তাদের গতিরেখা মিলিত হয় না কোথাও।
শক্তিত্রয় নিয়ন্ত্রণ করে এই অনিয়ন্ত্রিত ধারা,
আরম্ভে জ্ঞানহীন শক্তি এক,
মধ্যপথে শরীরী প্রয়াসী আত্মা এক,
অন্তিমে জীবন-বিলোপী নিস্তব্ধ চিন্ময়সত্তা এক।
রসহীন অর্থহীন গৌণ গর্ভাঙ্ক যেন
খুলে ধরে তার সত্য-মিথ্যা সংশয়ী মনের কাছে,
অজ্ঞান শক্তি এক বাধ্য করেছে তারে অভিনয় করে যেতে,
আপন অর্থসমাপ্ত কাহিনী এক বিবৃত করে
বিবৃত করে তার নিশ্চেতন পরিকল্পনার রহস্য
আর রাত্রিগর্ভে জাত এক সত্তার জন্মপ্রহেলী
নির্বন্ধ আর যদৃচ্ছার পরিণয়ফলে।
এই অন্ধকার আমাদের মহত্তর ভবিতব্যকে ঢেকে রাখে।
গুটিকা যেন ধারণ করে এক মহান মহিমান্বিত সত্য,
পিষে রাখে গর্ভে তার সুপর্ণ কিন্নরকে
পাছে উড়ে যায় সে জড়-কারাগার হতে,
ক্ষয় করে তার সুষমা রূপহারা বৃহতের প্রসারে,
ডুবে যায় লুপ্ত হয় অজ্ঞেয়ের রহস্যতলে,

অসম্পূর্ণ রেখে যায় বিশ্বের অপরূপ ভবিতব্য।
এখনও মনে হয় শুধু উচ্চাকাঙ্ক্ষী চিত্তের স্বপ্নমাত্র
অথবা মানবীয় শ্রমক্লান্ত মানসের ভ্রান্তিবিলাস,
নবসৃষ্টি এক উদ্ভব হবে পুরাতন হতে,
কণ্ঠহারা জ্ঞান এক হবে বাঙ্ময়,
অবদমিত সৌন্দর্য ফুটে উঠবে নন্দনের শোভা নিয়ে,
সুখদুঃখ যাবে ডুবে আনন্দের পরাকাষ্ঠায়।
নির্বাক বাণীবহ এক কথা বলে উঠবে অবশেষে,
উত্তরচেতনা সচেতন হয়ে উঠবে পৃথিবীর পরে,
শাশ্বতের বিচিত্র বিস্ময় মহাকালের নৃত্যে যোগদান করবে।
বর্তমানে কিন্তু সবই দেখায় নিথ্যাময় সমাকীর্ণ বৃহৎ এক,
ধরে রয়েছে তারে বিভ্রান্ত শক্তিধারা এক
আত্মমগ্ন মূক সাক্ষীর সম্মুখে;
উদাসীন সে দেখে যায় অর্থহীন দৃশ্য,
দেখে যায় চলেছে এক অদ্ভুত শোভাযাত্রা
অপ্রত্যাশিত পরিণামের অপেক্ষায় রয়েছে যেন।
দেখে সে জগৎ এক ভবিতব্যের জগৎ হতে এসেছে যা।
অনুমান শুধু তার, সাক্ষাৎ দেখে না অনুভব করে না,
চেতনার সুদূর বলয়প্রান্তে
ক্ষণস্থায়ী ভঙ্গুর এই ক্ষুদ্র ঘূর্ণিত মণ্ডলের পরে
রয়েছে পড়ে লুপ্ত স্বপ্নের মিথ্যা প্রতিমার মত,
চেতনার বাহ্য নির্মোকের প্রতিরূপ ক্ষণিক প্রতিবিম্ব যেন,
দেহ তার সমাধিত হয়েছে অলৌকিক সুপ্তির তলে।
পরদেশী আকার এক যেন, ছায়ারূপ এক পুরাকাহিনী হতে।

পরধর্মী মনে হয় এখন সেই সুদূর অস্পষ্ট ব্রহ্মাণ্ড—
আত্মা আর শাশ্বত শুধু সত্য এখন।
স্মৃতি উঠে এল তার কাছে ঊর্ধ্বমুখী লোক সব হতে
বয়ে নিয়ে আসে আকুল বাণী এক একদিন ছিল যারা প্রিয়বস্তু সব
তাদের কণ্ঠ হতে;
এই কণ্ঠের আর আপনার পুরাতন লুপ্ত কণ্ঠের উত্তরে
এল রশ্মি এক প্রচ্ছন্ন পরমপদ হতে।
সেখানেও রয়েছে আসীন সীমাহীন অদ্বিতীয়।
আপনার দৃষ্টির কাছে আপনি অপরিচিত,
তবু জীবন্ত সে নিমজ্জিত আপনার অন্ধকারাচ্ছন্ন সব সাগরগর্ভে,
ধারণ করে রয়েছে বিশ্বের নিশ্চেতন একত্বকে

গুপ্ত যদি-বা জড়ের অচেতন নানান-গর্ভে।
এই বীজ-আত্মা বপন করা হয়েছে অনির্দেশ্যের অন্তরে
হারিয়ে ফেলেছে তার দেবত্বের মহিমা,
লুকিয়ে রেখেছে আপন শক্তির সর্বক্ষমতা,
লুকিয়ে রেখেছে আপন আত্মার সর্বজ্ঞান ;
আপনার লোকাতীত সঙ্কল্পের আপনি বাহক শুধু,
জ্ঞান তার নিমজ্জিত নিশ্চেতন গভীরে ;
বরণ করেছে সে মিথ্যা, দুঃখ, মৃত্যু আর বেদনা,
অজ্ঞান রজনীর মুক্তিপণ দিয়েছে সে,
আপন উপাদান দান ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করেছে প্রকৃতির পতনের।
পথিকবর আপনি সে জানে আপনাকে আর অন্তরাত্মা তার কেন গিয়েছে চলে
পৃথিবীর আবেগাপ্লুত অন্ধকারের গর্ভে
বিভ্রান্ত পথচারী এক শক্তির প্রয়াসে সহকর্মী হবে বলে
আশা যার বিভেদের পরিণামে আবিষ্কার হবে সেই এক অদ্বিতীয়।
দুটি সত্তা হয়েছে সে, একজন বৃহৎ মুক্ত ঊর্ধ্বে,
আর একজন প্রয়াসশিল্প, বদ্ধ, সুতীক্ষ্ণ, অপরের অংশ এখানে।
উভয়ের মাঝে সেতু এক এখনও যুক্ত করে দিতে পারে দুটি জগৎকে
অস্ফুট সাড়া রয়েছে এক, সুদূরের নিঃশ্বাস এক
সবই থেমে যায়নি এই সীমাহীন স্তব্ধতার মাঝে।
হৃদয় তার রয়েছে কোথাও সচেতন নিঃসঙ্গ
আপনার অধোভাগে বহু নিম্নে রাত্রিগর্ভে প্রদীপের মত,
পরিত্যক্ত শয়ান সে, সঙ্গীহীন একক, অক্ষয়,
অচল সে আবেগময় সংকল্পের অতিমাত্রা-ফলে,
হৃদয় জীবন্ত তার, দিয়েছে আত্মবলি করেছে আত্মনিবেদন
নিমগ্ন একান্ত অলৌকিক আরাধনায়,
ফিরেছে এখন সুদূর উৎসে তার প্রেমের আলোকের।
মূক আকূতি নিয়ে জ্যোতির্ময় নিস্তব্ধতার মাঝে
ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করে অগোচর শিখরের পরে ;
গভীর হতে ওঠে তার ঊর্ধ্বমুখী আবেগ, অক্ষম সে তাকে ত্যাগ করে যেতে।
বিশাল নিয়তিগর্ভ সমাধির অন্তঃস্থলে
তার মুক্ত আর অধঃপতিত সত্তাদের মাঝখানে
দিব্যদূত সে ভগবানের দিন আর মর্ত্যজীবের রজনীর মাঝে,
আরাধনা একমাত্র বিধান তার,
আনন্দ একমাত্র হেতু সকল বস্তুর,
ফিরিয়ে দিয়েছে সে তপস্বীর আনন্দ যার অংশ লভে না কেউ,
ফিরিয়ে দিয়েছে সেই প্রশান্তি স্থিতি যার শুধু প্রশান্তির তরে,

দাঁড়ায় ফিরে সেই শক্তিময়ীর অভিমুখে যার লাগি জীবনধারণের আকাঙ্ক্ষা
জেগেছিল তার।

নিঃসঙ্গ স্বপ্নের একান্ত আবেগে নিমগ্ন
রয়েছে সে শুদ্ধ রুদ্ধ পূজাগৃহ যেন;
সুপ্তিমগ্ন সেখানে পুণ্য রূপালী অঙ্গন,
জ্বলে সেখানে নিঃসঙ্গ নিষ্কম্প আলোরেখা
আর এক অদৃশ্য অধিষ্ঠান নত যেন প্রার্থনানিরত।
মুক্তিদাত্রী শান্তিময় এক গভীর বক্ষতলে
আর সবকিছু রয়েছে পরমসত্তার শুদ্ধতামাঝে;
সে-ই শুধু জানে সব অতিক্রমি রয়েছে সত্য এক।
আর-সব অন্ধ মূক কেন্দ্রীভূত সুপ্তির অন্তরে,
সম্মতি দিয়ে যায় ধীর মন্থর মহাশক্তির কর্মধারায়
যেখানে জগতের ভ্রান্তি শোক সমানে স্থান পায়;
সম্মতি দেয় সে বিশ্বগতির সুদীর্ঘ বিলম্বনে,
চিরকাল ধরে অপেক্ষায় রয়েছে অশ্রান্ত সম্বৎসরের পর সম্বৎসর ধরে
তারই আগমন তারা আকাঙ্ক্ষা করেছে পৃথিবী ও মানুষের জন্য
সম্মুখে এই যে সস্নিগ্ধ বিন্দু এখন তারে আহ্বান করে।
বিলুপ্তি সেই একক অগ্নিকে নির্বাপিত করেনি;
দৃষ্টি তার ভরে দিয়েছে মনের ও সংকল্পের শূন্যস্থান
চিন্তা মৃত, কিন্তু অব্যয় শক্তি তার বর্তে রয় বৃদ্ধি পায়।
একটা আনন্দের সাকাৎ প্রজ্ঞা রক্ষাবর্ম তার,
সকল প্রশান্তি এক হল সেখানে রহস্যময়,
পার হয়ে যায় সে জীবনের বিপুল রিক্ততা
ভেদ করে যত জগতের শূন্যগর্ভ নেতি নেতি।
কণ্ঠহারা নিবেদন তার উঠে গিয়েছে অজ্ঞাতের অভিমুখে;
শ্রবণে আসে আপন আশারাজির পদধ্বনি
ফিরে আসে যেন সকল বস্তুহারা মহাশূন্যের পার হয়ে,
অপেক্ষায় রয়েছে সে মহাবাণীর অনুজ্ঞার তরে
নিস্তব্ধ অন্তরাত্মা পার হয়ে আসে যে পরাৎপর হতে।

৩য় সর্গ সমাপ্ত

ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিমন্ত্র

(ঋগ্বেদ)

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

৩য় মণ্ডল—৪র্থ সূক্ত

১। সমিৎসমিৎসুমনা বোধাস্মে শুচাশুচা সুমতিং রাসি বস্বঃ।
আ দেব দেবান্যজথায় বক্ষি সখা সখীন্ৎসুমনা যক্ষ্যগ্নে ॥১॥

সমিৎ-সমিৎ—সমিদ্ধ হয়ে সমিদ্ধ হয়ে
সু-মনাঃ—সত্যমানস নিয়ে
বোধি—জাগ্রত হও
অস্মে —আমাদের মধ্যে
শুচা-শুচা—জ্যোতি নিয়ে জ্যোতি নিয়ে
সু-মতিম্ —সত্য বুদ্ধি
রাসি—দান কর
বস্বঃ —দীপ্তিময়ের
আ (+বক্ষি)—অভিমুখে (বহন কর, নিয়ে এস)
দেব—হে দেব
দেবান্—দেবতাদের
যজথায় যজ্ঞসাধনের জন্য
বক্ষি (+আ)—বহন কর, নিয়ে এস
সখা—সখা তুমি
সখীন্—সখাদের উদ্দেশে,
সু-মনাঃ—সত্যমনা (তুমি)
যক্ষি—যজ্ঞ কর
অগ্নে—হে অগ্নি

পুনঃপুনঃ সমিদ্ধ হয়ে, তোমার সত্যমন নিয়ে জাগ্রত হও আমাদের মধ্যে, পুনঃপুনঃ উজ্জ্বল হয়ে দাও তুমি আমাদের দীপ্তিময়ের সত্যবুদ্ধি। হে দেব, দেবতাদের বহন করে নিয়ে এস যজ্ঞের জন্য ; সখা তুমি, সখাদের জন্য তোমার সত্যমন নিয়ে যজ্ঞ কর, হে অগ্নি ॥১॥

২। যং দেবাসস্ত্রিরহন্নাযজন্তে দিবেদিবে বরুণো মিত্রো অগ্নিঃ।
সেমং যজ্ঞং মধুমন্তং কৃধী নস্তনূনপাদ্ঘৃতযোনিং বিধন্তম্ ॥২॥

যম্—যাকে
দেবাসঃ—দেবতারা
ত্রিঃ অহন্—দিনে তিনবার
আ-যজন্তে—যজ্ঞ দিয়ে পূজা করে

দিবে-দিবে—প্রতিদিন
বরুণঃ—বরুণ
মিত্রঃ—মিত্র
অগ্নিঃ—অগ্নি
সঃ—সেই (তুমি)
ইমম্—এই
যজ্ঞম্—যজ্ঞকে
মধুমন্তম্—মধুময়
কৃধি—কর
নঃ—আমাদের
তনূ-নপাৎ—হে তনুজ
ঘৃতযোনিম্—জ্যোতির্ময় জঠর
বিধন্তম্—গড়ে তোলে যে তাকে, গঠন করে যে তাকে

দেবতারা, বরুণ, মিত্র, অগ্নি, সকলেই যাকে প্রতিদিন তিনবার যজ্ঞ দিয়ে পূজা করে, যজ্ঞার্পণ করে সেই অগ্নি তুমি আমাদের এই যজ্ঞকে মধুময় করে তোল, আমাদের দেহজ সন্তান তুমি, তুমি গড়ে তোল জ্যোতির্ময় জঠরকে ॥২॥

৩। প্র দীধিতির্বিশ্ববারা জিগাতি হোতারমিড়ঃ প্রথমং যজধ্যৈ।
অচ্ছা নমোভির্বৃষভং বন্দধ্যৈ স দেবান্যক্ষদিষিতো যজীয়ান্ ॥৩॥

প্র (+জিগাতি)—এগিয়ে
দীধিতিঃ—দীপ্তি
বিশ্ববারা—বিশ্বকাম্যধারিণী
জিগাতি (প্র+)—এগিয়ে চলেছে
হোতারম্—আহ্বাতা, আহ্বায়ক
ইড়ঃ—প্রেরণাসব, এষণাসব
প্রথমম্—আদি ও মুখ্য
যজধ্যৈ—যজ্ঞে অর্পণ করবার জন্য
অচ্ছ—অভিমুখে
নমোভিঃ—সকল প্রণতি দিয়ে
বৃষভম্—শক্তিময়কে
বন্দধ্যৈ—বন্দনা-পূজা করবার জন্য
সঃ—সে
দেবান্—দেবতাদের
যক্ষৎ—যজ্ঞদান করে যেন
ইষিতঃ—অনুপ্রেরিত হয়ে
যজীয়ান্—পরম যজ্ঞক্ষম যে

পরমাদীপ্তি সকল কাম্য ধারণ করে এগিয়ে চলেছে আদি ও মুখ্য হোতার অভিমুখে সকল প্রেরণাকে যজ্ঞে উৎসর্গ করবার জন্য, আমাদের প্রণতিসকলের সহায়ে সেই শক্তিমানের অভিমুখে তাকে পূজা করবার জন্য, সত্যপ্রেরণাময় সে দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করে যেন, সে হন শ্রেষ্ঠ যজ্ঞকৃৎ ॥৩॥

৪। ঊর্ধ্বো বাং গাতুরধ্বরে অকার্যূর্ধ্বা শোচীংষি প্রস্থিতা রজাংসি।
দিবো বা নাভা ন্যসাদি হোতা ত্বৃণীমহি দেবব্যচা বি বর্হিঃ ॥৪॥

ঊর্ধ্বঃ—ঊর্ধ্বমুখী
বাম্—তোমাদের উভয়ের
গাতুঃ—পথ
অধ্বরে—যজ্ঞযাত্রায়
অকারি—করা হয়েছে
শোচীংষি—দীপ্তি সব, শিখাসব
প্র-স্থিতা—চলে গিয়েছে
রজাংসি—অন্তরিক্ষ-জগৎ
দিবঃ—দ্যুলোকের
বা—এবং, অথবা
নাভা—নাভিদেশে
নি+অসাদি—আসীন হয়েছে
হোতা—হোতা
ত্বৃণীমহি (বি+)—বিস্তৃত করে ধরি
দেব-ব্যচাঃ—দেবাধিষ্ঠিত আকাশ (দেবতাদের দিয়ে ব্যাপ্ত)
বি (+ত্বৃণীমহি)—বিস্তৃত করে ধরি
বর্হিঃ—কুশতৃণ

যজ্ঞযাত্রায় তোমাদের দুজনের জন্য ঊর্ধ্বে পথ করা হয়েছে, সে পথ চলে গিয়েছে দীপ্তিসকলের দিকে, অন্তরিক্ষলোকের দিকে ; দিব্য হোতা আসন নিয়েছে দ্যুলোকের নাভিকেন্দ্রে, আমরা বিস্তীর্ণ করে দিয়েছি দেবতাদের জন্য ব্যাপ্তি এক আর কুশের আসন ॥৪॥

৫। সপ্ত হোত্রাণি মনসা বৃণানা ইন্বন্তো বিশ্বং প্রতি যন্নৃতেন।
নৃপেশসো বিদথেষু প্র জাতা অভীমং যজ্ঞং বি চরন্ত পূর্বীঃ ॥৫॥

সপ্ত—সপ্ত
হোত্রাণি—আবাহন
মনসা—মনের আশ্রয়ে
বৃণানাঃ—বরণ করে (তারা)
ইন্বন্তঃ—অধিকার করেছে

বিশ্বন্—যাবতীয়
প্রতি+যন্—এগিয়ে চলেছে (প্রতিগচ্ছতি—সাধারণ)
ঋতেন—সত্যের সহায়ে
নৃ-পেশসঃ—দেবপুরুষ-রূপী
বিদথেষু—জ্ঞানার্জন পথে
প্র+জাতাঃ—জন্মগ্রহণ করেছে
অভি—অভিমুখে
ইমম্—এই
যজ্ঞম্—যজ্ঞ
বি-চরন্ত—চারিদিকে চলেছে
পূর্বীঃ—বহুল

মনের সহায়ে সপ্ত আবাহন তারা বরণ করে অধিকারে নিয়েছে, সত্যের সহায়ে তারা যাবতীয় বস্তু জয় করে চলেছে সত্যের অভিমুখে, বহুল শক্তিসব দেবরূপ ধারণ করে জ্ঞানের পথে জন্মগ্রহণ করেছে, এই যজ্ঞের অভিমুখে চারিদিক ঘিরে চলে এসেছে ॥৫॥

৬। আ ভন্দমানে উষসা উপাকে উত স্ময়েতে তন্বা বিরূপে।
যথা নো মিত্রো বরুণো জুজোষদিন্দ্রো মরুত্বাঁ উত বা মহোভিঃ ॥৬॥

আ-ভন্দমানে—আনন্দপূর্ণ হয়ে
উষসৌ—দিবারাত্রি
উপাকে—সংযুক্ত হয়ে
উত—আর
স্ময়েতে—হাস্যোজ্জ্বল হয়েছে
তন্বা—দেহ নিয়ে
বিরূপে—ভিন্নরূপে
যথা—যেন
নঃ—আমাদের
মিত্রঃ—মিত্র
বরুণঃ—বরুণ
জুজোষৎ—পরিতৃপ্ত হয়
ইন্দ্রঃ—ইন্দ্র
মরুত্বান্—মরুৎগণসহ
উত+বা—আরও
মহোভিঃ—মহত্বসব নিয়ে

দিবা ও রাত্রি তাদের বিভিন্ন অথচ সংযুক্ত রূপ নিয়ে পরমানন্দে ছড়িয়েছে তাদের স্মিতহাস্য যাতে আমাদের অন্তরে মিত্র আর বরুণ আর ইন্দ্র তার মরুৎগণসহ আরও সকল মহত্ব নিয়ে পরমতৃপ্তি গ্রহণ করে ॥৬॥

৭। দৈব্যা হোতারা প্রথমা নিষেদে সপ্ত পৃক্ষাসঃ স্বধয়া মদন্তি।
ঋতং শংসন্ত ঋতমিত আহুরনু ব্রতং ব্রতপা দীধ্যানাঃ ॥৭॥

দৈব্যা—দিব্য
হোতারা—আহ্বাতা দুইজন
প্রথমা—সর্বাদি
নি ষেদে—অভিষেক করি
সপ্ত—সাতটি
পৃক্ষাসঃ—ভোগ
স্বধয়া—স্বধর্ম অনুসারে
মদন্তি—আনন্দ গ্রহণ করে
ঋতম্—সত্যকে
শংসন্তঃ—তারা প্রকাশ করে
ঋতম্ ইৎ—সত্যকেই, সত্যই
তে—তারা
আহুঃ—বলে, কহে, বাচন করে
অনু—অনুসারে
ব্রতম্—ধর্ম
ব্রতপাঃ—ধর্মরক্ষী
দীধ্যানাঃ—প্রদীপ্ত তারা

আমি আদিতন দিব্য আহ্বাতাযুগলের অভিষেক করি, ভোগসপ্তক স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আনন্দনিমগ্ন, সত্যকে তারা প্রকাশ করে, সত্যই কহে তারা, ধর্ম অনুসারে ধর্মকে তারা রক্ষা করে, জ্ঞানদীপ্ত তারা ॥৭॥

৮। আ ভারতী ভারতীভিঃ সজোষা ইড়া দেবৈর্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ।
সরস্বতী সারস্বতেভিরর্বাক্ তিস্রো দেবীর্বর্হিরেদং সদন্ত ॥৮॥

আ—আগত
ভারতী—দেবী ভারতী
ভারতীভিঃ—বোধনী বাক্‌সহ
সজোষাঃ—সংযুক্ত হয়ে
ইড়া—ইলাদেবীর
দেবৈঃ—দেবতাদের সঙ্গে
মনুষ্যেভিঃ—মানুষদের সঙ্গে
অগ্নিঃ—অগ্নি
সরস্বতী—দেবী সরস্বতী
সারস্বতেভিঃ—প্রেরণাময়ী বাক্‌সহ
অর্বাক্—নিম্নমুখে

তিস্রঃ—তিনজন
দেবীঃ—দেবী
বর্হিঃ—আসনে, যজ্ঞাসনে
আ (+সদন্ত)—আসীন হয় যেন
ইমম্—এই
সদন্ত (আ+)—আসীন হয় যেন

দেবী বাক্‌শক্তি তাঁর বাক্‌শক্তিদের সঙ্গে করে সমাগত, দেবী ইলা দেবতাদের সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে সমাগত, অগ্নিও আগত, আর দেবী সরস্বতী তাঁর সারস্বত শক্তিদের সঙ্গে করে সমাগত ; দেবীত্রয় নিম্নে নেমে এসে এই যজ্ঞাসন যেন গ্রহণ করেন ॥৮॥

৯। তন্নস্তুরীপমধ পোষয়িত্নু দেব ত্বষ্টর্বি রন্নাণঃ সাবীঃ।
যতো বীরঃ কর্মণ্যঃ সুদক্ষো যুক্তগ্রাবা জায়তে দেবকামঃ ॥৯॥

তৎ—সেই
নঃ—আমাদের কাছে
তুরীপম্—তুরীয়কে
অধ—অনন্তর
পোষয়িত্নু—পোষক, পুষ্টিকৃৎ, পোষয়িতা, পরিপুষ্ট করে যে
দেব—হে দেবতা
ত্বষ্টঃ—রূপকর্তা
বি (+সাবীঃ)—মুক্ত কর
রন্নাণঃ—আনন্দভোগী, পরম আনন্দভোগী
সাবীঃ (বি+)—মুক্ত কর
যতঃ—যেখান হতে
বীরঃ—বীরবর
কর্মণ্যঃ—কর্মকৃৎ, কর্মকুশল
সু-দক্ষঃ—সুবিবেচক
যুক্তগ্রাবা—সোমরস নিষ্কাশন করে যে পাথর (অভিষব)
জায়তে—জন্মগ্রহণ করে
দেবকামঃ—দেবকামী

হে দিবা রূপকৃৎ, তোমাতে পূর্ণ আনন্দ, আমাদের দিকে খুলে ধর সেই আমাদের পোষয়িতা তুরীয়কে, যেখান হতেই জন্মগ্রহণ করেন সেই পুরুষবীর যিনি সুকর্মা, সুবিবেচক, যিনি সোমরস নিষ্কাশন করেন, দেবতারা হন যাঁর কাম্য ॥৯॥

১০। বনস্পতেঽব স্রজোপ দেবানগ্নির্হবিঃ শমিতা সূদয়াতি।
সেদু হোতা সত্যতরো যজাতি যথা দেবানাং জনিমানি বেদ ॥১০॥

বনস্পতে—বনস্পতি

অব+সৃজ—নীচে ফেলে দাও, সৃষ্টি কর
উপ—কাছে
দেবান্—দেবতাদের
অগ্নিঃ—অগ্নি
হবিঃ—আহুতিকে
শমিতা—শমকর্তা, সিদ্ধিকর্তা
সূদয়াতি—ত্বরায় নিয়ে যায়
সঃ ইৎ—সে-ই
ঊঁ—নিশ্চয়
হোতা—আবাহক
সত্যতরঃ—সত্যতর
যজাতি—যজ্ঞসাধন করে
যথা—কারণ
দেবানাম্—দেবতাদের
জনিমানি—জন্ম সব
বেদ—সে জানে

হে বনস্পতি, তোমার সৃষ্ট ফল দেবতাদের সমীপে নিয়ে এস, অগ্নি হলেন সিদ্ধিকৃৎ, তিনি আহুতিকে ত্বরান্বিত করে নিয়ে চলেছেন, তিনিই হলেন সত্যতর আহ্বায়ক হোতা, যেহেতু তিনি দেবতাদের জন্মকথা জানেন ॥১০॥

১১। আ যাহ্যগ্নে সমিধানো অর্বাঙিন্দ্রেণ দেবৈঃ সরথং তুরেভিঃ।
বর্হির আস্তামদিতিঃ সুপুত্রা স্বাহা দেবা অমৃতা মাদয়ন্তাম্ ॥১১॥

আ যাহি—এস এখানে
অগ্নে—হে অগ্নি
সম্-ইধানঃ—সমিদ্ধ হয়ে
অর্বাঙ্—নিম্নে
ইন্দ্রেণ—ইন্দ্রসহ
দেবৈঃ—দেবতাদের সহ
সরথম্—একই রথে
তুরেভিঃ—বেগবান
বর্হিঃ—কুশাসন
নঃ—আমাদের
আস্তাম্—আসীন হয় যেন
অদিতিঃ—অদিতি
সু-পুত্রা—বীরপুত্র যার, সুমহান পুত্রদের মাতা
স্বাহা—স্বাহাময়ে

দেবা:—দেবতারা।

অমৃতা:—অমরসকলে

মাদয়ন্তাম্—আনন্দমত্ত হয় যেন

হে অগ্নি, এই এখানে তুমি নেমে এস, ইন্দ্র আর দ্রুতগামী দেবতাদের সহ একই রথে, সুমহান পুত্রদের মাতা অদিতি আমাদের এই কুশাসনে স্থান গ্রহণ করেন যেন, দেবতারা, অমরসকলে স্বাহা-মন্ত্রে যেন আনন্দমত্ত হয়ে ওঠে ॥১১॥

চিন্তা প্রসঙ্গে*

শ্রীমা

তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, গত মাসে আমরা দুটি জিনিস লক্ষ্য করেছি।

প্রথমটি হল, চিন্তা এক জীবন্ত, সক্রিয়, স্বশাসিত সত্তা।

দ্বিতীয়টি হল, যে দূষিত মানস পরিবেশে আমরা বাস করি তার ক্ষতিকর প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হতে গেলে একটা শক্তিময় জ্যোতির্ময় শুদ্ধ বুদ্ধিগত সমন্বয় নিজেদের মধ্যে আমাদের গড়ে তুলতে হবে।

তার জন্যে, আমাদের নাগালের মধ্যে অর্থাৎ আমাদের মানস ক্রিয়ার ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে যেসব উচ্চতর চিন্তারাজি সেসবকে আমাদের দিকে আকর্ষণ করে আমাদের নিজস্ব করে তুলতে হবে।

কিন্তু চিন্তারাজি জীবন্ত সব সত্তা বলে আমাদের মত তাদেরও রয়েছে সম্প্রীতি ও বিদ্বেষ, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ।

কাজেকাজেই তাদের সম্বন্ধে আমাদের গ্রহণ করতে হবে একটা বিশেষ ধরনের মনো-ভাব, তাদের সঙ্গে এমনভাবে আচরণ করতে হবে যেন তাদের রয়েছে ব্যক্তিসত্তা, কাউকে বন্ধু করতে চাইলে যেমন করি তেমনি তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করতে হবে, সহৃদয় হতে হবে, তাদের দিতে হবে বিশেষ অধিকার।

এই প্রসঙ্গে এ-যুগের একজন দার্শনিক লিখছেন "কখনো কখনো ভাবুকেরা তাঁদের ধ্যানে, বুদ্ধির জগতে অন্বেষণ অভিযাত্রীরা তাঁদের অভিযানের মধ্যে, আর কবিরা— চিন্তার রূপকার যাঁরা—তাঁদের স্বপ্নে অস্ফুট-আচ্ছন্নভাবে অনুভব করেন ও বোধ করেন যে ভাব অবাস্তব অশরীরী কোন জিনিস নয়। মনে হয় যেন তার ডানা আছে, উর্ধ্বে উঠে যায়, কাছে আসে, পালিয়ে যায়, ধরা দিতে চায় না আবার ধরা দেয়; এমন কিছু যাকে ডাকতে হবে, অনুসরণ করতে হবে, বশে আনতে হবে।

সবচেয়ে সূক্ষ্মদর্শী যাঁরা, তাঁদের কাছে ভাব মনে হয় যেন দূরের কেউ—রয়েছে তার কত না খেয়ালীপনা আর কত আকাঙ্ক্ষা, যত পছন্দ-অপছন্দ, রাণীর মত তার অবজ্ঞা, কুমা-রীর মত তার সলজ্জভাব। তাঁরা জানেন, তাকে জয় করতে হলে লাগে প্রভূত যত্ন কিন্তু অল্পেতেই হারাতে হয়, আর এও জানেন যে ভাবের জন্য এমন এক ধরনের মানস-অনুরাগ আছে, যে অনুরাগ আত্মোৎসর্গ আর আত্মদানে গড়া এবং যেটি না থাকলে ভাব কখনো মনের আপন হয়ে উঠতে পারে না।

কিন্তু এসবই হল সুন্দর প্রতীকমাত্র; বাস্তবিক এসবের আড়ালে নিহিত রয়েছে যে একেবারে যথার্থ সত্য, তা অতি অল্প লোকেই দেখতে জানে।

---

* ১৯১২ সালে প্যারিসে মায়ের প্রদত্ত চিন্তাপ্রসঙ্গে ধারাবাহিক ভাষণগুলির এটি হল দ্বিতীয়। প্রথমটি 'পুরানো লেখা' (*Paroles d'Autrefois*) গ্রন্থে আগেই প্রকাশিত হয়েছে।

এই যে বস্তুটি জীবন্ত ও স্পন্দমান, গতিশীল ও কল্লোচ্ছল, সর্বত্র স্রোতে বয়ে চলে আর নিজেকে চারিয়ে দেয় দেশ-কালের ভিতর দিয়ে, ক্রিয়াশীল, সংকল্প করে, অবাধে বেছে নেয় তার আপন সময় ও ক্ষেত্র, সে-বস্তুটি কি তা জানতে—এক কথায়, ভাবকে সত্তা-রূপে জানতে—একজন প্লেটোর প্রয়োজন হয়েছিল।"

এই সুন্দর উদ্ধৃতি থেকে বিশেষ করে একটি বাক্য নেওয়া যাক "ভাবের জন্যে এমন এক ধরনের মানস-অনুরাগ আছে, যে অনুরাগ আত্মোৎসর্গ আর আত্মদানে গড়া এবং যেটি না থাকলে ভাব কখনো মনের আপন হয়ে উঠতে পারে না।"

এটি শুধু একটি রূপকল্প নয়। ভাবের সঙ্গে সচেতন অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে যুক্ত হতে গেলে, তার কাছে আমাদের নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে হবে, নিঃস্বার্থ ভালবাসায় ভালবাসতে হবে তাকে তারই মধ্যে তারই জন্যে।

আজ আমরা জানবার চেষ্টা করব এই ভালবাসা কি দিয়ে গড়া আর, সেই সঙ্গে, তা আমাদের মধ্যে যাতে বিকশিত হয় তার জন্য আমাদের কি করতে হবে।

প্রথম যে ভাবটি গ্রহণ করতে হবে, সব থেকে অপরিহার্য যা, তা হল আমাদের শক্তিতে যতখানি অর্জন করা সম্ভব ততখানি পূর্ণ মানস অকপটতা।

সকল রকম অকপটতার মধ্যে, এটিই সম্ভবতঃ সব থেকে দুরূহ। মনোগতভাবে আত্ম-প্রতারণা না করা খুবই শক্ত ব্যাপার।

সবার আগে, গত ডিসেম্বরে* যেমন আমি তোমাদের বুঝিয়ে বলেছি, আমাদের রয়েছে চিন্তার এক এক অভ্যস্তধারা, তা এসেছে আমাদের শিক্ষা আমাদের পরিবেশের প্রভাব থেকে আর তা প্রায় সবসময়েই সামাজিক যত রীতিনীতি ও গোষ্ঠিপ্রভাবিত সব ধারণায় গড়া। যেসব চিন্তা স্বরূপমাত্রায়ও আমাদের এই মানস গঠন বিপর্যস্ত করতে পারে, সেসবের চাইতে এই অভ্যাস স্বভাবতঃই অনেক বেশি স্বাগত জানাবে সেইসব চিন্তাকে যা আমাদের মস্তিষ্কে আগে থেকেই বিন্যস্ত সব চিন্তার সমধর্মী না হলেও সদৃশ।

এই একই কারণে, তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই, নিজে নিজে চিন্তা করতে শেখা আমাদের পক্ষে সময় সময় কত কঠিন। প্রায়শঃই সামাজিক প্রথা আর গোষ্ঠিগত ধারণায় গড়া আমাদের চিন্তার অভ্যস্ত ধারাতে যে কোনরকম পরিবর্তন আনতেই আমরা দ্বিধা করি, কারণ আমাদের সমগ্র অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠা তার উপরে। গভীরতর চিন্তার আলোতে, আর তার ফলে পরিবেশের প্রথা ও অভ্যাস থেকে অধিকতর মুক্ত, আপন অস্তিত্বকে দেখতে সম্মত হতে গেলে চাই বিপুল সাহস চাই প্রগতির প্রতি বিপুল অনুরাগ।

এ থেকেই বুঝতে পারছ, নিজের অভ্যাসে এমন একটা বিপ্লব আনতে গেলে,—যার একমাত্র লক্ষ্য হল ভাবের সঙ্গে একটা অধিকতর অন্তরঙ্গ অধিকতর সচেতন সম্বন্ধ স্থাপন করবার শক্তি অর্জন,—কি বিপুল, অতি বিপুল অনুরাগই-না থাকা প্রয়োজন ভাবের প্রতি।

যেসব চিন্তাকে স্বাগত জানান হয়েছে এবং অবিরত অটল ধ্যানের মধ্য দিয়ে যারা আমাদের নিজস্ব হয়ে উঠেছে সেসবকে নিয়ে যখন আমাদের মানস সমন্বয় গড়ে উঠেছে তখনও ভাবকে আমাদের প্রবল অনুরাগে ভালবাসতে হবে, হয়ত আরও প্রবলতরভাবেই, যাতে

---

* শ্রীমা বর্তমান ভাষণটি দিয়েছিলেন ১৯১২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী।

আমরা সর্বদাই নূতন কোন ভাবের সন্ধানে থাকি, যদি সে আমাদের কাছে আসতে চায় তাহলে যেন তাকে সব থেকে সাগ্রহে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত থাকি। কারণ আমরা বেশ জানি যে প্রতিটি নূতন ভাব আমাদের মানস সমন্বয়কে নূতন করে গড়তে আমাদের বাধ্য করবে, বাধ্য করবে যেসব ভাবকে মুখ্য বলে মনে হয়েছিল সেসবকে গৌণ স্তরে নামিয়ে দিতে, দীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত অপর সব ভাবকে সামনে আলোয় এনে ধরতে, আর বাধ্য করবে তাদের সকলকে আবার সুবিন্যস্ত করে ধরতে যাতে মস্তিষ্কের প্রভূত ক্ষতি করে তারা পরস্পর সংঘর্ষ-রত না হয়; এক কথায়, দীর্ঘ কখন-বা বেদনাদায়ক একটি প্রয়াসে আমাদের বাধ্য করবে। বাস্তবিক, ভাবেদের ব্যাপারে আমরা কদাচিৎ উদাসীন থাকি, কতকগুলিকে অন্যদের তুলনায় আমরা বেশি পছন্দ করি, আর ফলে সেগুলি আমাদের মানস-ক্রিয়ার ক্ষেত্রে এমন স্থান অধিকার করে বসে সবসময় যার যোগ্য তারা নয়।

আর যদি তাদের জায়গায় আরও যথাযথ আরও সত্যময় অন্যসব ভাবকে স্থান করে দিতে হয়, তা করবার আগেও প্রায়ই দীর্ঘকাল ধরে আমরা ইতস্তত: করি; অপরিহার্য বন্ধু হিসাবে আমরা তাদের আঁকড়ে থাকি, আর তাদের গুণগুলির মত তাদের দোষগুলিকেও আমরা ভালবাসি,—এ হল সব থেকে খারাপভাবে লোককে ভালবাসা, সব চেয়ে অলস ও স্বার্থপর ভাবেও বটে,—কারণ যাদের কাছে আমরা উন্নতির এক নিরন্তর প্রয়াস দাবি করি তাদের চাইতে যাদের আমরা তোষামোদ করি তারা সর্বদাই আমাদের বেশি ভাল চোখে দেখে।

কিন্তু সেখানেই আমাদের বাধার দুরূহতার শেষ নয়।

যে বুদ্ধিগত শিক্ষা আমরা পেয়েছি তার দরুণ কিংবা আমাদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ফলে, কোন্ বা কোন্ সব উপায়ে ভাবরাজি আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হবে সে-ব্যাপারেও আমাদের থাকে পূর্বগত ধারণা।

এই সব পূর্বগত ধারণা হল আসলে কতগুলি কু-সংস্কার যা আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে।

প্রত্যেকের পক্ষে তারা স্বতন্ত্র।

কারো কারো রয়েছে গ্রন্থের কুসংস্কার। কোন ভাব তাদের চোখে বিবেচনার যোগ্য হতে গেলে তা কোন বিখ্যাত পুস্তকে, মানবসমাজের কোন আর্ষগ্রন্থে তা প্রকাশিত হয়েছিল এমনটি হতেই হবে, আর এর বাইরে সব চিন্তাই তাদের চোখে সন্দেহের বস্তু।

অনেকে আছে সরকারী বিজ্ঞানের ভিতর দিয়ে না হলে ভাবটি মেনে নেয় না, আবার অনেকে আছে প্রাচীন বা নবীনরূপে তালিকাভুক্ত ধর্মসমূহের ভিতর দিয়ে না হলে তাকে স্বীকৃতি দেয় না। অন্যদের পক্ষে, ভাবটিকে এমন একজন বিখ্যাত এবং প্রভূত সম্মানসূচক খেতাবে ভূষিত ব্যক্তির বাণী হতে হবে যাতে কেউই তার মূল্য নিয়ে প্রশ্ন তুলতে না পারে।

আরও অন্যরা, বেশি ভাবপ্রবণ যারা, চিন্তার সংস্পর্শে আসতে গেলে তাদের চাই একজন গুরু, তাদের কল্পনায় গড়া আদর্শ মানুষী নমুনার পূর্ণবিগ্রহ যিনি। তাদের ভাগ্যেও রয়েছে বিষাদময় হতাশা, কারণ তারা ভুলে যায় যে কেবলমাত্র তারাই তাদের আদর্শকে সিদ্ধ করতে সক্ষম, আর যাঁর উপরে তারা আস্থা রেখেছে, তাঁর আপন আদর্শটি সিদ্ধ করবার দায়িত্ব রয়েছে তাঁর; ফলে, তা যত বড় আদর্শই হোক না কেন, তাদের নিজেদের আদর্শ

থেকে তা বেশ কিছুটা স্বতন্ত্র ধরনের হতেই পারে। এ ক্ষেত্রে যা প্রায়ই ঘটে তা হল, এই ভিন্নমুখিতা সম্বন্ধে সচেতন হবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা মানুষ ও ভাব উভয়কে একই সাথে বিসর্জন দেয় যেহেতু তারা ভাবটিতে সংসক্ত হয়েছিল শুধু মানুষটির জন্যে।

এটা হল উদ্ভট, কারণ ভাবেদের মূল্য তাদের নিজেদেরই মধ্যে—সেসব ভাবকে কারা প্রকাশ করে ধরেছে তাদের অপেক্ষা না রেখেই।

সব শেষে, আরেক ধরনের লোক আছে যারা ভালবাসে অত্যাশ্চর্য কিছু, তারা সত্যকে স্বীকার করে শুধু তখনই যখন তা তাদের কাছে আসে অপার্থিব প্রকাশের রহস্যময় পোশাক পরে, স্বপ্নে বা ভাব-সমাধির মধ্যে।

তাদের পক্ষে গুরুকে হতে হবে তাদের ভগবান, একজন দেবদূত বা মহাত্মা, যিনি তাদের ধ্যান বা সুপ্তির মধ্যে তাঁর অমূল্য উপদেশ দান করবেন।

বলা বাহুল্য যে এই পদ্ধতিতে অন্যগুলির চাইতে আরো বেশি সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। অসাধারণ উপায়ে কোন চিন্তা আমাদের কাছে এলেই যে তা যথার্থ ও সত্য হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই।

দেখ, ভাবের সত্যকার প্রেমিক জানে যে আগ্রহ নিয়ে খুঁজলে তাকে সর্বত্রই পাওয়া যাবে; বিশেষ করে, গোপন যত ফল্গুধারার মধ্যে তাকে যতখানি পাওয়া যাবে, ততখানি পাওয়া যাবে না সেইসব ধারার মধ্যে যারা সুবিপুল ও সুপ্রসিদ্ধ প্রবাহিনীতে রূপান্তরিত হতে গিয়ে আদি শুদ্ধতা হারিয়ে ফেলেছে এবং সেইসঙ্গে সবরকমের আবর্জনা বয়ে নিয়ে দূষিতও হয়েছে।

ভাবের প্রেমিক জানে যে জ্ঞানীর মুখ দিয়ে যেমন তেমনি শিশুর মুখ দিয়েও ভাব তার কাছে আসতে পারে।

আরও বড় কথা, এমনি অপ্রত্যাশিতভাবেই প্রায়শঃ সে তার কাছে এসে হাজির হতে পারে।

সেইজন্যই বলা হয়ে থাকে "শিশুদের মুখ দিয়ে সত্যের প্রকাশ ঘটে।"

কারণ, বয়ঃপ্রাপ্তের চিন্তার সুনির্দিষ্টতা শিশুর মধ্যে যদি না-ও থাকে, তেমনি তার আবার নেই অলস অভ্যাস প্রসূত সেই কাঠিন্য যা বয়ঃপ্রাপ্তের মধ্যে চিন্তা পরিচিত শ্রেণীর না হলেই তার প্রকাশে বাধা দেয়।

তাছাড়া, অভ্যাস ও কাঠিন্যে গড়া পরিবেশের এই বিকৃতি এড়াবার জন্যই প্রাচীনকালের রহস্যকেন্দ্রগুলি, যেখানে তরুণ ভাববাদীরা শিক্ষালাভ করত, প্রতিষ্ঠিত হত শহর থেকে দূরে।

আর এই কারণেই সকল শ্রেষ্ঠ আচার্যরাই নির্জনতার মধ্যে তাদের শিক্ষানবিশী শুরু করতেন। কারণ, অমার্জিত লোকের মস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে ফুটতে গিয়ে চিন্তা থেকে যেমন অনেক জিনিস বাদ পড়ে যায়, মানবসমাজের কৃত্রিম জীবনধারাতে গড়ে ওঠার ফলে মার্জিত লোকের মস্তিষ্কের মধ্য দিয়েও তেমনি অনেক কিছু বাদ পড়ে।

চিন্তার সুদূরের কণ্ঠ শুনতে পাবার জন্য কতখানি নীরবতার না প্রয়োজন—ক্ষণিকের অলীক বাহ্য নীরবতা নয়, পরন্তু স্থায়ী গভীর সত্যকার সর্বাঙ্গীণ নীরবতা!

সেইজন্যই জ্ঞানের অকপট অনুরাগী এও জানে যে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠরাই সর্বদা সবচেয়ে

বিনম্র, সবচেয়ে অপরিচিত। কারণ যিনি এ-তত্ত্ব জানেন এবং যাঁর পক্ষে এটা সম্ভব তিনি মানুষের লুব্ধ গ্রাসে তাঁকে নিক্ষেপ করবে যে বহির্মার জয়ধ্বনি তার থেকে নৈঃশব্দ্য ও ছায়া-লোকই পছন্দ করেন যেখানে কোন কিছু দ্বারা উত্তেজিত না হয়ে তিনি তাঁর আপন কর্ম সম্পাদন করতে পারবেন।

চিন্তার প্রেমিক জানে তার চারিদিকে সর্বত্রই চিন্তাকে সে খুঁজে পাবে, অনন্ত সূর্যের মধ্যে যেমন ক্ষুদ্র ফুলটিতেও তেমনি; আর যে-ভাবের চিরঅন্বেষু সে সেই ভাবের ধারণ করবার পক্ষে কোন বস্তু বা জীবই একান্ত নগণ্য বা অসম্ভাচ্ছন্ন বলে তার কাছে মনে হয় না।

কিন্তু সর্বোপরি সে জানে যে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধই হল নিঃসন্দেহে ভাবের সঙ্গে সব থেকে নির্ভরযোগ্য ও শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ।

বিশ্বগত বস্তুতে গড়া বলে আমরা এই ব্রহ্মাণ্ডেরই ক্ষুদ্র প্রতিরূপ।

যেহেতু উপযুক্ত পরিবেশ ছাড়া কোন ঘটনাই ঘটতে পারে না, ভাবের অস্তিত্বই তদুপযুক্ত লোকের অস্তিত্বের প্রমাণ করে; মুক্ত মনীষার সেই রাজ্য সর্বদাই রূপময় তবে রূপের বশীভূত নয়, আর সে-রাজ্য মহাবিশ্বে যেমন তেমনি আমাদের মধ্যেও বর্তমান।

তাহলে আমরা যদি নিজেদের যথেষ্ট একাগ্র করি, আমাদের গভীরের সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠি, তাহলে তার মধ্যে তার ভিতর দিয়েই বিশ্বগত মুক্ত মনীষার সঙ্গে, ভাব-জগতের সঙ্গে আমরা সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারব।

তখন, আমাদের দর্পণখানি উজ্জ্বল রাখতে, সকল রকম পূর্বসংস্কার ও অভ্যাসের ধূলিময়লা থেকে তাকে মুক্ত রাখতে যদি আমরা যত্ন নিই, সকল ভ্রান্তি সেখানে নিজেকে প্রতিফলিত করতে পারবে স্বল্পতম বিকৃতির মধ্য দিয়ে, আমরা বোধি (জ্ঞান) অর্জন করব, অর্জন করব সত্য-সূর্যের রশ্মিরাজি প্রতিফলিত করবার সামর্থ্য—সিদ্ধার্থ গৌতম এই আশাই আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হল "কি করে বোধি লাভ করা যায়?" তিনি উত্তরে বললেন

"বোধির কোন বিশেষ চিহ্ন বা লক্ষণ কিছু নেই এ সম্বন্ধে যা জানতে পারা যায় তা কোন কাজে আসে না কিন্তু আত্মানুশীলনে যে যত্ন নেওয়া হয় তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ যেন পরিষ্কৃত ও মসৃণ এক দর্পণের মত, যা হয়ে উঠেছে নির্মল উজ্জ্বল, যার ফলে সেখানে প্রতিবিম্বগুলি ঝকঝকে ও সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।"

আরও:

"যার মধ্যে অন্ধকার নেই, কলঙ্ক নেই, নির্দোষ চরিত্র, পূর্ণ শুদ্ধ যে, সে যদি অনাদি-কাল থেকে আজ পর্যন্ত দশলোকের এই জগতে যা-কিছু রয়েছে তার কিছুই না জানে, কখনও না-ও শুনে থাকে, এক কথায় যদি তার এসবের কোন জ্ঞানই স্বল্পমাত্রায়ও না থাকে, তবুও সর্বজ্ঞের সর্বোচ্চ জ্ঞান তার অধিকারে। সে হল এমন একজন যার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলা হয়: স্বচ্ছদৃষ্টি।" এখানে তাহলে দেখছ, পাণ্ডিত্যের একেবারে বাহ্য ও ভাসাভাসা সম্বন্ধের চাইতে ভাবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেরই স্তুতি।

এই প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের সুবিধা গণনার বাইরে।

এই প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ভাবকে নূতন করে খুঁজে পেতে এবং ভালবাসতে আমাদের সাহায্য

করে, যে ভাব রয়েছে আপাতদৃশ্য সবকিছুর, সকল আবরণের সকল রূপের পিছনে, এমনকি তা সব থেকে বর্বর, সব থেকে অমার্জিত, সব থেকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হলেও।

এইভাবে, যে মহাজ্ঞানীর কথা প্রথমবারের ভাষণে তোমাদের বলেছি তাঁর অন্তরাত্মার সেই অবস্থাকে আমরা জীবনে ফলিয়ে ধরতে পারি, একজন গুরু যে-অবস্থার সংজ্ঞা দিচ্ছেন এই ভাবে :

'"সত্যের মধ্যে যে চলেছে, কোন ভুলভ্রান্তিতেই সে বিক্ষুব্ধ হয় না, কারণ, সে জানে যে ভুলভ্রান্তিই হল সত্যের দিকে জীবনের প্রথম প্রয়াস।"

ফলে কোন ভাবের এক কণাও আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যায় না ; যেখানেই তা লুকিয়ে থাকুক না কেন, তাকে আমরা আবিষ্কার করতে, পোষণ করতে জানি।

অধিকন্তু, যখন আমরা কোন ভাবের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, যখন আমরা তার মধ্যে তার জন্যেই তাকে জানি, আমরা তখন বাইরের দৃষ্টিতে সব থেকে বিচিত্র যাকিছু, একেবারে স্বতন্ত্র যেসব রূপ সেসবের ভিতর দিয়েও তাকে চিনে নিই।

ভাবের সঙ্গে স্বরূপতঃ কারও সম্বন্ধ ঘটেছে কি না তা জানবার নিদর্শন হিসাবেও এ-বৃত্তিটি কাজে লাগতে পারে অর্থাৎ সে কি ভাবটিকে আপন করে নিয়েছে, না কি সে হল সেই দলের একজন যারা কোন একটা মতবাদ, কোন একটা বিশেষ ভাষা যথাসাধ্য অক্ষরীভূত করে নিয়েছে, এবং সেই ভাষার শব্দের মাধ্যমে ছাড়া চিন্তাই করতে পারে না ; সেই সূত্রের বাইরে কিছুই তারা বোঝে না।

পুরোপুরি বুদ্ধিগত অন্ধতায় গড়া এই যে রূপের প্রতি আসক্তি তাই হল মানুষে মানুষে মতবিরোধের প্রবলতম কারণগুলির একটি।

তবে চিন্তাকে, নগ্ন সত্যকে দেখবার জন্য যে যথেষ্ট গভীরে প্রবেশ করে, সে শীঘ্রই প্রত্যক্ষ করে যে বিচিত্র ও কমবেশি অস্বচ্ছ যত আবরণের অন্তরালে তা একই।

এই হল সত্যাকার পরমতসহিষ্ণুতা অর্জন করবার নিশ্চিততম পন্থা।

বস্তুতঃ, কোন বিশেষ মতবাদ, সম্প্রদায় বা ধর্মকে নিয়ে একরোখা অন্ধ-উন্মাদনা আমাদের কি করে থাকতে পারে, যখন আমাদের এ অভিজ্ঞতা রয়েছে যে যত বিচিত্র ধরনের পেটিকাবন্দী হয়েই তারা থাকুক না কেন তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে আলোর ও সত্যের ঐশ্বর্য।*

---

* Bulletin of S.A.I.C.E. থেকে। অনুবাদক—শতদল

বেদ

শ্রীঅরবিন্দ

সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া আমরা হিন্দুরা যাহা কিছু করিয়াছি, ভাবিয়াছি ও বলিয়াছি এবং ঐ সকলের পশ্চাতে আমরা যাহা হইয়াছি এবং যাহা হইতে চাই সে সকলের মূলে নিহিত 'বেদ' নামক কিছু বাক্য-সংগ্রহ—তাহাই আমাদের সকল দর্শনের উৎস, আমাদের সকল ধর্ম্মের ভিত্তি, সকল চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু। তাহার মধ্যেই আছে আমাদের নীতি ও সমাজের ব্যাখ্যা, আমাদের সভ্যতার সারাংসার, আমাদের জীবনপ্রবাহ। এই একটিমাত্র বীজ হইতেই বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সুবিশাল হিন্দুধর্ম্ম নানারূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার অফুরন্ত জীবন সংগ্রহ করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম ও তাহার প্রশাখা খৃষ্টধর্ম্মও এই একই মূল উৎস হইতে উৎসারিত। ইহা পারস্যের উপর ইহার ছাপ রাখিয়া গিয়াছে, পারস্যের মধ্য দিয়া জুডাবাদ, জুডাবাদের মধ্য দিয়া খৃষ্টধর্ম্ম ও সুফীবাদের মধ্য দিয়া ইসলামধর্ম্মের উপর ইহার ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। বুদ্ধের মাধ্যমে কনফুসিয়াসবাদ এবং ক্রাইষ্ট ও মধ্যযুগীয় অতীন্দ্রিয় ধর্ম্ম, গ্রীক ও জার্ম্মান দর্শন ও সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে ইহা ইয়োরোপীয় চিন্তা ও সভ্যতার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যদি বেদের অস্তিত্ব না থাকিত তবে সমস্ত জগতের আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম্ম ও চিন্তা আজ যেখানে পৌঁছিয়াছে সেখানে পৌঁছিতে পারিত না। সমগ্র বিশ্বে আর কোনো বাক্য-সংগ্রহ সম্বন্ধে এরূপ উক্তি করা যায় না।*

---

* অনুবাদিকা—কমলা বসু

শ্রীঅরবিন্দের পত্র

প্রিয়তমা মৃণালিনী,

অনেকদিন তোমাকে চিঠি লিখি নাই কারণ আমার শরীর তেমন ভাল চলিতেছিল না আর লিখিবার মত শক্তিও যেন ছিল না। আমি দিন কয়েকের জন্য বরোদার বাহিরে গিয়াছিলাম—দেখিতেছিলাম যে বায়ুপরিবর্ত্তন ও বিশ্রাম আমাকে চাঙ্গা করিয়া তোলে কি না। তোমার টেলিগ্রাম যখন আসে তখন আমি এখানে উপস্থিত ছিলাম না। আমি এখন পূর্বাপেক্ষা অনেক ভাল আছি, মনে হয় অতিরিক্ত কাজের চাপ ভিন্ন আর বিশেষ কিছু হয় নাই। তোমাকে এতখানি ভাবাইয়া তুলিয়াছি বলিয়া আমি দুঃখিত কিন্তু এত ভাবনার সত্যই কোনো কারণ ছিল না। তুমি তো জান আমি কখনও গুরুতররূপে অসুস্থ হই না। শরীর ঠিক না থাকিলে কেবল চিঠি লেখাটাই প্রায় অসম্ভব হইয়া ওঠে।

মহারাজা আমাকে ৯০ টাকা বাড়াইয়া দিয়াছেন—তাহাতে আমার মাহিনা বাড়িয়া ৪৫০ টাকা হইল। তিনি তাঁহার নির্দেশনামায় আমার শক্তি, প্রতিভা, কর্মতা ও প্রয়োজন ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক প্রশংসা করিয়াছেন কিন্তু আমার নিয়মানুবর্ত্তিতা ও সময়ানুবর্ত্তিতার অভাব সম্বন্ধে মন্তব্য করিতেও ছাড়েন নাই। তাছাড়া আমার উপর আরও অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপাইয়া এই ৯০ টাকা তিনি পোষাইয়া লইবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব তাঁহার নিকট আমি এমন কিছু কৃতজ্ঞ বোধ করিতেছি না।

তিনি বলিয়াছেন সুবিধা হইলে আমাকে কলেজের কাজেও লাগানো যাইতে পারে। কিন্তু কিরূপে সে সুবিধা হইবে, অন্ততঃ এই মুহূর্তে, তাহা আমি বুঝিতেছি না কারণ এবারকার শিক্ষাবর্ষ তো প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আমাকে দিয়া বাৎসরিক বিবরণ ইত্যাদি লিখাইবার জন্য তিনি দেওয়ানকে বলিয়াছেন। অতএব আমি ছুটি পাই তাহা উনি চান না বোধ হইতেছে। যাহা হউক, দেখা যাক্ কি হয়।

এখন যদি আমি কলেজে যোগ দিই এবং তিনমাসের ছুটি পাই তাহা হইলে অল্পদিনের জন্য অবশ্যই বাংলায় ও আসামে যাইব। কিন্তু তোমার পক্ষে এখনি বরোদায় আসা সম্ভব হইবে বলিয়া তো আমার ভরসা হইতেছে না। আজ সকালের সামান্য ক্ষণ-বর্ষণ ছাড়া একমাস যাবৎ এখানে একবিন্দুও বৃষ্টি হয় নাই। সব কূপগুলি প্রায় শুষ্ক, বরোদাতে জলের যোগান দেয় যে Ajwa জলাধার, তার জলও অনেক নীচে নামিয়া গিয়াছে, আগামী নভেম্বরে নিশ্চয় তাহাও খরচ হইয়া যাইবে। শস্যক্ষেত্রের শস্যগুলি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। অর্থাৎ আমাদের এখানে শুধু দুর্ভিক্ষই হইবে না, স্নান বা ধোওয়া ইত্যাদির জন্যও জল থাকিবে না, এমন কি পানীয় জলটুকুও বোধহয় নয়। আর যদি দুর্ভিক্ষ হয় তবে উচ্চপদস্থ সকল কর্মচারীকেই অর্দ্ধেক মাহিনা দেওয়া হইবে। আগস্টমাস শেষ হইবার আগেই ভালরকম বৃষ্টি হইতে পারে এই আশায় আছি, বরং বলিতে পারো প্রতীক্ষায় আছি কিন্তু তেমন কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। যদি বৃষ্টি নামে তবে জলের সমস্যা হয়তো মিটিবে অথবা কিছুদিনের জন্য স্থগিত থাকিবে। বরোদায় আসিয়া তোমার এইসব অসুবিধা ও কষ্ট সহ্য করিবার প্রশ্নই ওঠেনা। তবে তোমার বাবার কাছে থাকিবে না দেওঘরে থাকিবে সে সিদ্ধান্ত তোমার নিজেকেই লইতে হইবে।

তুমি অক্টোবর পর্য্যন্ত আসামেও থাকিতে পার, পরে যদি আমি বাংলাদেশে যাই তখন তোমাকে দেওঘরে লইয়া যাইব, সেখানে অন্ততঃ শীতকালটা কাটাইয়া আসিতে পার। যদি আমি না যাইতে পারি আর যদি তোমার ইচ্ছা থাকে তবে তোমাকে সেখানে পৌঁছাইয়া দিবার একটা ব্যবস্থা করিব।

তোমার বাবা তোমার সঙ্গে একজন রান্নার লোক আমার এখানে পাঠাইতে পারিবেন জানিয়া খুসী হইলাম। আমার একটি মারাঠি পাচক আছে তবে সে মাংস ছাড়া অন্য কিছুই তেমন ঠিকমত তৈয়ারী করিতে পারে না ঝিএর সমস্যার যে কি সমাধান করিব জানিনা। সরোজিনী মুসলমান আয়ার কথা লিখিয়াছিল কিন্তু তাহা কোনোমতেই চলিবে না। সবে-মাত্র হিন্দুসমাজে পুনঃপ্রবেশের অধিকার পাইয়াই আমি এরূপ ঝুঁকি লইতে পারিব না। (Khaserao) খাসেরাও বা অন্যান্যদের পক্ষে সে সব চলিতে পারে কারণ তাহাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা এতই দৃঢ়মূল যে তাহারা তাহাদের খুসীমত যে কোনো কাজ করিতে পারে। যে মুহূর্ত্তে তোমাকে এখানে লইয়া আসার সম্ভাবনা দেখিব তখনি আমি একটি ঝিএর ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করিব। এখন তাহা করিয়া কোনো লাভ নাই।

আশা করি তুমি এ চিঠি পড়িতে ও বুঝিতে পারিবে। যদি না পার তবে তুমি এখন যতটা ইংরাজী জান তদপেক্ষা অধিক জানিতে আগ্রহী হইবে। ঠিক এই মুহূর্ত্তে আমি কিছুতেই বাংলায় চিঠি লিখিয়া উঠিতে পারিলাম না, তাই ভাবিলাম একেবারে না লেখা অপেক্ষা বরং ইংরাজীতে লেখা ভাল।

বয়োদায় আসিতে দেরীর জন্য খুব বেশী হতাশ হইও না ইহা এড়ানো গেল না। যদি তুমি কিছু মনে না কর তবে আমার ইচ্ছা তুমি দেওঘরে কিছুদিন থাক। আসাম বড় বেশী দূরে মনে হয়।

তাছাড়া আমি চাই আমার আত্মীয়স্বজনদের সহিত, অন্ততঃ যাহাদের আমি বিশেষরূপে ভালবাসি তাহাদের সহিত তোমার একটি নিবিড় অন্তরঙ্গতা গড়িয়া উঠুক।*

তোমার প্রিয় স্বামী।

---

* অনুবাদিকা—কমলা বসু

পাখি ডাকে

রবি গুপ্ত

নিশীথ রাতের পাখি ডাকে পাখি ডাকে—
ঘন-তমিস্র-বিজড়িত জাল—ধরণী অঘোর ঘুমে :
অসীম ঊর্দ্ধে অতন্দ্র তারা সীমাহীন অনুরাগে
রাঙায় স্বপন পরশি' পৃথ্বী-কপোল কিরণ-চুমে।

অপলক আঁখি জাগ্রত দু'টি তারা
যুগান্তকাল যেন বসি' জপে সূর্যমন্ত্র-শিখা ;
সুপ্তির নীড়ে ঝাপটায় ডানা সহসা জাগায় সাড়া
যুগলপক্ষ জ্যোতিবিহগ—লভে রূপ প্রভাতিকা।

সে কোন পুলকে সহসা ডাকিয়া ওঠে
দুর্নিকোর পথিক-পরাণ দীর্ঘ সরণী শেষে ;
খসে বন্ধন ভাঙে শৃঙ্খল বেদনার পাশ টোটে,
বিগত ঘুণি বিলুপ্ত ঢেউ জোনাকীরা যায় ভেসে।

বিদূরি' তন্দ্রা মেলে বিহঙ্গ ডানা
উদয়-প্রতীর তিমিরান্তক বিভাসে দিগন্তিকা
বিবোধি' বিজয় বারতা উষার দিকে দিকে দেয় হানা
প্রাণের গভীরে সহসা দীপ্ত অনাদি জ্যোতিলিখা।

যুগ হতে যুগে সাধিয়াছে অভিসার
প্রাণ হতে প্রাণে চলি নিরবচ্ছিন্ন ছন্দ ধরি'
দিন-রজনীর যুগল পাখায় যুগান্ত করি পার—
আজি এ নিশীথে চলে নিরন্ত অন্তরে উতরি'।

পায় পৃথিবী দাঁড়ায় জ্যোতির্লোকে
আসে আহ্বান—নীড় ছাড়ি' নব দিগন্তে আঁখি রাখে,
উদার আলোর বিপুল প্লাবন চির বিস্ময় চোখে
হরষে অসীম নিশীথ রাতের পাখি ডাকে পাখি ডাকে।

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

৭ জুলাই, ১৯৫০

(বৃষ্টি আসন্ন দেখে ক্লাশ বসেছে জিম্নাসিয়ামে, মা বলে দিয়েছিলেন, শ্রীঅরবিন্দের নতুন বই "The Mother" তিনি নিজেই পড়ে বলবেন, কিন্তু প্রত্যেকে ক্লাশে আসবার আগে যেন ওর কোনো ঐ একটি পরিচ্ছেদ পড়ে তার থেকে কোনো একটি প্রশ্ন নিয়ে তৈরি হয়ে আসে।)

প্রশ্ন : মধুময়ী মা, এই পরিচ্ছেদে লেখা রয়েছে "তমসা ও অসত্যের বিরুদ্ধে যে আভ্যন্তরীণ যোদ্ধা লড়াই করে তার প্রতি আনুগত্য চাই।" এই আভ্যন্তরীণ যোদ্ধাটি কে?

উত্তর : ও সেই প্রাণসত্তা যে নেমেছে এই পথে। অর্থাৎ যে প্রাণসত্তা সম্পূর্ণরূপেই ভগবানের দিকে ফিরেছে, সে তখন হয়ে দাঁড়ায় এক যোদ্ধার মতো। আর যোদ্ধার মতোই চেহারাও তার হবে। কারণ প্রাণসত্তাই শক্তির কেন্দ্র। তার শক্তিই তখন তাকে যুদ্ধে জয় করতে প্রেরণা দেবে, যা সবচেয়ে কঠিন কাজ, কারণ সর্বাংশে তখন বিদ্রোহ দেখা দেবে, তারা চাইবে স্বাধীন থাকতে, সকল চেষ্টাকে দাবিয়ে রেখে নিজের ইচ্ছাকেই কায়েমী রাখতে। কিন্তু প্রাণশক্তির ভাবান্তর ঘটাতে সে তখন হয়েছে ভগবানে সমর্পিত ও ভগবৎ ইচ্ছারই অনুগত, কাজেই আপন সংগ্রামশক্তি নিয়ে তাকে লড়াই করতে হবে ঐ সব স্বেচ্ছাচারী যত কিছু অদিব্য ও তামসিক বিরোধী শক্তিদের সঙ্গে। আর সেই সংগ্রামে সর্বশক্তি নিয়োগ ক'রে শেষ পর্যন্ত সে জয়ী হবে। ঐ সব অদিব্য শক্তিদের অবস্থান প্রাণময় রাজ্যে। সেখান থেকে এসে যদিও তারা স্থূলদেহ ও দেহবস্তুর স্তরে ছড়িয়ে পড়ে, তথাপি প্রাণশক্তি পারে তাদের দমন করতে। তবে তার মধ্যে সেরূপ ভাবান্তর ও সক্রিয়তা আনা কঠিন।

প্রশ্ন : এখানে "subterfuges" কাকে বলা হয়েছে?

উত্তর : কাকে? ও কথার মানে হলো ফাঁকি দেবার ফন্দি। ফন্দি কাকে বলে জানো তো? তুমি সত্যি যা করতে যাবে সে কথা না জানতে দিয়ে অন্য একটা অজুহাত এনে অন্য কিছু বুঝিয়ে দেবার কৌশল। প্রকৃত সত্যকে লুকিয়ে রেখে।

প্রশ্ন : আর এই Irrevocable রূপান্তরের অর্থ?

উত্তর : ওর মানে এমন সুপ্রতিষ্ঠ ও স্থায়ী রকমের রূপান্তর যার থেকে ফিরে আর পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করা যায়না।

প্রশ্ন : মধুময়ী মা, এখানে লেখা রয়েছে—"কেবল চৈত্যসত্তার সাড়া জাগা আর উচ্চমানসের অনুমোদন হওয়া ও এমন কি প্রাণসত্তা ও আভ্যন্তর দেহচেতনা পর্যন্ত প্রভাবপ্রাপ্ত হলেও তাতেই যথেষ্ট নয়।" তাহলে ওর চেয়ে আরো কিছু উচ্চ আছে?

উত্তর : হ্যাঁ, সেই উচ্চতর যে প্রাণসত্তা তাকে সমর্পিত করা খুব কঠিন নয়, কারণ

সে মনেরও এবং চৈত্যেরও বাধ্য থাকে। সুতরাং সে তখন অতি সহজেই ব্যাপারটা বুঝে নেয় ও মেনে নেয়। সেই অংশের ভাবধারা বদলানো তাই অপেক্ষাকৃত সহজ কিন্তু যে নিম্ন প্রাণসত্তা রয়েছে এবং যা বাসনা কামনা ও প্রবৃত্তির কেন্দ্রস্থল তার মধ্যে পরিবর্তন আনা সহজসাধ্য নয়। তাই এখানে উনি বলেছেন যে ঐ নিম্ন প্রাণসত্তা আপাতবাধ্য হয়ে ওদের আদেশ ও নির্দেশ মেনে কাজ করতে থাকলেও তাতেই যথেষ্ট হলোনা, কারণ সে নিজের খুশিতে তা করছে না, নেহাৎ বাধ্য হয়ে কষ্ট সহকারে করছে। বিদ্রোহ ইচ্ছাকে যদিও সে দমন করে রাখে, কিন্তু অকুণ্ঠভাবে সম্যক সহযোগিতা সে করতে পারেনা। অথচ সপ্রেম আনন্দের সঙ্গে অকৃত্রিম ও স্বেচ্ছাকৃত তার সহযোগিতা ব্যতীত রূপান্তরের কাজ হতে পারে না।

প্রশ্ন না, এখানে যে লেখা রয়েছে...
উত্তর দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমার পালা এর পরে।

প্রশ্ন তা নয়, এখানে একটা ভুল রয়েছে তাই বলছি.—ফরাসী লেখাতে রয়েছে নিম্নপ্রাণসত্তা (inférieur), কিন্তু ইংরেজী লেখাতে রয়েছে আভ্যন্তরীণ (inner)।

উত্তর আভ্যন্তরীণ। সেই প্রাণসত্তা। ঐ ভুলই রেখে দেওয়া হয়েছে। বইটা তো আশ্রমেই ছাপা (উল্টে পাল্টে দেখলেন আশ্রম প্রেসের নাম)। হাঁ, তাই হবে, নতুবা ওটা শুধরে দেওয়া হতো। (পবিত্র জিজ্ঞাসা করলে, সকল এডিশনেই কি তাই আছে?) হাঁ, ও বই যা ছাপা হয়েছে ফ্রান্সে, ওটা প্রথম সংস্করণ। I এবং i, এই দুটি অক্ষর এতই কাছাকাছি যে ঐ রকম ভুল হতেই পারে।

(পূর্বের প্রশ্নকারীকে) তুমি বুঝি প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছ? (হাসি)। (অন্যকে) তোমার কিছু প্রশ্ন নেই? না! তবে পরের সপ্তাহে হবে, তোমাকে তৈরি হতে বলা হয়নি। (অপর একজনকে) তুমি?

প্রশ্ন এইখানটা আমি বুঝতে পারছি না "অসত্যের দাবিকেই যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে তাতে ওর আপন লক্ষ্যের থেকে বিচ্যুতি ঘটবে"। এই "আপন লক্ষ্যের বিচ্যুতি" মানে কি?

উত্তর : হাঁ, ওর মানে এই যে কৃপার নিজের যা কাজ তার থেকে বিচ্যুতি ঘটবে। অর্থাৎ তার বিপরীত কাজের দিকে যাওয়া হবে। কৃপা এসেছে তার আপন সত্যকে সার্থক করতে। কিন্তু সে যদি অসত্যের দাবিকে অনুসরণ করে তাহলে তার আসল কাজটি হয় না। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে এসে যদি সে অসত্যকে স্থান দেয় তাহলে তার সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া হবে। এর অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারি যারা বলে যে কেবল আমাদের বেলাতে এগুলি বজায় রাখা হোক, এই বলে তারা যা কিছু বজায় রাখবার জন্য প্রার্থনা বা দাবিও করে সেগুলি সত্যের ঘোর বিরোধী। কৃপা যদি তাতে প্রশ্রয় দেয় তাহলে তার নিজের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে, সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বিপরীত কাজ করবে। সে এসেছে সত্যকে ফুটিয়ে তুলতে, কিন্তু অসত্যকে থাকতে দিলে তার কাজ উল্টা হয়ে যাবে। কিন্তু লোকেরা সাধারণত তাদের অন্ধতা ও অজ্ঞানতা বশত বোকামি ক'রে ঘোড়ার সামনে গাড়ি রাখে,

তারা চায় তাদের পূর্বাভ্যাস শর্তকে বজায় রেখে কাজ হোক, তা যেন তাদের সমর্পণেরই মূল্যস্বরূপ।... হাঁ, অনেকে অচেতন বলেই এমন ক'রে থাকে, তাই আমি বলি তাদের অজ্ঞান ও বোকামি। আবার কেউ কেউ সজ্ঞানেও এমন করে, ভগবানকে বলে, "তুমি আমার এইটি ও ওইটি শর্ত বজায় রাখো, তাহলে আমি তোমার দাস হয়ে থাকব।" এই বলে তারা নিজেদের অভ্যস্ত পথেই চলতে থাকে। আর বলে, "হাঁ, ভগবান তো এমনিই, প্রার্থনা করলেই আমার শর্তকে মেনে নেবেন।" কিন্তু তা যখন হয় না তখন চটে গিয়ে বলে, "তাহলে তুমি ভগবানই নও।" (হাস্য)। সোজা বলে দেয়, আমার চাওয়া না মানলে তুমি ভগবানই হলে না। নিত্যই তারা এই রকম করে। কিন্তু ভগবৎ কৃপা তাদের মতে যদি চলে তাহলে তার যা মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য তা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

(অন্যের প্রতি) বলো তো, তোমার কি প্রশ্ন আছে?

সেই শ্রোতা এখনও আমার পালা আসেনি। (হাস্য)

উত্তর ও, তাহলে তো সুবিধাই হলো। (হাস্য) তবে কার এখন পালা? তোমার বুঝি? বলো তোমার কি প্রশ্ন।

শ্রোতা: এখানে লেখা রয়েছে, "কেবলমাত্র সর্বোচ্চ সেই অতিমানস শক্তি উপর থেকে এসে এবং নিচের থেকে খুলে দিলে তবেই তা দেহপ্রকৃতিকে জয় ক'রে কষ্ট দূর করতে পারে।" এই শেষের কথাটা বুঝতে পারছি না।

উত্তর এর ঠিক কোন কথাটা বুঝতে পারোনি?

প্রশ্ন এই যে "নিচের থেকে খুলে দিয়ে প্রকৃতিকে জয়"

উত্তর অর্থাৎ দেহপ্রকৃতিকে বশে আনা। কেমন ক'রে তা হয় জানো না। (এই সময় পবিত্র সম্পূর্ণ ছত্রটি ভালো ক'রে পড়লেন) অতিমানস শক্তি তখন নিচে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তাকে ঠেলে উপরের দিকে উঠিয়ে দেয়। তাতে সকল বাধাবিঘ্নের ভেতর দিয়ে একটা পথ খুলে যায়, যেমন করে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে আগাছাগুলো কেটে পথ করা হয়। তেমনি ভাবেই এই আমাদের জড়দেহের নিম্নস্তরে বিস্তর বাধাবিঘ্নের জঞ্জাল জড়ো হয়ে আছে, ঐ শক্তি আপন তেজে সেখানে নেমে গিয়ে ফাঁকা পথ ক'রে দেয়, তার পরে কি হবে বুঝতেই পারছ!

প্রশ্ন না, কিন্তু ঐ যে রয়েছে দেহপ্রকৃতিকে handble করা...

উত্তর handle করা মানে তাকে স্ববশে আনা। অর্থাৎ স্থূল জগতের সকল বাধাকে দমিত করা। ঐ সর্বোচ্চ শক্তিই শুধু পারে সেই সব বাধাকে কাটিয়ে দিতে। তার দ্বারাই কেবল বস্তুরাজ্যের সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূর হবে। এবার বুঝলে?

প্রশ্ন : হাঁ।

উত্তর : (অন্যের প্রতি) তোমার কি প্রশ্ন? আর তোমার কি আছে?

প্রশ্ন : এই যে এখানে রয়েছে—"মন থেকে এই ভুল ধারণা দূর ক'রে দাও যে ঐ শক্তি তোমার ইচ্ছামত সব কিছু ক'রে দিতে বাধ্য, তুমি তার শর্তগুলি না মানলেও"—এ কথা কেন বলেছেন?

উত্তর : তুমি তো জানোনা, এমন সব মানুষ আছে, তাদের যদি বলা হয় "সমর্পণ করো", তারা অমনি একটু হেসে বলবে "ঐ সমর্পণটাও তুমিই করিয়ে দাও না।" সেই জন্যেই ঐ রকম বলা দরকার হয়েছে। এ তো সোজা কথা।

প্রশ্ন : কেউ যদি আরো বেশি মাত্রায় অগ্রসর হতে চায়...
উত্তর : বেশ।

প্রশ্ন : আর তখন যদি দেখে যে তার ভিতরে এমন অংশ রয়েছে যা তা চাইছে না—
উত্তর : অর্থাৎ আরো বেশি এগিয়ে যেতে?

প্রশ্ন : হাঁ, আর তখন যদি সে ভগবানকে ডেকে—
উত্তর : তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে?

প্রশ্ন : হাঁ, সেই কথাই বলতে চাইছিলাম।

উত্তর : সেটা স্বতন্ত্র কথা। সাহায্য দেবার জন্যই তিনি তো প্রস্তুত আছেন। কিন্তু এখানে যা বলা হয়েছে তার উদ্দেশ্য এই যে কেউ যদি কিছু চেষ্টা না করে, কোনোরকম প্রয়াস না ক'রে নিশ্চেষ্টভাবে কেবল অনড় হয়ে বসে থাকে, এমন কি কোনো আশ্পৃহা বা ইচ্ছা পর্যন্ত প্রয়োগ না ক'রে বলে যে, "আমার মধ্যে যা কিছু করা দরকার তা ভগবানই সব ক'রে দেবে, ভগবৎ কৃপাই সব কিছু ঘটাবে, এমন কি আশ্পৃহা পর্যন্ত আর দরকার হলে সমর্পণ পর্যন্ত এনে দেবে, সব তারই দ্বারা হবে, আমার নিজের চেষ্টায় কিছুই করতে হবে না, আমি চুপচাপ চিন্তাশূন্য ও ইচ্ছাশূন্য হয়ে থাকলেই কাজ হবে,"—এমনতরো ধারণাও অনেকের থাকে। তাদের যদি বলা হয় "আশ্পৃহা করো", তারা বলে "এনে দাও আমার মধ্যে সেই আশ্পৃহা।" যদি বলা হয় "মনকে উদার উন্মুক্ত করো", তারা বলে "এনে দাও সেই উদারতা। যখন তা আসবে তখন সবই করবো।" (হাস্য)

(অন্য শ্রোতাকে) আচ্ছা, এবার তুমি বলো।

প্রশ্ন : মধুময়ী মা, আমি সেই আগের প্রশ্নই করতে চাই—এই ফরাসী বইতে রয়েছে নিচের থেকে রাস্তা খুলে দেবার কথা, কিন্তু ইংরেজী বইতে রাস্তা খোলার কোনো কথা নেই।
উত্তর : সে ইংরেজীটা কোথায়?

প্রশ্ন : এই আমার কাছে আছে।
উত্তর : আচ্ছা, পড়ে শোনাও ওতে কি আছে।

প্রশ্ন : ..."কেবল সর্বোচ্চ অতিমানস শক্তিই পারে উপর থেকে নিচে এসে দেহ-প্রকৃতিকে সুনিয়ন্ত্রিত ও শোধিত ক'রে সার্থকভাবে সব বাধাবিঘ্নকে দূর ক'রে জয়যুক্ত হতে।"
উত্তর : রাস্তা খুলে দেবার কথা? (দীর্ঘক্ষণ নীরব থেকে) ওর অর্থ এই হতে

পারে যে স্থূলদেহের মধ্যে লুকানো রয়েছে যে অনভিব্যক্ত দিব্য শক্তি তাকে বেরিয়ে আসার মতো পথ খুলে দেওয়া.—সে শক্তি সকলের মধ্যেই আছে, অতিমানস শক্তি নেমে এলে সেটি তখন প্রকাশ হবার সুযোগ পায়। উপরের আদি চেতনা নেমে এসে নিম্নপ্রান্তের সুপ্ত চেতনার সঙ্গে মিললে দুই প্রান্ত এক হয়ে যায়। তখন বৃত্তের মতো ঘুরে এসে দুই প্রান্তের যোগ হয়।

পবিত্র : হাঁ মা, ফরাসী অনুবাদে তাই আছে।

উত্তর হবেই তো। ঠিক ঐরকম ক'রে না বলা হলেও আসল জিনিসটা একই, উপরের মূল চেতনা জড়ের ভিতরকার গুপ্ত চেতনার সঙ্গে মিলে এক হয়ে যাওয়া।

প্রশ্ন মধুময়ী মা, এই Inert (নিঃসাড়) "নিষ্ক্রিয়তা" মানে কি?

উত্তর Inert? নিষ্ক্রিয়তার অর্থ সেদিন বলেছিলাম—যা কোনো কিছুই করে না, নড়াচড়া পর্যন্ত বন্ধ, সবরকম স্পন্দনশূন্য। আর Inert নিষ্ক্রিয়তা মানে আরো একেবারে নিঃসাড়, নিস্পন্দ, নিবাতনিষ্কম্প। আগের দিন যে নিষ্ক্রিয়তা বলেছি তাতে কিছু সাড় থাকে, যা খুলে দিয়ে গ্রহিষ্ণু হতে পারে, কিন্তু নিজের থেকে কিছু করতে যায়না ...তাকে সক্রিয়তার উল্টো অবস্থা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে, যাতে তার মধ্যে এসে উপরের কিছু ক্রিয়া ঘটতে পারে।

কিন্তু নিঃসাড় নিষ্ক্রিয়তা তেমন নয়। সে কিছু গ্রহণ করতে না পারাতে পাথরের মতো অবস্থা, যে কারণে পাথরকে এবং মাটি ও বালিকে আমরা জড় বলি। সে কথা পুরো-পুরি সত্য নয়, কারণ এমন কিছুই হতে পারে না যার মধ্যে সামান্যতম গ্রহণযোগ্যতাও থাকবে না। তবে অচেতনের ধাপে যত নামবে তত দেখবে ক্রমশ জড় ও নিঃসাড়। এই হচ্ছে কথা। তাহলে যার মধ্যে ঐরূপ নিঃসাড় নিষ্ক্রিয়তার অবস্থা সে কোনো কিছুতে সাড়া দিতে গ্রহণ করতে বা স্পন্দিত হতে পারবে না। সে সম্পূর্ণই নিঃসাড় হয়ে থাকবে।

প্রশ্ন মধুময়ী মা, আপনা হতে আপন আনন্দে কি করে সমর্পণ সম্ভব হবে?

উত্তর তার জন্যে চাই ঐকান্তিকতা। সমর্পণ অন্তর থেকে করলে তাতে আনন্দই হবে। তেমন যতক্ষণ না হচ্ছে—আর যদি অপরপক্ষে দেখ যে ওতে কিছু আনন্দ আসছে না, তখন বুঝবে যে তা আন্তরিক হয়নি, কারণ আন্তরিক হলে আনন্দ হতোই। তা যে হয়নি, কারণ তোমার ভিতরকার কিছু একটা অংশ প্রতিরোধ ক'রে বসে আছে, তার নিজের ইচ্ছা হচ্ছে অন্যরকম, তার নিজের সেই উদ্দেশ্যে থেকেই তার জোরও আছে অন্যরকম, সে সমর্পণ চায়না, তাই সমর্পণ পুরোপুরি হতে পারছে না। কিন্তু যদি ঐকান্তিক হতে চেষ্টা করো তবে আপনা হতেই আনন্দ পাবে। তেমন রকম আনন্দ যতক্ষণ না অনুভব করবে ততক্ষণ জানবে যে তুমি আন্তরিক হতে পারোনি, ভিতরকার কোনো বড়ো বা ছোটো একটা অংশ তার বিরোধী হয়ে রয়েছে।

প্রশ্ন মা, সে অংশটিকে ধরে ফেলবার কি উপায়?

উত্তর উপায় আস্পৃহা করা, ঐ নিয়ে লেগে থাকা, সেখানে আলো ফেলতে চেষ্টা

করা, সর্বদা প্রার্থনা করা। কখনো হয়তো অস্ত্রপ্রয়োগ করতে হয়, গনগনে আগুনে লাল হওয়া লোহা দিয়ে ছ্যাঁকা দিতে হয়, যেমন ফোড়া কাটছে না দেখে যা করতে হয়।

(অন্য শ্রোতার প্রতি) তুমি কি যেন বলতে চাইছিলে ?

প্রশ্ন : না, আমার বলবার পালা এখন নয়।

উত্তর : ও, তোমার পালা আসেনি বুঝি ? (হাস্য)

অন্য শ্রোতা মা, এখানে লেখা রয়েছে, "ভগবান চাইছেন মায়ের কাছে তোমার সমর্পণ, কিন্তু তিনি কাউকে বাধ্য করেন না। তুমি প্রতি মুহূর্তেই স্বাধীন, যথেচ্ছা ভগবানকে না মানতেও পারো, প্রত্যাখ্যান করতে বা আত্মনিবেদন ফিরিয়ে নিতেও পারো, যতকাল পর্যন্ত অপরিবর্তনীয় রূপান্তরের অবস্থা না আসে"

উত্তর হাঁ, ঠিক তাই, প্রতি মুহূর্তে সেই রকমই হয়।

প্রশ্ন : (আবার পড়ে) ভগবানকে প্রত্যাখ্যান, অস্বীকার।...

উত্তর অস্বীকার ? তাই তো বলা হচ্ছে। লোকে যখন দেখে যে তারা যা চায় ভগবান তা চান না, তাদের ইচ্ছার পূরণ হচ্ছে না তখন ভগবানকে তারা অস্বীকার করে। তারা বলে, ভগবানই সে নয়, কিংবা ভগবান বলে কিছু নেই নিতান্ত বাজে কথা।

প্রশ্ন : মা, এই Inert automation, মানে কি ?

উত্তর স্বয়ংক্রিয়তা, যা নিষ্ক্রিয়তার একটু উপরে। শুধু যান্ত্রিক ভাবের ক্রিয়া। Inert মানে নিশ্চেতন। আপনা হতে চলে, তার মধ্যে আত্মা নেই, প্রবেগ ও প্রেরণা নেই, ইচ্ছাও নেই, এমনিই কাজটা হচ্ছে। চেতনা বা গ্রহিষ্ণুতাও তাতে নেই...বোধ করি ঘড়িকেও তা বলা যায়না। কারণ ঘড়ির কাজও আত্মার মতো, ভালো ঘড়ি হলে নিখুঁত কাজ করে, তারও একটা গ্রহিষ্ণুতা থাকে। কিন্তু অটোমেটন শুধুই যন্ত্র, দম পেলে অসাড়ে চলবে (হাতের ভঙ্গি সহকারে) অর্থাৎ কী বা কেন তা না জেনে।

প্রশ্ন মা, helpful submission বলতে কি বোঝায় ?

উত্তর : অর্থাৎ সহায়ক আনুগত্য...কিন্তু অসহায়ক জিনিস ? (হাস্য) তা তো হতেই পারে না। আনুগত্য সর্বদাই সহায় কারক হবে। সবাই তা জানে, নয় কি ? কোথায় লেখা আছে ? (বইটা খুঁজলেন) আনুগত্য তো সহায়কারী হবেই (হাস্য)।

স্বেচ্ছায় সানন্দ যে আনুগত্য, যার কথা আমি বলেছি, যা সুদৃঢ় ও প্রাণবন্ত, নিস্তেজ ও নিরুত্তাপ নয়, তেমন সাহায্য দিয়ে ফলদায়ক হয়, সক্রিয়ভাবে অগ্রসর করায়। যা জড়বৎ ঘটে যাওয়া কাজের ঠিক উল্টো।

প্রশ্ন : মধুময়ী মা, ভগবানের দিকে self-opening, মানে কি ?

উত্তর আত্মোন্মীলন, ওর বদলে বলা যেতে পারে আত্মগ্রহিষ্ণুতা, অর্থাৎ নিজেকে

খুলে রাখা, গ্রহণযোগ্য হয়ে। এখানে বলা হয়েছে সকল দিক দিয়ে নিজেকে খুলে রাখা ও অন্য কিছু গ্রহণ করার বদলে কেবল ভগবানেরই শক্তিকে গ্রহণ করবার জন্য খুলে রাখা, অর্থাৎ লোকে সাধারণত যা ক'রে থাকে তার বিপরীত জিনিস। লোকে সর্বদা বাইরের পাঁচদিকেই খুলে রাখে নিজেদেরকে, যাতে সব কিছুরই প্রভাব তার মধ্যে আসতে পারে। তার ফলে এই হয় যে নানা বিপরীত জিনিসের প্রভাব তার মধ্যে এসে ঠোকাঠুকি করে, একটা জগাখিচুড়ি কাণ্ড হয় (মা হাসলেন)। আর তাতেই নানা বিপত্তি ঘটে।

এখানে তাই বলা হচ্ছে যে ওর বদলে কেবল ভগবানের দিকে নিজেকে খুলে রাখো কেবল ভগবৎ শক্তিকেই গ্রহণ করবার জন্য, তাতে সকল বিপত্তিরই নিষ্পত্তি হবে। শুধু এই একটা মুশকিল থাকে যে অন্যান্য ব্যক্তিদের সংস্রবে থেকে তাদের তরফ থেকে ভাবের আদানপ্রদানকে এড়ানো যায়না, যদি। নিজেকে ঘিরে আবহাওয়া এমন ক'রে নিতে পারো যাতে তুমি ফিল্টারের মতো সেই সকলকে ছেঁকে ফেলবে এবং তার কিছুই ভিতরে ঢুকবে না! এর জন্যে অবশ্য ব্যাপক রকমের অভিজ্ঞতা চাই। এইজন্যই আগেকার দিনে ব্যবস্থা ছিল সংসার সংস্রব একেবারে পরিত্যাগ করে এবং কারো সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলা ছেড়ে কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্যন্ত এড়িয়ে নির্জন অরণ্যে গাছতলায় গিয়ে বসে থাকা। এতে সহজেই বিপত্তিটা কাটলো বটে, কিন্তু পরে দেখা যেতো যে মানুষকে বাদি দিয়ে শেষে যত নিম্নতর জীবজন্তু ও গাছপালার দিকে মন আকৃষ্ট হয়ে পড়তো। এমনতরো কিছু একটা আদান-প্রদান নিবারণ করা প্রায় অসাধ্য। অতএব দরকার এই যে সকল কিছুর ভিতরে সকল সময়ের মধ্যে থেকেই ভগবানের দিকে একান্ত ও স্থির সুতীব্র ভাবে নিজেকে একাগ্র ক'রে রাখা। এমন হওয়া চাই যে তোমার আবহাওয়াতে কোনো কিছু এলে তা ফিল্টারে ছেঁকে আটক থেকে যায়, ভিতরে ঢুকতে না পারে।

কিন্তু তা করতে পারলেও অন্য একটি সমস্যা থেকে যায়। সেটা খাদ্যের সম্বন্ধে। বাঁচতে হলে বাইরের জিনিস তো খেতেই হবে, কিন্তু ই সঙ্গে ঢুকে পড়বে বিভিন্ন চেতনা ও অচেতনার প্রভাবগুলি। আমরা তাই বলেছি খাদ্যের সঙ্গে তার চেতনার স্পন্দনের কথা, কিন্তু অচেতনাও তো বাদ যায়না, তাও ভিতরে ঢোকে। সেই জন্য অনেক যোগ পদ্ধতিতে নির্দেশ আছে কিছু খাবার পূর্বে তা ভগবানকে নিবেদন করে দিতে (মা অঞ্জলি করে নিবেদনের ভঙ্গি করলেন), অর্থাৎ ভগবানের কিছু স্পর্শ ও প্রভাব যেন তার মধ্যে আসে। সঠিকভাবে এটি করতে পারলে তার ফল খুবই ভালো হয়। ভিতরকার রূপান্তরের পক্ষে তাতে সাহায্য মেলে। কারণ ভেবে দেখ, এই জগতের বর্তমান অবস্থাতেও সব কিছুই পরস্পর নির্ভর, আবহাওয়াতে নানা জিনিস ও নানা মানুষের দিক থেকে যে সব স্পন্দন এসে পড়ে তাও তো গ্রহণ করতে হবে, সুতরাং নিত্যই তোমাকে ফিল্টারের মতো হয়ে থাকতে হবে যাতে ওসব ভিতরে না ঢোকে। সংক্রামক রোগের আবহাওয়ার মধ্যে গেলে যেমন নাকের উপর একটা আচ্ছাদন দিয়ে রাখতে হয় যাতে বাইরের বাতাস ছাঁকা হয়ে তবে নাকে যেতে পারে, তেমনি ভাবে এ স্থলেও করা চাই—নিজেকে ঘিরে এমন নিগূঢ় আত্মসমর্পণের আবরণ বা রক্ষাকবচ তৈরি হয় যাতে অবাঞ্ছিত সব কিছু ছাঁকা হয়ে বাইরেই থেকে যায়। এটি নিতান্তই প্রয়োজন, যে সকল কুটিল কুচিন্তা, অনঙ্গল ইচ্ছা, বিরুদ্ধ প্রেরণা নিত্য আসছে সেগুলিকে প্রত্যাখ্যান করবার জন্য। নতুবা এমনি নিজে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে আসবে কেবল অবসাদ

ও বৃথা কালক্ষয়। কেবল যদি সানন্দ সমর্পণের দ্বারা একটা জ্যোতির বর্ম রচনা ক'রে তার মধ্যে নিজেকে আড়াল ক'রে রাখতে পারো সেই আত্মনিবেদনের তেজে, তাহলে তাতেই তোমার পক্ষে দিব্য ফিলটারের কাজ করবে। আসে যদি কিছু অমঙ্গল ইচ্ছা তাহলে তা প্রতিহত হয়ে ফিরে যাবে যেখান থেকে এসেছিল। ওর দরজা কেবল দিব্য বস্তু ছাড়া অন্য কিছু প্রবেশ করতে দেবে না।

যদিও এ সব জিনিস অধ্যয়নের দ্বারা ও বিজ্ঞানের প্রণালীতে শেখা যায়, কিন্তু খাঁটি আস্পৃহা ও আত্মসমর্পণ থাকলে তার দরকার হবে না। আস্পৃহা ও আত্মসমর্পণ এগুলি যদি হয় সর্বসম্পূর্ণ—অকৃত্রিম ও একাগ্র, তাহলে বাকি সব কিছু আপনা হতেই হয়ে যাবে। কেবল তা সব দিক দিয়ে পুরোপুরি ভাবে হওয়া চাই। তা না হলে তুমি নিজেই সেটা বুঝতে পারবে,—তোমার মনে কিছুতেই তখন তৃপ্তি হবে না। একটা অস্বস্তি অশান্তি, অস্থিরতা দেখা দেবে। বলবে, "তাই তো, কাল তো বেশ বোধ করছিলাম, আজ কেন তা হচ্ছেনা?" কেন হচ্ছেনা? তার কারণ কাল যেমন সম্পূর্ণ সমর্পণের ভাবটি ছিল, আজ সেরকম হচ্ছেনা। এ হলো থার্মোমিটারের মতো। ওরই দ্বারা বুঝতে পারবে যে কোনখানে তোমার ঐকান্তিকতায় ত্রুটি হয়েছে। এ কথা শিখিয়ে দিতে হয় না, শ্রীঅরবিন্দ যেমন বলেছেন তাঁর "Elements of Yoga" বইখানিতে, তৃপ্ত বা অতৃপ্ত, স্বাচ্ছন্দ্য বা অস্বাচ্ছন্দ্য আপনা হতেই বোঝা যায়, জিজ্ঞাসা করতে হয়না। এমন কি অস্বস্তি বোধ করলেই তুমি লিখে রাখতে পারো "আজ আমি ঐকান্তিক হতে পারিনি।" "আজ আমি অসুখী।" একই কথা। আর তখন খোঁজ পড়ে কেন এমন হলো, সেটা সহজেই ধরা পড়ে।

যাক, এই যথেষ্ট হলো। আর কোনো প্রশ্ন আছে?

প্রশ্ন: মা, শ্রীঅরবিন্দের Letters-এ আছে যে ভগবৎকৃপা পুণ্যবান ও পাপীর মধ্যে কোনো প্রভেদ রাখেনা। সে কৃপার বিচার ও বাছাই তার আপন রীতিতে হয়, যা মানুষের মনের বুদ্ধিবিচার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রকমের। যেমন ভাবে কাজ করছে সেন্ট অগাষ্টিনের বেলাতে। তবে কেন এই বইতে তিনি আবার বলেছেন, "পরমতম কৃপা কাজ করবে কেবল আলো ও সত্যের মাধ্যমে।"

উত্তর: হাঁ, এটা আমি লক্ষ্য করেছি। আমি ভেবে দেখেছি ওটা। ওটা ঐ ভাবে তিনি লিখেছেন সহজ ক'রে বোঝবার জন্যে। কিন্তু আসলে যা বলতে চেয়েছেন তা লেখা রয়েছে এই খানে "কৃপাকে তুমি নিজেই ফিরিয়ে দাও"। তাই নয় কি? কোন পাতায় যেন আছে,—এই চতুর্থ পৃষ্ঠাতে। এই যে "ভগবৎ কৃপাকে ঠেলে দিচ্ছ তুমি নিজেই।"...

(শ্রোতা আবার পড়তে শুরু করলে মা বললেন) না, না, ওর পরে আছে গো ছেলে, "কৃপা সেখানে কাজ করেনা।" (অন্যের প্রতি) এই কথাটাই তো সেদিন আমরা ব্যাখ্যা করেছি। তুমি কৃপাকে বলছ যে আমার অমুক কাজটি তুমি ক'রে দাও, অমুক জিনিস এনে দাও, কিন্তু এ চাওয়া সত্যের নয়, তাই কৃপা সে রকম কাজ করে না, যাতে সত্য আছে তারই কাজ করে।

প্রশ্ন কিন্তু তাহলে তো পাপী কৃপার সাহায্য পায় না ?

উত্তর : পাপী তার পাপ কাজের জন্যে সাহায্য পাবে। তা নয়, কৃপা বরং চায় যে সে যেন পাপমুক্ত হয়। পাপীকে বর্জন সে করে না, কিন্তু সর্বদাই প্রস্তুত থাকে যাতে পাপকে সে ছেড়ে দিতে চায়। কখনই সে এমন বলেনা, "আমি তোমার জন্যে কিছু করব না।"

দুই জিনিসের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। তুমি যখন মন্দ হও, তখন কৃপা বলে— "আমি চাই না তোমাকে, আমার থেকে তোমাকে সরিয়ে দিচ্ছি, কিছুই তোমার জন্যে করব না। তোমার যা হবার তা হোক, আমি ওর মধ্যে নেই।" এর থেকেই সাধারণের মনোভাব এই দাঁড়ায় "ভগবান আমাকে ত্যাগ করেছেন"। কিন্তু সে কথা সত্য নয়। তুমি যদিও কৃপার উপস্থিতি টের পাওনা, কিন্তু সে সর্বদাই উপস্থিত, এমন কি ঘোর পাপী ও অপরাধীর বেলাতেও, চেষ্টা করছে যাতে তার প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে, সে যদি চায় পাপ-মুক্ত হতে ও অপরাধ করা ছেড়ে দিতে তখন সেই কৃপা তাকে সাহায্য করবে। সে কাউকে বর্জন করে না, কিন্তু মন্দ কাজেও সাহায্য করে না। তখন সে আসলে কৃপারূপে কাজ করে না। বুঝলে এবার ?

কিন্তু ওর পরে এই যে ছত্রটি রয়েছে তা সম্পূর্ণই সত্য। "তুমি নিজেই ভগবৎ কৃপাকে প্রত্যাখ্যান করছ।" ওর পরে আছে (কম আলো বলে সুইচ টিপতেই মাইকের মধ্যে জোর একটা শব্দ হলো, না বিস্মিত হয়ে চেয়ে পরে বইটির পাতা উল্টে বললেন) —এখানে রয়েছে—"তুমি বিপরীত শক্তির আক্রমণের দিকে নিত্য নিজেকে খুলে রাখলে নিত্যই কৃপা দূরে সরে থাকবে।" তাহলে দেখ...(নীরব হয়ে থেকে) কৃপা তো সরে চলে যায় না, বরং তুমিই সেখানে সরে থাকো। ওর আগেকার ছত্রে আছে, "তুমিই তাকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছ।" আর সরিয়ে দিয়ে ভাবছো যে কৃপাই গেছে সরে। এমনি নিত্যই হচ্ছে, নিত্যই কৃপা সরে থাকছে।

বইটি পড়তে গিয়ে আমি লক্ষ্য করলাম। ইংরেজী বইতে কেমন আছে জানিনা, কিন্তু এখানে এই ৭৯ পৃষ্ঠাতে রয়েছে "তুমি যদি সত্যকে চাও",—ওখানেও তাই হবার কথা।

একজন পড়ে শোনালে—"কৃপা তোমার থেকে সরে যাবে।"

উত্তর হাঁ, তা আছে বটে কিন্তু ওর পরেই আছে "তুমি নিত্যই বিরুদ্ধ প্রভাবের দিকে খুলে থাকবে।"

আসল বক্তব্যই হলো তাই। বস্তুত কৃপা কখনো ত্যাগ করেনা। ওর আগেই আছে—"কৃপাকে দোষী করতে পারো না।" অর্থাৎ নিজেই তাকে সরিয়ে দাও। নিজেরই দোষ।

তিনি এক জায়গাতে বলছেন কৃপার তরফ থেকে, আর এক জায়গাতে বলছেন ব্যক্তির তরফ থেকে, যে বলে "কৃপা সরে গেছে" অথচ নিজেই সরিয়ে রাখে, অর্থাৎ তার থেকে অনেকখানি ব্যবধান ঘটায়। এই "ঠেলে দেওয়া" বললে তা ঠিক বোঝায় না। এটি দার্শনিক ভাবে বলা নয়, মনস্তাত্ত্বিক ব্যবধানের কথা, কৃপা ও ব্যক্তির মাঝখানে। ঐ ভাষাতে বলা হলেও প্রকৃত জিনিসটা তাই দূরে আছে বলেই সে কৃপার স্পর্শ পায়না।

নতুনা কূপা ঠিকই আছে, কেবল ব্যবধানের জন্যে নাগাল পাচ্ছে না। কূপা সরে না, তাকে সরাবার ক্ষমতা কারোই নেই, চেতে না চাইলে সহস্র চেষ্টাতেও সে নড়বে না। ঐ ব্যক্তিই কেবল তার স্পর্শফল পাবেনা। নিজের ও কূপার মাঝে একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যবধান ক'রে রাখবে।

আচ্ছা গো ছেলেরা, যথেষ্ট বলা হলো।

এখন গুড্‌নাইট।*

—শ্রীমা

---

* Bulletin of S.A.I.C.E. থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

আমার দৃষ্টিতে

শ্রীঅরবিন্দের দি লাইফ ডিভাইন

শম্ভু গুহের অনুবাদ

প্রথম খণ্ড	প্রথম চার অধ্যায়	দাম—২·০০
দ্বিতীয় খণ্ড :	পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়	২·০০
তৃতীয় খণ্ড :	সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়	২·০০
চতুর্থ খণ্ড :	নবম ও দশম অধ্যায়	২·০০
পঞ্চম খণ্ড :	একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়	২·০০
ষষ্ঠ খণ্ড :	ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়	২·০০
সপ্তম খণ্ড :	পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ অধ্যায়	২·০০
অষ্টম খণ্ড :	সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়	২·০০
	প্রথম খণ্ড থেকে অষ্টম খণ্ড একত্রে বাঁধাই	২০·০০

—প্রাপ্তিস্থান—

চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স

১-১-১ এ-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অথবা

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরের প্রকাশিত পুস্তকাবলী

Tales of Prison Life	Sri Aurobindo	In Press
Words of Sri Aurobindo	1st Series	2·50
Words of Sri Aurobindo	2nd Series	4·00
,,	3rd ,,	5·00
,,	4th ,,	5·00
যোগসাধনা ও যোগের উদ্দেশ্য	শ্রীঅরবিন্দ	১·৫০
শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর আশ্রম		২·০০
গীতার ভূমিকা	শ্রীঅরবিন্দ	২·৫০
মৃত্যু ও মৃত্যুর পরে	শ্রীঅরবিন্দ	০·৭৫
যোগসাধনার ভিত্তি	শ্রীঅরবিন্দ	৩·৫০
মানবজাতির ভবিষ্যৎ বিবর্তন	শ্রীঅরবিন্দ	৯·০০
মায়ের আলাপ	শ্রীমা	৩·০০
শিক্ষা	শ্রীমা	২·০০
শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর বাণী		২·০০
যোগসমন্বয় প্রসঙ্গ	অনির্বাণ	১৫·০০
মা কি বলেন	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৩·০০
শতাব্দীর প্রণাম		৩·৫০
স্মৃতির পাতা ১ম পর্যায়		৬·০০
স্মৃতির পাতা ২য় পর্যায়		৪·০০
শ্রীঅরবিন্দায়ন (সচিত্র শ্রীঅরবিন্দের জীবন বাণী ও সাধনা)	নীরদবরণ	৪·০০
শ্রীঅরবিন্দ-প্রসঙ্গ	দীনেন্দ্রকুমার রায়	১·৮০
শ্রীমা-প্রসঙ্গ	কে, আর, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার	২·৮০
শ্রীঅরবিন্দ—জীবন ও যোগ	প্রবোধকুমার সেন	৭·০০
বিশ্বমানবের এগিয়ে চলা	চারুচন্দ্র দত্ত	৩·৫০
কে এই মা ?	পশুপতি ভট্টাচার্য	৭·০০
দিব্য জীবনের সন্ধানে		৪·০০
শ্রীঅরবিন্দ ও মায়ের নূতন বার্তা	,, ,,	১·৫০
মা আজও আছেন	,,	৪·০০
শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্মযোগ	সুধা বসু	৫·০০
Sri Aurobindo on Man	D. P. Chattopadhyaya	1·80
শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ		৭·০০

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট

কলিকাতা—৭০০০৭৩

ফোন : ৩৪-২৩৭৬

Our Homage to Sri Aurobindo and The Mother

Mitra Engineering & Construction Co.

(ENGINEERS OF REPUTE)

Phone 46-3957

Specialist in Insulation Work, Air Conditioning & Refrigeration, Electrical Engineers & Builders.

16/1, Chandranath Chatterjee Street
Calcutta–25

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field :
Sreepore Bagharghole
P.O. Bonhooghly, 24 Parganas

Head Office :
34: 1, Puddapukur Road
Calcutta-20

Phone : 47-2869

With the best Compliments from :—

Ellora Enterprise

Paper & Board Merchants

57/2A, College Street
Calcutta-12

Phone: 34-3720

শ্রীমায়ের সমগ্র রচনা সংগ্রহ

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২

১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ শ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী। শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির এই শতবার্ষিকী জয়ন্তী পালন করবেন। [illegible] একটি অংশ পালিত হবে শ্রীমায়ের সমগ্র রচনা প্রকাশনের মাধ্যমে। শ্রীমায়ের সমগ্র রচনা মূল ফরাসী এবং ইংরাজী ভাষায় অনূদিত ১৫ খণ্ডে প্রকাশ হবে। তাতে থাকবে তাঁর লেখা ধ্যান ও প্রার্থনা পুরানো লেখা, প্রশ্ন ও উত্তর, প্রবন্ধ, পত্রাবলী ইত্যাদি।

প্রাক প্রকাশনী মূল্য—১০০৲ টাকা (সডাক ১৩০৲ টাকা) (গ্রাহকদের জন্য)
প্রকাশ হবার পরবর্তী মূল্য—৪৫০৲ টাকা (সডাক ৫০০৲ টাকা)

[শ্রীমায়ের সমগ্র রচনা সংগ্রহ জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ মোট ১৫ খণ্ডে প্রকাশ করা হবে। ক্রাউন সাইজে ছাপা ও সুশর কাপড়ে মজবুত বাঁধাই হবে সুদৃশ্য বাক্সেটে মোড়া হবে। খুব কম সংখ্যা ছাপানো হবে।]

—গ্রাহক হবার নিয়মাবলী—

১। ১০০৲ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে।
২। প্রতিটি খণ্ড প্রকাশ হলে গ্রাহকদের জানানো হবে এবং ২০৲ টাকা দিয়ে [illegible] করতে হবে।
৩। শেষ দুই খণ্ড অর্থাৎ ১৪ ও ১৫ খণ্ড [illegible] সময় গ্রাহকের জন্য [illegible] হিসাবনিকাশ করা হবে।

[illegible] করার স্থান :—
(ক) শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির,
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩
(খ) শ্রীঅরবিন্দ ভবন,
শ্রীঅরবিন্দ-ভবন, ৮ শেক্সপীয়র সরণী, কলিকাতা-৭০০০৭১

1 5 NOV

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্তিকা

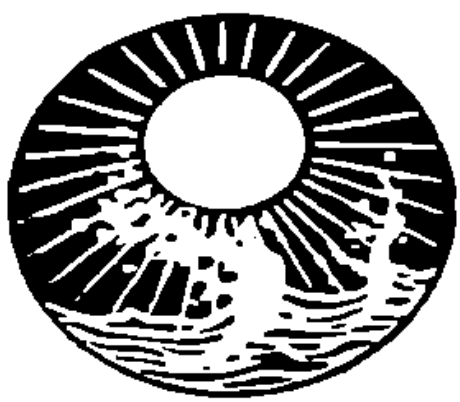

১৫ই আগস্ট, ১৯৭৭

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্ত্তিকা

(১৫ই আগস্ট, ১৯৭৭)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—৭৩

সাবিত্রী (অনুবাদ)	শ্রীঅরবিন্দ	৫
মায়ের সান্নিধ্য	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৮
ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিমন্ত্র	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১৫
চিন্তা প্রসঙ্গে	শ্রীমা	২০
মায়ের সঙ্গে কথা	...	২৮
সোলঝেনিৎসিনের চারটি কবিতা	সমীরকান্ত গুপ্ত	৩৭

পত্রিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি, পি, যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০		২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০		৫২০·০০
বাহিরের মলাট	২০০·০০		৬০০·০০

শাখা
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by : **Nolini Kanta Gupta**
Published by : Sri Aurobindo Pathamandir
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-73
Printed by : Amiyo Ranjan Ganguli
At Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry-2

To express Harmony,
of all Things
Simplicity
is the best.

J. —

সাবিত্রী

শ্রীঅরবিন্দ

৫ম পর্ব—প্রণয় পর্ব

১ম সর্গ—নিয়তিনির্দিষ্ট মিলনক্ষেত্র

আসন্ন তবে নিয়তিনির্দিষ্ট স্থান আর কাল ;
অজ্ঞাতসারে উপনীত সে অনামা তার গন্তব্যের সন্নিকটে।
যদি-বা অন্ধ আর জটিল অহেতুক ঘটনাবলীর ঘন আবরণ এক
ঢেকে রেখেছে সর্বজ্ঞানময় নিয়তির কর্মধারা
তবু আমাদের কর্মাবলী ব্যাখ্যা করে চলে সর্বজ্ঞ এক মহাশক্তিকে
অন্তর্নিহিত যে সকল বস্তুর আত্মনিয়ন্তা আপন উপাদানে ;
বিশ্বলীলাঙ্গনে সব কিছু ঘটে
নিজস্ব কালে আর পূর্বদৃষ্ট স্থানে।
এল অবকাশে সে এক বাতাস যেখানে মৃদুল মধুর
মনে হয় যৌবনের, পুলকের পুণ্যক্ষেত্র,
উত্তুঙ্গ জগৎ এক মুক্ত সবুজ আনন্দের
বসন্ত-নিদাঘ যেখানে রয়েছে সম্মিলিত
নিরত তারা অলস আর সুহৃদসম্মত বিতর্কে
বাহুবদ্ধ যেন পরস্পরে, সহাস্য দ্বন্দ্ব তাদের—কার হবে রাজ্য, কে হবে শাসক।
আশা সেখানে সহসা ডানা মেলে উড়ে চলে,
কে যেন অন্তর থেকে দৃষ্টিপাত করে বাহিরে পৃথিবীর বক্ষতল হতে,
অন্তরের সবকিছু তার অনুভব করে আসন্ন পরিবর্তন এক
ভুলে যায় সহজ আনন্দ আর সাধারণ স্বপ্নাবলী,
শোনে তারা মহাকালের আহ্বান আর দেখে অন্তঃপুরুষের পরমা নিয়তি,
উঠে যায় প্রশান্ত নির্মল এক সৌন্দর্যের মাঝে
শাশ্বতের দৃষ্টিতলে নিবাস যার।
পর্বতমালা সব মাথা তুলে দিয়েছে ভেদ ক'রে আকাশ
পরস্পরে দ্বন্দ্বনিরত স্বর্গের নিকটতর হবে বলে,
বর্মাচ্ছাদিত লৌহদৃঢ় সেনাবাহিনীর পুরোভাগ যেন ;
পৃথিবী শয়ান তাদের প্রস্তরপদভার তলে।
অধোভাগে এলায়িত সবুজ অরণ্যানীর স্বপ্ন এক,
সমুজ্জ্বল বনপ্রান্ত যত নিঃসঙ্গ সুপ্তি যেন :
পাণ্ডুর জলধারা ছুটে চলে ঝলসিত মুক্তার মালা যেন।
পুলকিত পত্রপল্লবমাঝে দীর্ঘশ্বাস এক চলে ঘুরে ফিরে ;
শীতল সুরভি ছড়ায়ে হর্ষভারের মন্থর গতিছন্দে

ফুলদলনাঝে মুছিত হয়ে পড়ে গিয়ে স্খলিতপদে সমীরণধারা।
দাঁড়িয়ে রয় শুভ্র বলাকা, শুভ্র মূর্ত আলোরেখা যেন,
ময়ূর আর ময়না রঙখচিত করে তুলেছে ভূমিতল আর তরুলতা,
পারাবতের মৃদুল আর্তকণ্ঠ মোহমুগ্ধ বাতাসকে আপূর্ণ করে ধরেছে
অগ্নিবর্ণ পাখায় ভর করে মত্ত ডাহুকেরা করে সন্তরণ রক্তশুভ্র জলাধারে।
পৃথিবী পায়িত নির্জনে সঙ্গে প্রেমিক তার স্বর্গ,
বিবসনা সে তার দয়িতের সিন্দূরাভ নয়নতলে।
উচ্ছ্বসিত আনন্দের উল্লাসে
অসঙ্কোচে ছড়িয়ে দেয় সে তার প্রেমসঙ্গীতের মূর্ছনা,
যথেচ্ছ রচনা করে যায় বর্ণলীলার তার আকুল ভঙ্গি যত
তার রঙের গন্ধের উৎসব-সমারোহ।
ঘোর রব এক, উল্লম্ফন আর ত্রস্তগতি চারিদিক ঘিরে রয়,
ছুটে চলে যারা শিকারে তাদের সন্তর্পণ পদক্ষেপ,
দুলিয়ে যায় সবুজ কেশর তার বন্য অশ্ব,
উষ্ণতার আর দাহনের স্বর্ণাভ আর ইন্দ্রনীল আভা।
আর তার আত্মহারা রতসহচরির মায়াবী,
উৎফুল্ল প্রাণস্পন্দিত শঙ্কাহীন দেবতাত্মা,
জীবনস্পন্দন ছুটে চলে বা লুকিয়ে রয় তার আনন্দময় কক্ষগর্ভে ;
সবার পশ্চাতে ধ্যানাসীন প্রকৃতির বিপুল স্তব্ধতা।
আদিম প্রশান্তি রয়েছে সেখানে, বক্ষতলে তার
স্থান পায় নির্বিঘ্নে পশুদের পাখীদের সংঘর্ষ।
আসেনি তখনও মানুষ কল্পনাকুশল তার গভীর ললাট নিয়ে,
করেনি হস্তক্ষেপ তার সুখী নিশ্চেতন জিনিসদের উপর,
ছিল না চিন্তা ছিল না সেই পরিমাপক যার তার তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রযত্ন,
জীবনধারা তখনও শিক্ষা করেনি লক্ষ্যের সঙ্গে বিবাদ তার।
শক্তিময়ী জননী এলায়িত সুখশয্যায় তার।
সবই চলেছে সমতালে তাঁর নিশ্চিন্ততার প্রথম পরিকল্পনা নিয়ে ;
পুলকের বিশ্বপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত তরুলতা
বিকশিত তাদের সবুজ তৃপ্তি নিয়ে
বনানীর সন্তানেরা করে না ভাবনা দুঃখ নিয়ে।
অবশেষে দেখা দিল তল নেমে গিয়েছে এক কঠোর বিস্তার
প্রান্তর এক জটিল সব খাদে ভরা, স্থিরমূর্তি পাহাড় সব রয়েছে দাঁড়িয়ে
প্রশ্ন নিয়ে তাদের
শিখর সব উঠে যায় অন্তরাত্মার নিরালম্ব তপস্যাধারা যেন,
বর্মরক্ষিত, সুদূর নিঃসঙ্গ মহান
অনন্তের মালা যেন চিন্তার আচ্ছাদন-অন্তরালে রয়েছে প্রসারিত

নৃত্যপর বিশ্বনটরাজের আত্মসমাহিত হাস্যরেখার পশ্চাতে।
জটাজুট বনানীশীর্ষ স্বর্গে গিয়ে পৌঁছে
নীলকণ্ঠ তপস্বী এক যেন দৃষ্টি হানে দূরে
শিলাপরিবৃত তার পর্বতগুহা হতে
চেয়ে দেখে দিনমানের ক্ষণস্থায়ী পুলকাভা ;
আপন বিশাল প্রসারিত অন্তঃপুরুষ তার শায়িত পশ্চাতে।
বিশাল একান্তের বিপুল অস্ফুট আরাম এক
শ্রবণ তার ঘিরে রয়, আর্ত সীমাহীন আহ্বান এক
জীব যখন বিদায় নেয় এই জগৎ হতে।
এই রঙ্গ-প্রাঙ্গণ বিধামূর্তি জননী
বরণ করেছেন তাঁর সুখের কয়টি মুহূর্তের তরে ;
এখানে এই নির্জনে জগৎ হতে সুদূরে
তাঁর কর্ম তিনি এবার আরম্ভ করেন পৃথিবীর সুখদুঃখ নিয়ে।
খুলে যায় এখানে সম্মুখে তাঁর রহস্যময় প্রাঙ্গণ সব,
গোপন দুয়ার যত সৌন্দর্যের আর বিস্ময়ের,
ডানা যত উড়ে চলে এই সোনার ভবনে,
মধুরিমার মন্দির এই আর এই বহ্নিময় অলিন্দ।
বিদেশী তিনি মহাকালের দুঃখময় পথপরে,
অমর তিনি মৃত্যু আর মোহ নিয়তির যুগভার গ্রহণ করেছেন,
হোত্রী তিনি বিশ্বমণ্ডলের সুখদুঃখের মহাযজ্ঞে,
বিজন কান্তারে প্রেম এসে ধরা দিল সাবিত্রীর কাছে।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত

মায়ের সান্নিধ্য

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

তোমরা সকলেই বোধ হয় প্রায়ই কিংবা মধ্যে মধ্যে ধ্যানে যাও, প্লে-গ্রাউণ্ডের সন্ধ্যাবেলার ধ্যানের কথা বলছি, সবাই না হোক, অন্তত: অনেকেই, অধিকাংশই যাও। ছোটদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো যাও না। মা যখন প্লে-গ্রাউণ্ডে এই সমবেত ধ্যান দিচ্ছিলেন, তখন প্রায় সর্বদাই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটত। মা যে কথা বলেছেন, শ্রীঅরবিন্দও সে সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন, তোমাদের কারো কারো মনে থাকতে পারে। সেই ধ্যানে যারা যোগ দিত—বেশির ভাগই আশ্রমবাসীরা—তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকত অদ্ভুত সব অতিথি দল বেঁধে অদৃশ্য সত্তা সব অন্য সব জগৎ থেকে, দেববৃন্দ, নানা স্তরের ও নানা শ্রেণীর দেবতারা, বড় বড় দেবতা, ছোট ছোট দেবতা—যত অদেহী ও বিদেহী সত্তা দেহী মানুষী জীবেদের সঙ্গে একাকার হয়ে ঠেলাঠেলি করত। এই ধ্যানের প্রতি তাদের বড় আকর্ষণ ছিল। তারা নিশ্চয় সমবেত হয়েছিল এ থেকে তাদের বিশেষ কোন লাভ হবে তার আশায়, যেমন আমরা মানুষরাও কিছু লাভ প্রত্যাশা করতাম! এছাড়াও এই ধ্যানসভার একটা নিজস্ব আকর্ষণ ছিল, বিশেষ করে এইসব অন্যলোকের বাসিন্দাদের পক্ষে, কারণ এ ছিল একটা সুযোগ, একটা বিরাট অসামান্য সুযোগ যখন তারা দেহধারী ভগবানের সাক্ষাৎ পেত, তাঁর সন্নিকটে আসতে পারত। অন্য অন্য জগতে তাদের আপন ক্ষেত্রে তারা ভগবান থেকে অনেক দূরে, তাঁর সঙ্গে সংযোগ সেখানে প্রত্যক্ষ নয়, কিন্তু এখানে, এই জায়গাটিতে রয়েছেন ভগবান স্বয়ং, নরক্রপে বা নারীক্রপে স্থূল জড়দেহে। অন্য কোথাও আর এমনটি ঘটতে পারে না, এই দর্শন, এই প্রত্যক্ষ সংযোগ, এই বস্তুই তাদের প্রলুব্ধ করত এখানে আসতে।

আমরা হতভাগ্য মানুষী জীবেরা এই মহান সুযোগ পেয়েছিলাম বহু বৎসর ধরে। আমি সর্বদাই সে কথা বলে থাকি, জড়তনুতে এই ভাগবত সান্নিধ্যের, উপস্থিতির কথা। এমনকি তোমরা যখন তা জানতেও না, তোমাদের মধ্যে একটা কিছু তা জানত এবং সেই স্পর্শ বর্তমান ছিল সঙ্গে সঙ্গে, এখনও সে স্পর্শ তুমি বয়ে বেড়াও সর্বত্র সদাসর্বদা, তা চির অক্ষুণ্ণ। পৃথিবীও ধরে রেখেছে সেই ভাগবত স্পর্শের কিছু এবং চিরদিন তা ধরে রাখবে। এ সেই বস্তু যা তাকে সাহায্য করে চলেছে সম্মুখে এগিয়ে চলতে—অতিক্রম করতে সকল প্রচণ্ড বাধা ও বিপত্তি যার মধ্য দিয়ে তাকে চলতে হচ্ছে এবং এখনও চলতে হবে আরও কিছু কাল—এরই মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে সে তার অবশ্যম্ভাবী লক্ষ্যের অভিমুখে।

আর একটি ঘটনা ঘটত—সেটিও একই ধরনের এবং সমানে চিত্তাকর্ষক। মা যখন অর্গান বাজাতেন, আমাদের কিছু আনন্দ দান করতে, প্রায়ই দেখা যেত তিনি অর্গানের সামনে শান্ত হয়ে একটুক্ষণ বসে থাকতেন—বাহ্যত: মনে হত বাজনা শুরু করার আগে কোন কিছুর জন্য অপেক্ষা করছেন এবং স্বভাবতঃই আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে বলতাম "মা ধ্যান করছেন বা অপেক্ষা করছেন অনুপ্রেরণার জন্য।" কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই কথাটি ছিল অন্য রকমের। তিনি নিজেই দু-একবার ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করেছেন। প্লে-গ্রাউণ্ডে ধ্যানের সময় যেমন তেমনি এখানেও ও ধরনের কিছু একটা তিনি বলতেন, যখন অর্গানের

চাবির সারিতে আঙুল রেখে বসতেন, একদল অদৃশ্য সঙ্গীতশিল্পী উপস্থিত হতেন সেখানে, সঙ্গীতজ্ঞ যত, যাঁরা স্বভাবতঃই মায়ের বাজনা শুনতে চাইতেন, আর সেই সঙ্গে থাকতেন সেই সব দুরাকাঙ্ক্ষী সঙ্গীতবিদ যাঁরা নিজেরা বাজাতে চাইতেন—বাজাতে চাইতেন মায়ের অঙ্গুলির আশ্রয়ে। তাঁদের পক্ষে এ ছিল এক মহা সুযোগ—নিজেদের প্রকাশ করবার, নিজেদের কৃতি দেখাবার, তাঁদের প্রতিভা ব্যক্ত করবার—এবং তা আবার মায়ের শরীর স্পর্শ সহায়ে। বাস্তবিকপক্ষে মাঝে মাঝে এই সব অপার্থিব সঙ্গীতবিদদের মধ্যে ঠেলাঠেলি হুটোপুটি লেগে যেত কে আসবে, মা কাকে আত্মপ্রকাশ করতে অনুমতি দেবেন এই নিয়ে ভারী কৌতুকের ব্যাপার হত সেটা! মা বলতেন, যখন কোন বিশেষ কারণে কোন একজন শিল্পীকে অনুমতি দিতেন, সেই ভাগ্যবান সত্তাটি মায়ের পুণ্য কুশলী আঙুলের সাহায্যে নিজের সুরটি বাজাতেন। এবং সুরটি যখন মায়ের অঙ্গুলির মধ্য দিয়ে বেরুত স্বভাবতঃ মায়ের নিজস্ব গুণ অথবা প্রেরণা কিছু সে বাজনার মধ্যে মিশে যেত। এখন মায়ের যেসব বাজনা তোমরা শোন তার অনেকগুলি এই ধরনের, একান্তভাবে বা সম্পূর্ণ মায়ের নিজের নয়, অন্য কোন জগৎ হতে অপর কোন মহাশিল্পী মায়ের সঙ্গীতে তাঁর নিজের রূপটি দিয়েছেন। আমাদের সুনীলের বাজনা একটা বিশেষ ধরনের মায়ের সঙ্গীতে অপূর্ব মানুষী সঙ্গীতের আরোপণ—দুয়ের সমন্বয় বা সংমিশ্রণ।

এ এক বিরাট রহস্য এবং এক অদ্ভুত, আগেই যেমন বলেছি, অনন্যসাধারণ ঘটনা, এই অবাধ আদানপ্রদান জড়জগৎ ও জড়জীবন এবং অন্য সব লোক বা বিশ্বজগতের মধ্যে। এতে ঘটত একটা বিমিশ্রণ, একটা মিল-মিশ, সময় সময় একটা একীকরণ ঘটত এই দুই বিভিন্ন বিচিত্র রাজ্যের মধ্যে। এবং এ ছিল একটা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, অত্যন্ত জীবন্ত ঘটনা। অবশ্য এক দিক দিয়ে এই যে দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও অসদৃশ জগতের মধ্যে পরস্পরের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া—এ জিনিস বিচ্ছিন্ন দু-একটি ঘটনা হিসাবে ঘটে না। এইসব উর্ধ্বতর বা অন্য জাগতিক শক্তিরা রয়েছে শুধু তাদের নিজেদের জন্যই নয়, নিজেদের আনন্দ ও ক্রমবৃদ্ধির জন্য নয়, বিশ্বলীলায় তাদেরও স্থান রয়েছে, স্থান রয়েছে পার্থিব বিবর্তন লীলাতেও অর্থাৎ তারা রয়েছে তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে জগতে এবং পৃথিবীর কাছাকাছি আসে তারা তার অগ্রগতিতে সাহায্য করতে। তারা ব্যক্তিবিশেষকেও সাহায্য করে তাদের শক্তি, সামর্থ্য ও প্রেরণা দিয়ে। "প্রেরণা" বা অনুপ্রেরণা শব্দটি অর্থই অন্যত্র হতে প্রভাব কোন, অন্য কোন মণ্ডল হতে। তার অর্থ এমন কিছু যা জ্ঞাত বা বর্তমানে সীমাবদ্ধ নয়, নূতন কিছু, অপরিচিত কিছু যা অন্য কোনখান থেকে আমাদের পুরাতন জীবনক্ষেত্রকে স্পর্শ করে। এই ঘটনাটি এখানে মায়ের বা শ্রীঅরবিন্দের আবহাওয়ায় ঘটত, বিশেষ রূপ নিয়ে দেখা দিত। শ্রীঅরবিন্দ কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, কেবল কয়ে এখানে অনেকে যারা বুদ্ধি ও সামর্থ্যে অত্যন্ত সাধারণ ও সামান্য ছিল, তারা হঠাৎ সজ্ঞেজে এক অবোধ্য উপায়ে এমন অন্য ধরনের গুণ ও কৃতি অর্জন করেছে যার কথা তারা স্বপ্নেও ভাবেনি। এ সম্ভব হয়েছিল শুধু এই আবহাওয়ায় প্রাপ্ত সাহায্যটির কল্যাণে, এই প্রেরণার শরীরী দিব্য সাহায্যে। এমনকি আজও এখানে আমাদের মধ্যে অনেকে আছে যারা পেয়েছে এবং এখনও পায় এই সহায়তা তাদের সঙ্গীতে, কাব্যে এবং শিল্পকলায়। উল্লেখযোগ্য একটি দৃষ্টান্ত আমি এখানে দিতে পারি একজন প্রফেসর ছিলেন—একজন ইংরেজ—

দর্শনের অধ্যাপক, তাও আবার দর্শনের একটি বিশেষ অঙ্গ, Mathematical logic—গাণিতিক ন্যায়শাস্ত্র—গণিত ও ন্যায়শাস্ত্রের গাঁটছড়া বাঁধা—ছাত্রদের কাছে সবচেয়ে শুষ্ক যে দুটি বিষয় অঙ্কের ছাত্র ও বাটোয়ারাশাই বারা তোমাদের মধ্যে তারা আমায় মাফ করো তোমাদের বিষয়টিকে এমন বিশেষণে ভূষিত করলাম বলে। এই অধ্যাপকটি—বালুকণার মত শুষ্ক—অলৌকিক ব্যাপার বলতে হয়—পুষ্পিত, প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলেন অতি চমৎকার কবি একজন। তিনি লিখতেন কবিতা—একান্ত শব্দালুতায় ভরা, অপরূপ গঠন ও অনুভূতি তার। তোমরা নিশ্চয়ই তাঁর কথা শুনেছ, কেউ কেউ নিশ্চয় পড়েছও তাঁর লেখা, আমি আর্ণবের কথা বলছি। সত্যিই চমৎকার কবি হয়ে উঠেছিলেন তিনি—তাঁর লেখার অঙ্কের আদৌ কোন চিহ্ন ছিল না, অবশ্য তা যদি না হয় অজ্ঞেয়ের, অনন্তের গণিতের যাদুমায়া।

মানুষী জীবের উপর অন্যান্য শক্তির প্রভাব এবং বাহ্য পরিস্থিতির উপর যে ক্ষমতা তারা প্রয়োগ করতে পারে, তার কথা বলছিলাম আমি। এসব জিনিস আপনাআপনিই ঘটে, তাদের উপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই। কিন্তু এ ক্ষমতাও অর্জন করা যায়। এই সব অতি-অসাধারণ ক্ষমতাও আয়ত্তে আনা যায়। এসব শক্তি ও প্রভাব সকলের সঙ্গে সচেতন সংস্পর্শে আসতে পার তুমি, তাদের জানতে চিনতে পার, এমনকি তাদের কাজও পরিচালিত করতে পার। শ্রীঅরবিন্দ এ রহস্যের কথা বলেছেন এবং আমার মনে হয় আমার "স্মৃতির পাতায়" আমিও এর উল্লেখ করেছি। শ্রীঅরবিন্দ নিজেও এই ধারার পরীক্ষার জন্য "স্বতঃলিখন" (Automatic writing) অভ্যাস করেছিলেন —তোমরা অনেকেই, বিশেষ করে বড়রা জান বোধ হয়। আমি ব্যাখ্যা করছি। শ্রীঅরবিন্দ এই সব ভিন্ন জাগতিক শক্তিদের এবং অদৃশ্য সত্তাদের তাঁর নিজের শারীর সত্তার মধ্যে প্রবেশ করতে দিতেন, ঠিক যেমনভাবে মা তাঁর সঙ্গীতের বেলায় অন্যান্য সত্তাদের অনুমতি দিতেন তাঁর অঙ্গুলিতে প্রবেশ করতে ও বাজাতে। এখানেও শ্রীঅরবিন্দ সেই একই বা অনুরূপ ব্যাপার করতেন জ্ঞানতঃ স্বেচ্ছাক্রমে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর আঙুলের ফাঁকে কলম বা পেন্সিলটি ধরে রাখতেন, এক টুকরো কাগজ সামনে রাখা থাকত, লেখার জন্য প্রস্তুত; আঙুলগুলিকে তিনি একান্ত শিথিল নিষ্ক্রিয় করে ছেড়ে রাখতেন—তাতে তাঁর নিজের কোন লেখার ইচ্ছা থাকত না—ঠিক নিষ্প্রাণ জড়বস্তু যেন। কিছুক্ষণ পরে কলম বা পেন্সিলটি আপনা থেকেই চলতে আরম্ভ করত—লিখতে শুরু করত, কখনও কখনও বক্তৃতা পর্যন্ত লিখে যেত, কখনও-বা দিত নির্দেশ কিংবা সংবাদ, তথ্য সব, প্রশ্নের উত্তরও দিত সময় সময়।

একবার এখানে এই পণ্ডিচেরীতেই শ্রীঅরবিন্দ এই পরীক্ষাটি করছিলেন। শ্রীমা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। একজন প্রশ্ন করলে, মাধ্যমিকের মধ্যে আবির্ভূত সত্তা বা ব্যক্তি-টিকে "আপনি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন?" "হাঁ, পারি"। "আপনি 'অমুকের' সম্বন্ধে কিছু বলবেন?" আমাদের পরিচিত এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করল সে। সত্তাটি সেই ব্যক্তির স্বভাবের একটা বর্ণনা এবং তার সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য পরিবেশন করল যার সবই অদ্ভুত রকম সঠিক। এইভাবে আমাদের পরিচিত আরও দু-তিন জনের সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়ে গেল সে। তখন আমাদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করল "আমাদের কাছে মায়ের সম্বন্ধে কিছু বলতে পার?"

বা প্রবলভাবে আপত্তি করলেন "না, না, আমার সম্বন্ধে কিছু নয়।" সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের পেন্সিল কাগজের উপর পড়ে গেল এবং ব্যাপারটির সেখানেই এবং তৎক্ষণাৎ ইতি হয়ে গেল। তা হলেও অদৃশ্য সত্তাটি যা যা বলেছিল তা বেশ চিত্তাকর্ষক, এমনকি তার শিক্ষাগত মূল্যও ছিল। শ্রীঅরবিন্দ ব্যাখ্যা করে বলতেন, এই সব সত্তাদের অনেকেই আসতে বিশেষ আগ্রহী কিন্তু তারা সব সময় সত্যিকথা বলে না। তারা নিজেদের বাহাদুরি দেখাতে চায় নয়তো-বা মানুষী জীবদের বিমূঢ় বা বিরক্ত করে মজা দেখতে চায়। অবশ্য মাঝে মাঝে উচ্চস্তর সত্তারাও আসতে পারে এবং সেরকম ক্ষেত্রে তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ, এমনকি সত্যিকারের জ্ঞানও লাভ করা যেতে পারে। শ্রীঅরবিন্দ নিজেই বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন, কেমন করে, তিনি যখন জেলে ছিলেন, বিবেকানন্দ তাঁর কাছে আসতেন এবং যোগের কার্যকরী পাঠ কিছু তাঁকে দিয়েছিলেন। তিনি যা জানতেন না, বিবেকানন্দ তাঁকে তা জানিয়ে দিয়েছেন।

আমি স্বতঃলিখনের কথা বলেছি, অনুরূপ আর একটি ব্যাপার আছে, তার নাম স্বতঃ-বাচন (automatic speech)। সেও সম্ভব। তুমি যখন কথা বল তা ঘটে যায়, তুমি ব্যক্তিগতভাবে কথা বল না, অন্য কথায়, তুমি কথা বলার কোন প্রয়াস কর না, তোমার মস্তিষ্ক বা মন কোন কাজ করে না, সব কিছু স্তব্ধ হয়ে থাকে এমনকি জিহ্বাও, স্বতঃ-লিখনে পেন্সিলটি যেমন থাকে। শ্রীঅরবিন্দ ব্যাখ্যা করেছিলেন কেমন করে এ বিদ্যা তিনি আয়ত্ত করেন। একসময়ে, যখন তিনি সত্যসত্যই যোগ অভ্যাস করার কথা চিন্তা করছিলেন, তিনি এমন একজনের সন্ধান করছিলেন, যে তাঁকে যোগের ব্যবহারিক দিকটিতে প্রথম পাঠ কিছু দিতে পারবে। তিনি শুনতে পেলেন এরকম একজন আছেন বরোদায় কোন একখানে। এই ব্যক্তিটি সাধারণতঃ যাদের গুরু বলা হয় সে ধরনের মানুষ ছিলেন না, তাঁকে দেখে গৃহস্থ মনে হত, তিনি মোটেই সন্ন্যাসী ছিলেন না। তিনি একটি অফিসে চাকরি করতেন, বোধহয় একজন কেরানী ছিলেন, তবু তিনি যোগের অনুশীলন করতেন তাঁর মতন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর প্রথম পাঠ ছিল তোমার মন শান্ত কর, সম্পূর্ণ নীরব, সেখানে যেন কোন চিন্তা না থাকে, কোন মানসক্রিয়ার সামান্যতম বুদ্বুদও নয়, মনকে হতে হবে সম্পূর্ণভাবে সাদা পাতা—শূন্য। তখনই প্রথম তোমার পক্ষে অভিজ্ঞতা লাভ সম্ভব হবে। সাধারণতঃ আমরা বলতে অভ্যস্ত আমি চিন্তা করি, তুমি চিন্তা কর, সে চিন্তা করে, কিন্তু বস্তুতঃ লক্ষ্য করে দেখবে তুমি আদৌ চিন্তা কর না, আসলে চিন্তারা তোমার কাছে আসে ; যখন তুমি নিজের মধ্যে এই নীরবতার ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করতে পারবে, দেখবে সত্যসত্যই চিন্তারা আসছে সেই ক্ষেত্রটির বাইরে থেকে, তোমার মস্তিষ্ক যেন বহিরাগত অনধিকারীরা অধিকার করে আছে এবং তুমি তখন স্থির করতে পার, বেছে নিতে পার তাদের তুমি গ্রহণ করবে, না, বর্জন করবে, তাদের চিত্তবিনোদন করবে না সটান বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তোমার মনকে সম্পূর্ণ শূন্য রাখতে পার তুমি যতক্ষণ খুশী, শ্রীঅরবিন্দ বলতেন, আমি তা অভ্যাস করলাম এবং তিন দিনেই আমার মন করে ফেললাম সম্পূর্ণ ফাঁকা, শূন্য, কোন বুদ্বুদের চিহ্নও ছিল না সেখানে—সে সময়ে এ একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা, তাঁর কাছে সম্পূর্ণ নূতন, এমন প্রশান্তি ও স্তব্ধতা, পরিপূর্ণ শূন্যতা। তারপর একদিন শ্রীঅরবিন্দ লেলে মহারাজের সঙ্গে দেখা করলেন এবং তাঁকে বললেন যে তিনি তখন রাজ-

নৈতিক কাজ করছেন এবং পরদিন তাঁকে একটা বক্তৃতা দিতে হবে . কিন্তু কি করে তিনি তা করবেন যদি তাঁকে এই মনের শূন্যাবস্থাতেই থাকতে হয়। "আমাকে যদি কথা বলতে হয়, আমাকে চিন্তা করতে হবে, একটা বিষয় নির্বাচন করতে হবে। আমি কি করব তাহলে?" লেলে মহারাজ উত্তরে বললেন, "এক কাজ কর, সভায় যাও, তোমার শ্রোতাদের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াও, সর্বসাধারণকে নমস্কার কর, ক'রে শান্ত হয়ে অপেক্ষা কর, দেখ কি ঘটে। কিছু বলতে বা চিন্তা করতে চেষ্টা ক'রো না, শুধু পরমা শক্তির হাতে নিশ্চেষ্ট যন্ত্র হয়ে থেক।" শ্রীঅরবিন্দ সে নির্দেশ পালন করলেন, করজোড়ে দাঁড়ালেন, জনমণ্ডলীকে নমস্কার করলেন এবং অন্তরে পরম ভগবানকে প্রণাম জানালেন। তিনি বলছেন, "আমি কিছুই চিন্তা করিনি, নীরব সাক্ষী হয়ে শুধু অপেক্ষায় ছিলাম যা ঘটে তার জন্য। তারপর হঠাৎ দেখলাম জিভ নড়ে চলেছে, ঠোঁট কথা সব উচ্চারণ করে চলেছে। এইভাবে তিনি এক দীর্ঘ বক্তৃতা দেন এবং তিনি বলেন যে তাঁর মধ্য দিয়ে কি বলা হচ্ছে তা তিনি সঠিক জানতেনও না, শুধু একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল . কিন্তু অন্য সকলেই বলেছে সেটা ছিল অতি উচ্চ ধরনের বক্তৃতা। তারপর থেকে সাধারণে তাঁর যত বক্তৃতা সবই এসেছে এইভাবে স্বতঃবাচনের সাহায্যে। আরও পরে তিনি আমাদের বুঝিয়ে বলেছিলেন, দেখিয়েছিলেন দৃষ্টান্ত দিয়ে যে কেমন করে জিনিসটি করা হয়। তা ছিল একটা আসর। ধ্যানসভার মত, আমরা সকলে একসঙ্গে তাঁর সঙ্গে বসতাম, অল্প কয়েকজন। আমরা বেশ আরাম করে বসতাম স্বচ্ছন্দ হয়ে, বসে শান্ত ও নীরব হয়ে থাকতাম এবং তারপর ব্যাপারটি ঘটত হঠাৎ সবাই যখন নিস্তব্ধ তিনি কথা বলতে আরম্ভ করতেন আমি বলছি তিনি কথা বলতেন, কিন্তু সে কণ্ঠ তাঁর নয়, নিশ্চয়ই অন্য কেউ তাঁর মাধ্যমে কথা বলছিল। সময় সময় বক্তা নিজের পরিচয় ঘোষণা করতেন, বলতেন "আমি অমুক ব্যক্তি।" মাঝে মাঝে বড় বড় ঐতিহাসিক চরিত্রেরা আসতেন, উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, 'স্মৃতির পাতা'য় আমি বর্ণনা দিয়েছি মহান ফরাসী বিপ্লবের বিখ্যাত নেতা "দাঁতঁ" (Danton)। ভরঙ্কর কণ্ঠে তিনি চেঁচিয়ে বললেন: আমি দাঁতঁ, বিভীষিকা, রক্তবিভীষিকা আমি ইত্যাদি। একবার অতীত যুগের, গ্রীসদেশের এক বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আবির্ভূত হলেন, তিনি রাজনীতির পাঠ দিতে আরম্ভ করলেন। বক্তিমও এসেছিলেন একবার, আমার বইতে এ কাহিনীরও উল্লেখ করেছি।

এসব কথা অবতারণা তোমাদের বলতে যে তোমাদের ঘিরে আছে বিভিন্ন সত্তা ও প্রভাবের জগৎ এক এবং এই যে দৃশ্যমান দেহ তোমাদের, স্বাভাবিক মন যা তোমাদের মধ্যে সাধারণতঃ সক্রিয়, তারাই তোমাদের নিজস্ব নয়। এমনকি সাধারণ জীবনেও তুমি যখন ভাব যে তুমি কাজ করছ, তুমি কথা বলছ, তা আদৌ সত্য নয় কিংবা কেবল আংশিক সত্য। তোমার একটি অংশ, একটি খুবই ক্ষুদ্র অংশ তোমার ক্রিয়াকর্মে ব্যাপৃত হয়। তুমি যেন একটা হিমশৈল—অধিকাংশই তোমার জলতলে নিমজ্জিত, শুধু চূড়াটুকু, সমগ্রের অতি সামান্য অংশ একটু দৃষ্টিগোচর তার। অস্বাভাবিক ক্ষেত্রে সব এ সত্যটি প্রত্যক্ষ করা যায়, যেমন ধর যখন তুমি ক্রোধে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছ, এমন সব কথা তুমি উচ্চারণ করে বস যা উচ্চারণ করার কথা তুমি আদৌ ভাবনি, কিংবা এমন কাজ করে বস যা তোমার প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত—এরকমটি ঘটে তার কারণ সে সময় তোমাকে 'ভূতে পায়', সত্যিই ভূতগ্রস্ত হয়ে যাও তুমি, অদৃশ্য সত্তা এবং জীবসব ভর করে তোমার উপর। ভূতগ্রস্ত হওয়া, ভূতে পাওয়া

খুব পরিচিত ঘটনা। ভূতগ্রস্ত হওয়ার আর একটি পরিচিত ঘটনা হিস্টিরিয়া ব্যাধি। সম্মোহন-বিদ্যা, বশীকরণ, মাধ্যমের সহায়তায় যে সব বিভিন্ন অনুশীলন এ ধরনের—এ সবই প্রয়াসের পদ্ধতি ও উপায় যাতে করে অন্য জগতের সঙ্গে সচেতন ও স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রিত যোগাযোগ আয়ত্ত করা যায়। কিন্তু এসব প্রক্রিয়া খুবই স্থূল এবং বেশি দূরে বা গভীরে যায় না ; তাছাড়া এগুলি পরিণামে অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে ওঠার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে। এসব ঘটনার নানারকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে কিন্তু যা বললাম তা সাধারণ মনোবৃত্তির পক্ষে স্বপ্নের অতীত কিছু। বাস্তবিকপক্ষে আমরা বিশ্বলোকের মধ্যে বাস করি। যেমন বলেছি, বিভিন্ন ধরনের সত্তা, প্রভাব এবং শক্তি সব তোমার মধ্যে ও তোমার চারিদিকে ঠেলাঠেলি করছে এবং বেশির ভাগ সময়েই তুমি তাদের হাতে পুতুল মাত্র। তাহলেও অবস্থাটা তোমার পক্ষে এতটা করুণ না-ও হতে পারে : কারণ, বিরোধী সত্তা ও শক্তিরা যেমন আছে, তেমনি আবার আছে কল্যাণপ্রদ দেবদূতের সাহায্যকারী দেবতারা—তারাও তোমার অলভ্য নয়। এখন তোমার উপর নির্ভর করছে কাকে গ্রহণ করবে তুমি। এবং তোমাকে ঠিক জিনিসটি বেছে নিতে হবে—সেখানেই যোগপন্থা আসে তোমার জীবনের রক্ষাকর্তা হয়ে। আমরা বলি, এইসব অদৃশ্য বস্তু ও শক্তিদের সম্বন্ধে সচেতন হবার এবং এই যত লক্ষ লক্ষ শক্তির সংঘাত তার মধ্যে শৃঙ্খলা ও সঙ্গতি আনার পথই হল যোগপন্থা। সহস্র দিকে সবলে তাড়িত চালিত ও আকৃষ্ট হওয়ার পরিবর্তে কি করে তাদের পরিচালিত করা যায় একই লক্ষ্যে, সংগঠিত করা যায় একই কেন্দ্রে, তারই পন্থা দেখায় যোগপন্থা। তোমার জীবনকে সুসংগঠিত করাই হল লক্ষ্য, তোমার প্রকৃত মূল উদ্দেশ্য। আর সেই মূলকেন্দ্র হল তোমার মধ্যে যে ভগবান, যে ভাগবত সান্নিধ্য, মায়ের সান্নীপ্য, তোমার প্রকৃত সত্তা, তোমার অন্তরাত্মা। আমি বলেছি, তোমার মধ্যে ও তোমার বাহিরে রয়েছে অনেক, অনেক সব শক্তি ও ক্রিয়াগতি—তারা তোমাকে টেনে নিয়ে ফেলে পরস্পর-বিরোধী দিকভ্রান্তির মধ্যে, তোমাকে তাদের শাসনে আনতে হবে, পরিচালনা করতে হবে এক লক্ষ্যের অভিমুখে, সুসংবদ্ধ করতে হবে তোমার সত্তাকে, তোমার নিজেকে, বরং বলা যাক তোমার বিভিন্ন 'আমি'কে—কারণ তুমি একজন নও, একাধারে বহুজন, তুমি একজন ব্যক্তিবিশেষ নও, ব্যক্তিসমষ্টি তুমি—তাদের সকলকে। তাদের সকলকে গ্রহণ করতে হবে, সুশৃঙ্খলায় সুসংবদ্ধ করতে হবে এবং পরিণামে এটিই হচ্ছে সুখের পথ—সত্যকার সুখের উপায়। যদি জীবনে সুখ ও সন্তোষ লাভ জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তোমার বিভিন্ন ব্যক্তিসত্তাদের সুসংগত করে তোলা ভিন্ন তার আর অন্য কোন পথ নেই। মা সর্বদাই এই প্রয়োজনটির কথা বলতেন—তোমার ব্যক্তিত্বকে কুড়িয়ে এনে কেন্দ্রীভূত করা, একটা সুসমঞ্জস সমগ্র করে তোলার প্রয়োজন। বাস্তবিক পক্ষে যোগশব্দের শাব্দিক অর্থও একসঙ্গে যুক্ত করে ধরা, তোমার সত্তার যত অসমঞ্জস অংশ, যত সব পরস্পরবিরোধী ব্যক্তিত্ব তোমার সত্তাকে আশ্রয় করে রয়েছে তাদেরকে তাদের সকলকে একসঙ্গে যুক্ত করা, একটি মাত্র সুসঙ্গত ব্যক্তিসত্তায়—অর্থাৎ তোমার দিব্য অন্তরাত্মায় একত্র করে তোলা। প্রক্রিয়াটি অবশ্যই কঠিন : যোগপথের শুরুই আত্মশুদ্ধি দিয়ে যার অর্থই হল একটা একান্ত ও কঠিন শ্রম—তপস্যা, কিন্তু সেটাই হল ভিত্তি। তবে, যেমন বলেছি আগেও, এ পথে তুমি একা নও, সহায় তোমার সঙ্গে রয়েছে—তোমার সঙ্গে যেসব ব্যক্তি বা শক্তি আছে তাদের সাহায্য

ছাড়াও রয়েছে সে পরম চিরকল্যাণী সহায় স্বয়ং মায়ের। ভগবান জড়তনু নিয়ে আমাদের কাছে এসেছিলেন এই সাহায্য করতেই। মা সরে গেছেন, বাহ্যতঃ তাঁর জড়দেহ সরিয়ে নিয়েছেন কিন্তু সে সহায় তিনি রেখে গেছেন আমাদের সঙ্গেই, এবং তা রয়েছে পূর্ববৎ প্রায় একই ভাবে।

এ যুগে, সাধুসন্তেরা বলেছেন, ভগবান আমাদের সন্নিকটে, অতি সন্নিকটে। আমরা যখন ছোট ছিলাম, বলা হত যে আমরা এখন কলিযুগে প্রবেশ করেছি—এ যুগ অন্ধকারের যুগ, তমসা আর ক্ষুদ্রতার যুগ—অর্থাৎ এ যুগে মানুষ ছোট হয়ে গেছে, ক্ষুদ্র ও দুর্বল যেমন দেহে তেমনি অন্তরের গঠনে। কিন্তু ভগবান আমাদের প্রতি করুণাপরবশ হয়ে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য নিজেকে করে দিয়েছেন ক্ষুদ্র, হয়তো আপাত দৃষ্টিতে দুর্বলও, বামনরূপ নিয়েছেন যেন, যাতে আমাদের সঙ্গে মানুষী হয়ে উঠতে পারেন। অন্যান্য যুগে, এমনকি সত্য যুগে ভগবান, পরমপুরুষ যিনি, তিনি ছিলেন পৃথিবী থেকে অনেক দূরে, এই জড় জগৎ (যা মায়া, অলীক মরীচিকা) হতে দূরে ও তার সম্বন্ধে নিরাসক্ত যেন। সুতরাং সেসব যুগে ভগবানের কাছে পৌঁছতে, তাঁর সামীপ্য লাভ করতে হলে অনেক উর্ধ্বে উঠতে হত—উঠে চলতে হত উপরে আরও উপরে, অন্তহীন যেন সে যাত্রা, একান্ত শ্রমসাধ্য। সেজন্য প্রয়োজন হত প্রচণ্ড কঠোর প্রয়াস, সে ছিল তপস্যার যুগ, ভগবানের দর্শন পেতে হলে, সাক্ষাৎ পেতে হলে তপস্বী হতে হত। কিন্তু এখনকার কথা ভিন্ন। ভগবানই আমাদের কাছে নেমে এসেছেন, জড়তনু আশ্রয় করেছেন। তিনি পৃথিবীর আবহাওয়াতে, পরিবেষ্টনেই রয়েছেন, জড়স্তর থেকে খুব দূরে নয়। ছোটবেলায় আমরা শুনেছি, কলিতে ধর্ম বা অধ্যাত্মচর্চা সহজ করে দেওয়া হয়েছে ভগবানের কৃপায়, মানুষের দুর্বলতায় করুণা-পরবশ হয়ে। কলিযুগের মানুষ কঠোরতায় কৃচ্ছ্রতায় অসমর্থ, সুতরাং শুধু ভগবানের নাম উচ্চারণই যথেষ্ট তার মুক্তির জন্য। তাই বলছিলাম ভাগবত সহায় আমাদের দরজায়—ভগবান স্বয়ং রূপ ধরে রয়েছেন সেখানে। কেবলমাত্র তোমাকে হতে হবে আন্তরিক—একাগ্র হতে হবে, তোমাকে শুধু ভালবাসা নিয়ে, আকুতি নিয়ে দুহাত বাড়িয়ে দিতে হবে, প্রসারিত করে দিতে হবে তোমার হৃদয়ের চেতনা তাঁর দিকে। চেতনার এই একান্ত দিক্-পরিবর্তন, এটিই হল প্রয়োজন, শিশুর অনাবিল শারীর আন্তরিকতা নিয়ে সত্যসত্য চাওয়া। মা সর্বদা এই কথাই বলতেন : শিশুর মত হও, শিশু হয়ে ওঠ, আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে রয়েছি।

ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিমন্ত্র

(ঋগ্বেদ)

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

৩য় মণ্ডল—৫ম সূক্ত

১। প্রত্যগ্নিরুষসশ্চেকিতানোঽবোধি বিপ্রঃ পদবীঃ কবীনাম্।
পৃথুপাজা দেবয়তিঃ সমিদ্ধোঽপ দ্বারা তমসো বহ্নিরাবঃ ॥১॥

প্রতি—অভিমুখে
অগ্নিঃ—অগ্নি
উষসঃ—উষাসকল
চেকিতানঃ—জাগ্রত হয়েছে
অবোধি—জেনেছে
বিপ্রঃ—জ্ঞানালোকিত
পদবীঃ—পথ সব
কবীনাম্—দ্রষ্টাদের
পৃথুপাজাঃ—বিপুল তেজসম্পন্ন
দেবয়তিঃ—দেবত্বকামীদের
সম্-ইদ্ধঃ—সমিদ্ধ হয়ে
অপ (+আবঃ)—খুলে ধরেছে, উন্মুক্ত করেছে
দ্বারা—দ্বারসকল
তমসঃ—অন্ধকারের
বহ্নিঃ—বহনকারী শিখা
আবঃ (অপ+)—খুলে ধরেছে, উন্মুক্ত করেছে

অগ্নিদেব জাগ্রত উষাদের সম্মুখে, জ্ঞানদীপ্ত তিনি দ্রষ্টাদের যাত্রাপথ জানেন, দেবত্বকামীরা তাঁকে বিপুল তেজোময় করে সমিদ্ধ করেছেন, ঊর্ধ্বমুখী শিখা অন্ধকারের দ্বারসব উন্মুক্ত করে দিয়েছেন ॥১॥

২। প্রেদ্বগ্নির্বাবৃধে স্তোমেভির্গীর্ভিঃ স্তোতৄণাং নবসা উক্থৈঃ।
পূর্বীর্ঋতস্য সংদৃশশ্চকানঃ সং দূতো অদ্যৌদুষসো বিরোকে ॥২॥

প্র (+ববৃধে)—বৃদ্ধিলাভ করে
ইৎ উ—নিশ্চয়ার্থে
অগ্নিঃ—অগ্নি
ববৃধে (প্র+)—বৃদ্ধিলাভ করে
স্তোমেভিঃ—স্তুতি দিয়ে, স্তব দিয়ে
গীঃ-ভিঃ—বাক্য দিয়ে
স্তোতৄণাম্—স্তোতাদের
নবস্যাঃ—প্রণম্য
উক্থৈঃ—মন্ত্র দিয়ে
পূর্বীঃ—বহুল
ঋতস্য—ঋতের
সম্-দৃশঃ—সৎ দৃষ্টি, সুদৃষ্টি
চকানঃ—কামনা করে
সম্ (+অদ্যৌৎ)—উদ্ভাসিত হয়েছে, প্রোজ্জ্বল হয়েছে
দূতঃ—দূত
অদ্যৌৎ (সম্+)—উদ্ভাসিত হয়েছে, প্রোজ্জ্বল হয়েছে
উষসঃ—উষার
বি-রোকে—বিপুল উদ্ভাসনে

অগ্নিদেব স্তবাবলীর, বাক্যাবলীর কল্যাণে বৃদ্ধিলাভ করেছেন, তিনি প্রণম্য স্তোতাদের মন্ত্রে, দূত তিনি, তাঁর কাম্য হল সত্যের বহুল সৎ-দৃষ্টি, তিনি উষার বিপুল প্রভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন ॥২॥

৩। অধায্যগ্নিম্মানুষীষু বিক্ষুপাং গর্ভো মিত্র ঋতেন সাধন্।
আ হর্যতো যজতঃ সানুস্বাদভুদ্বু বিপ্রো হব্যো মতীনাম্ ॥৩॥

অধায়ি—স্থাপিত হয়েছে	আ (+অস্থাৎ)—আরোহণ করেছেন
অগ্নিঃ—অগ্নি	হর্যতঃ—প্রিয়, স্পৃহনীয়
মানুষীষু—মানুষী	যজতঃ—যজ্ঞসাধক
বিক্ষু—জনসংঘে	সানু—শিখরে, সমুচ্চদেশে
অপাম্—জলধারার	অস্থাৎ (আ+)—আরোহণ করেছেন
গর্ভঃ—শিশুসন্তান	অভূৎ—হয়েছেন
মিত্রঃ—মিত্র	উ ইতি—নিশ্চয়ার্থে
ঋতেন—সত্যের সহায়ে	বিপ্রঃ—দীপ্তিমান দ্রষ্টা
সাধন্—সিদ্ধি নিয়ে আসেন, সিদ্ধি দান করেন	হব্যঃ—আহ্বনীয়, আহ্বানযোগ্য
	মতীনাম্—চিন্তারাজির

অগ্নি মানুষী জনসকলে স্থাপিত হয়েছেন, জলরাশির শিশুসন্তান তিনি, তিনি আমাদের মিত্র, সত্যের সহায়ে অভীষ্ট সাধন করেন, তিনি উর্ধ্বে শিখরে আসীন, তিনি হয়ে উঠেছেন দীপ্তিময় দ্রষ্টা, তাঁকে আহ্বান করতে হয় চিন্তারাজি দিয়ে ॥৩॥

৪। মিত্রো অগ্নির্ভবতি যৎ সমিদ্ধো মিত্রো হোতা বরুণো জাতবেদাঃ।
মিত্রো অধ্বর্যুরিষিরো দমূনা মিত্রঃ সিন্ধূনামুত পর্বতানাম্ ॥৪॥

মিত্রঃ—মিত্র	মিত্রঃ—মিত্র (তিনি)
অগ্নিঃ—অগ্নি	অধ্বর্যুঃ—যজ্ঞযাত্রায়
ভবতি—হয়ে ওঠে	ইষিরঃ—বেগময়, তীব্রগতি
যৎ—যখন	দমূনাঃ—স্বগৃহবাসী
সম্-ইদ্ধঃ—সমিদ্ধ	মিত্রঃ—মিত্র (তিনি)
মিত্রঃ—মিত্র	সিন্ধূনাম্—নদীসকলের
হোতা—আহ্বানকারী	উত—আর
বরুণঃ—বরুণ	পর্বতানাম্—পর্বতসকলের
জাতবেদাঃ—জাতিস্মর	

অগ্নি সমিদ্ধ হলে অগ্নি মিত্র হয়ে ওঠেন—মিত্র, যিনি হলেন আহ্বানকারী আর বরুণ যিনি হলেন সকল জনমের জ্ঞাতা, মিত্ররূপেই তিনি আবার যজ্ঞযাত্রার পুরোহিত, বেগময় তিনি গৃহবাসী হয়ে, মিত্র তিনি সকল নদীর, সকল পর্বতের ॥৪॥

৫। পাতি প্রিয়ং রিপো অগ্রং পদং বেঃ পাতি যন্নাশ্চরণং সূর্যস্য।
পাতি নাভা সপ্তশীর্ষাণমগ্নিঃ পাতি দেবানামুপমাদমৃষুঃ ॥৫॥

পাতি—রক্ষা করে	পাতি—রক্ষা করে
প্রিয়ম্—প্রিয়	নাভা—নাভিকেন্দ্রে
রিপঃ—আঘাত থেকে	সপ্ত-শীর্ষাণম্—সপ্তশীর্ষ

অগ্রম্—সমুচ্চ শিখরস্থ
পদম্—পদ, আসন, স্থিতি
যে:—সত্তার
পাতি—রক্ষা করে
যজ্ঞ:—তেজস্বান, বীর্যময়
চরণম্—গতিধারা
সূর্যস্য—সূর্যের
অগ্নি:—অগ্নি
পাতি—রক্ষা করে
দেবানাম্—দেবতাদের
উপ-মাদম্—মহানন্দ
ধন্য:—মহনীয়, দর্শনীয় (সায়ণ)

তেজস্বী তিনি, সত্তার যে প্রিয় পরম পদ তাকে রক্ষা করেন, তিনি রক্ষা করেন সূর্যের গতিধারা, নাভিকেন্দ্রেই তিনি রক্ষা করেন সপ্তশীর্ষকে, মহিমাময় অগ্নি রক্ষা করেন দেবতাদের পরমানন্দ ॥৫॥

৬। ঋভুশ্চক্র ঈড্যং চারু নাম বিশ্বানি দেবো বয়ুনানি বিদ্বান্।
সসস্য চর্ম ঘৃতবৎ পদং বেস্তদিদগ্নী রক্ষতাপ্রযুচ্ছন্ ॥৬॥

ঋভু:—ঋভু, দিব্যশিল্পী
চক্রে—গড়ে তুললেন
ঈড্যম্—পূজ্য
চারু—সুন্দর
নাম—নাম
বিশ্বানি—যাবতীয়, সকল
দেব:—দেবতা
বয়ুনানি—জ্ঞানের প্রকাশ
বিদ্বান্—তিনি জানেন
সসস্য—প্রশান্তির
চর্ম—গতির মধ্যে
ঘৃতবৎ—প্রোজ্জ্বল, তেজঘন
পদম্—পদ
যে:—সত্তার
তৎ—তাকেই
ইৎ—নিশ্চয়
অগ্নি:—অগ্নি
রক্ষতি—রক্ষা করে
অপ্রযুচ্ছন্—অব্রান্তভাবে

পরম শিল্পী তিনি, পূজনীয় তিনি, জ্ঞানী তিনি, তাঁর জ্ঞানের নানা প্রকাশ, তিনি গড়ে তোলেন দিব্য নাম আর সত্তার প্রশান্ত গতির মধ্যে সত্তার সেই তেজঘন আসন, তাকেই অগ্নি রক্ষা করেন তাঁর অব্রান্ত কর্মধারায় ॥৬॥

৭। আ যোনিমগ্নির্ঘৃতবন্তমস্থাৎ পৃথুপ্রগাণমুশন্তমুশান:।
দীদ্যান: শুচির্ঋষু: পাবক: পুন:পুনর্মাতরা নব্যসী ক: ॥৭॥

আ (+অস্থাৎ)—প্রবেশ করল গিয়ে, ভিতরে আসীন হল
যোনিম্—জঠরে, আপন গৃহে
অগ্নি:—অগ্নি
ঘৃতবন্তম্—তেজোঘন
অস্থাৎ (আ+)—প্রবেশ করল গিয়ে, ভিতরে আসীন হল
দীদ্যান:—প্রোজ্জ্বল, উদ্ভাসিত
শুচি:—শুচি, শুদ্ধ
ঋষু:—মহীয়ান
পাবক:—শুদ্ধিকর
পুন:-পুন:—পুন:পুন:
মাতরা—পিতামাতাকে
নব্যসী—নব্য, নূতন

পৃথু-প্রগানম্—বিশাল প্রবেশপথ যার কঃ—করে
উশন্তম্—কামনা করে যে তাকে,
আকাঙ্ক্ষীকে
উশানঃ—সে কামনা করে,
আকাঙ্ক্ষা করে

অগ্নি আসীন হন গিয়ে তেজোঘন অন্তর্গৃহে বিশাল যার প্রবেশপথ, তাকে যে কামনা করে সেও তাকে কামনা করে। দীপ্তিময় সে, শুদ্ধ, শুদ্ধিকর, মহনীয়, মাতাপিতাকে পুনঃ-পুনঃ সে নূতন করে গড়ে ॥৭॥

৮। সদ্যো জাত ওষধীভির্বয়স্কৃদ্ যদী বর্ধন্তি প্রস্বো ঘৃতেন।
আপ ইব প্রবতা তন্যমানা উরুষ্যাদগ্নিঃ পিত্রোরুপস্থে ॥৮॥

সদ্যঃ—যখনই } —জন্মমাত্র
জাতঃ—জাত }
ওষধীভিঃ—উদ্ভিজ্জের দ্বারা, উদ্ভিজ্জদের দ্বারা
বয়স্কৃৎ—বাহিত
যদি (যৎ+ই)—যখনই
বর্ধন্তি—বর্ধন করে, বর্ধিত করে
প্র-স্বঃ—প্রসূতিরা
ঘৃতেন—তেজের সহায়ে
আপঃ-ইব—জল যেমন
প্রবতা—বহমান
তন্যমানা—দানশে, দীপ্তভাবে
উরুষ্যাৎ—রক্ষা করে
অগ্নিঃ—অগ্নি
পিত্রোঃ—মাতা-পিতা
উপস্থে—অঙ্কে

জন্মমাত্র উদ্ভিজ্জেরা বহন করে চলে যখনই প্রসূতিরা তাকে দ্যান তেজোধারায় বর্ধিত করে ধরে মাতা-পিতার অঙ্কে আসীন অগ্নি রক্ষা করে চলেন এই জ্যোতির্ময়, আনন্দময় জলপ্রবাহ যেন ॥৮॥

৯। উদু ষ্টুতঃ সমিধা যস্রো অদ্যৌদ্বর্হিষা বৃষভো নাধ্যায়ি।
মিত্রো অগ্নিরীড্যো মাতরিশ্বা ঘৃতো বৃক্তদ্রবির্হব্যায় দেবান্ ॥৯॥

উৎ—উর্ধ্বে
উ—অনন্ত:
ষ্টুতঃ—স্তুত হয়ে
সমিধা—সমিদ্ধ হয়ে, ইন্ধনের সহায়ে
যস্রঃ—শক্তিমান, মহান (সায়ণ)
অদ্যৌৎ (উৎ+)—প্রজ্বলিত হয়ে উঠল
বর্হিষা—বিস্তারে, প্রসারে
বৃষভঃ—দ্যুলোকের
অধি—মধ্যে, অন্তরে
নাভা—নাভির
মিত্রঃ—মিত্র
অগ্নিঃ—অগ্নি
ঈড্যঃ—পূজনীয়, কাম্য
মাতরিশ্বা—মাতৃ-অঙ্কে পুষ্ট
বৃক্তৎ (আ+বক্ষৎ)—বহন করে চলে যেন
ঘৃতঃ—ঘৃতরূপে
বৃক্তৎ (আ+)—বহন করে চলে যেন
হব্যায়—যজ্ঞের জন্য, যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য
দেবান্—দেবতাদের

পৃথিব্যাঃ —পৃথিবীর

আমাদের স্তবে সমিদ্ধ হয়ে শক্তিমান অগ্নি ঊর্ধ্বে প্রজ্বলিত হয়ে উঠলেন দ্যুলোকের প্রসারে আর পৃথিবীর নাভিকেন্দ্রে। অগ্নি হলেন প্রিয় মিত্র, মাতৃ-যজ্ঞে পরিপুষ্ট, দূত হয়ে তিনি যজ্ঞসাধনার জন্য দেবতাদের এখানে যেন নিয়ে আসেন ॥৯॥

১০। উদস্তভ্নীৎ সমিধা নাকমৃষ্বোঽগ্নির্ভবন্নুত্তমো রোচনানাম্।
যদী ভৃগুভ্যঃ পরি মাতরিশ্বা গুহা সন্তং হব্যবাহং সমীধে ॥১০॥

উৎ—ঊর্ধ্বে	যদি (যৎ+ই)—যখন
অস্তভ্নীৎ—স্তম্ভের মত তুলে ধরল	ভৃগুভ্যঃ—ভৃগুদের (আহুতিবাহকদের) জন্য
সমিধা—সমিদ্ধ হয়ে	পরি—ঘিরে, চারিদিকে
নাকম্—স্বর্গলোককে, স্বর্গকে	মাতরিশ্বা—মাতৃপুষ্ট
ঋষ্বঃ—মহিমাময়	গুহা—গুহার মধ্যে
অগ্নিঃ—অগ্নি	সন্তম্—আসীন
ভবন্—হয়ে উঠল	হব্যবাহম্—হব্যবাহককে
উত্তমঃ—সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ	সম্-ঈধে—সমিদ্ধ করে ধরল
রোচনানাম্—জ্যোতির্ময় লোকসকলের মধ্যে	

মহান অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে স্বর্গলোককে ঊর্ধ্বে তুলে ধরলেন যেন স্তম্ভের মত, জ্যোতির্লোকসকলের মধ্যে সর্বোত্তম হয়ে উঠলেন, যখন ভৃগুদের জন্য মাতৃপ্রাণপুষ্ট চারি দিকে সমিদ্ধ করে ধরল গুহাসীন এই হব্যবাহককে ॥১০॥

১১। ইলামগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ।
স্যান্নঃ সূনুস্তনয়ো বিজাবাগ্নে সা তে সুমতির্ভূত্বস্মে ॥১১॥

ইলাম্—দৃষ্টিময় বাক্	স্যাৎ—হয় যেন
অগ্নে—হে অগ্নি	নঃ—আমাদের
পুরুদংসম্—বহুল কর্মময়	সূনুঃ—পুত্র
সনিম্—বিজয়	তনয়ঃ—আত্মজ
গোঃ—জ্যোতির	বিজা-বা—সর্বত্রজাত
শশ্বত্তমম্—পরম চিরন্তন	অগ্নে—হে অগ্নি
হবমানায়—আহুতিকার বা আহ্বাতার জন্য	সা—সেই
সাধ—সাধন কর, অর্জন কর	তে—তোমার
	সুমতিঃ—সত্যচিত্ত
	ভূতু—হউ হয় যেন
	অস্মে—আমাদের মধ্যে

হে অগ্নি, আমরা আহ্বান করি তোমাকে, আমাদের জন্য নিয়ে এস চক্ষুষ্মান বাক্ আর সেই চিরন্তনী আলোকবিজয়ী বহুমুখী কর্মধারা ; হে অগ্নি, আমাদের আপন আত্মজ পুত্র হয় যেন, আমাদের মধ্যে হউ হয় যেন তোমারই সত্য মতি ॥১১॥

চিন্তা প্রসঙ্গে

শ্রীমা

৩

আমার সবসময়েই মনে হয়েছে যে, কয়েকটি বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া, মেয়েদের পক্ষে মন-বুদ্ধির কাজ হল—আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনাবলীর তাত্ত্বিক কারণ নিয়ে জল্পনাকল্পনা নয়, তা হল সেসব ঘটনাবলী থেকে কর্মক্ষেত্রের উপযোগী সিদ্ধান্তে পৌঁছান।

গত শুক্রবার শ্রীমতী মার্সিয়াল (Mme. Martial) খুবই সঙ্গতভাবে তোমাদের বলছিলেন যে পুরুষদের ধরনে চিন্তা করতে ইচ্ছা করাটা নারীদের পক্ষে ভুল হবে; তাতে করে তারা তাদের স্বকীয় গুণাবলী যা হল গভীর অন্তর্বোধ এবং ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত সেগুলি হারাবার ঝুঁকি নেবে, তাদের পরিপূরক পুরুষজাতির বিশেষ গুণগুলি অর্জন না করেই যা হল যুক্তিসঙ্গত বিচার এবং বিশ্লেষণ ও সমন্বয় করবার ক্ষমতা।

আর তারই জন্যে, যুক্তিসঙ্গত বিচার ও লোকাতীত কল্পনার আশ্রয়ে তোমাদের কাছে আজ প্রমাণ দিতে চেষ্টা করব না যে চিন্তারাজি হল সত্যময়, স্বশাসিত, জীবন্ত ও সক্রিয় সব সত্তা।

তাছাড়া, আমরা যদি অর্থহীন বাগবিস্তার না করে, একান্ত আন্তরিকভাবে কোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনারও ব্যাখ্যা দিতে চাই, তাহলে আমাদের ফিরে যেতে হবে মন থেকে ব্যাপক সাধারণ সব বিধানের উৎসে। এক কণা বালুকা ব্যাখ্যা করতে বিশ্বসংসারের প্রয়োজন। আর Union de Pensée Féminine এর জন্যে এরকম কোন কর্মসূচী আমরা বেছে নিইনি। যারা তাদের পূর্বপ্রাপ্ত শিক্ষা ও নিজেদের উপর চাপান বস্তুকেন্দ্রিক কসরতের দরুণ তত্ত্বজ্ঞানের বিপুল সমস্যা সব আলোচনা করতে ভালবাসে তারা তার চমৎকার সুযোগ পাবে École de la Pensée-তে প্রতিমাসের প্রথম শুক্রবারে।

তোমরা যদি চাও, Union de Pensée Féminine-এ আমরা হব আরো নম্র।

নারীর মধ্যে তার নিজস্ব স্বভাবের দরুণই রয়েছে আধ্যাত্মিক এবং গভীরতর অর্থে নৈতিক একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দাঁড়াবার অধিকতর যোগ্যতা। এই অধ্যায় ক্ষেত্রে আমরা হলাম আসলে বাস্তববাদী ও গঠনকর্ত্রী আমরা জানতে চাই কি করে ভালভাবে জীবন-ধারণ করা যায়, আর তার জন্যে আমাদের ভালভাবে চিন্তা করতে শিখতে হবে।

চিন্তার মৌলিক শুরুত্বটি বুঝতে হলে তাকে যেমনটি তেমন, অর্থাৎ এক জীবন্ত সত্তা বলে জানতে হবে, আর যাতে তোমরা চিন্তার স্ব-শাসিত অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পার তার জন্য আমি তোমাদের শুধু বলব নিজেদেরকেই ব্যক্তিগতভাবে তার সত্যতা নিরূপণ করতে—যা করা সহজ।

একটু লক্ষ্য করলেই আমরা বুঝতে পারব যে প্রায়ই, যেমন ধর, এমন সব চিন্তা বাইরে থেকে আমাদের কাছে পৌঁছায় যাদের সঙ্গে কোন সংযোগই ঘটেনি মুখে শোনার বা পাঠের মধ্য দিয়ে।

কেই-বা না লক্ষ্য করেছে এ-ব্যাপারটি, যেমন কথায় বলে, চিন্তা যেন রয়েছে

"বাতাসে", আর তাকে একাধিক আবিষ্কারক, বিজ্ঞানী ও সাহিত্যশিল্পী সমকালে লাভ করেছেন পরস্পরের সঙ্গে স্থূলক্ষেত্রে কোনরূপ যোগাযোগ না থাকা সত্ত্বেও।

এ ধরনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারত। আমি প্রত্যেকের উপর ছেড়ে দিলাম ভেবে দেখার আর দৃষ্টান্ত আবিষ্কার করার ভার যেগুলি ব্যক্তিগতভাবে এনে দেবে সব থেকে বেশি প্রত্যয়।

আমাদের বিষয়ের মধ্যে আরো বেশি প্রবেশ করবার আগে চিন্তা প্রসঙ্গে এক পৃষ্ঠা পড়ে শোনাচ্ছি যা হয়তো তোমাদের বিষয়টি বুঝতে সাহায্য করবে।

এ অংশটি এখনো অপ্রকাশিত একখানি দার্শনিক গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

"যে কোন ঘটনার ব্যাপারের তদনুযায়ী আধার থাকবেই ; যে কোন স্পন্দনের জন্য তার নিজস্ব মাধ্যম প্রয়োজন. আর যদি আলোর স্পন্দনের জন্য দরকার হয় সেই মাধ্যম যার নাম দিই আমরা ইথর, তাহলে চিন্তার সব স্পন্দন যা আরো সূক্ষ্ম, আরও রহস্যময় এবং আরও বেগবান, তার জন্যে একটি মাধ্যম প্রয়োজন হবে না কি ?

"আমি সে চিন্তার কথা মোটেই বলছি না যা ইতিমধ্যেই মস্তিষ্কের জড়তার চাপে রূপময় বস্তুময় হয়ে উঠেছে। মনোবিজ্ঞানীরা ভালই জানেন যে সচেতন ক্রিয়াকলাপের ধরনে পৌঁছবার আগে চিন্তাকে সবার আগে আরো দূরের অনাসব অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, যেতে হয়েছে তথাকথিত অবচেতনার অজানাসব ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে।

"অগম্য মহাশূন্য হতে উল্কা যেমন আমাদের কাছে এসে পৌঁছায় তেমনি আন্তর সব গভীরতা থেকে আমাদের আধারের উপরকার স্তরে এসেছে সে।

"কি ছিল ওই উল্কার উৎপত্তিস্থান, এই চিন্তার উৎস ? আমরা জানি না, তবু তারা রয়েছে, একটি আমাদের সূর্যের ওপারে, অপরটি নিশ্চয়ই আলোর ওপারে।

"আলো এবং চিন্তার মধ্যে রয়েছে একটা আরোহণের সম্বন্ধ। অপরিমেয়ের ক্রম-ধারায় একটি থেকে অপরটিতে যেতে হলে ধাপে ধাপে উঠতে হবে ধারণা করা হল এক উচ্চতর ধরনের দেখা।

"চিন্তা যে আমরা দেখতে পাই না তার কারণ চিন্তার উপাদান আলোর থেকেও সূক্ষ্ম-তর ; ঠিক যেমন আলো যে আমরা শুনতে পাই না, কারণ তার সারবস্তু শব্দের চেয়েও সূক্ষ্মতর।

"তার আপন ধরনের উপাদানরাজির মাঝে চিন্তা ঘুরে বেড়ায় যেন পার্থিব বস্তুরাজির মধ্যে আমাদের দেহের মতন। আমাদের হাত যেমন জানে কেমন করে এইসব বস্তুকে আকার দিতে হয়, তেমনি চিন্তাও জানে কি রকমে এইসব উপাদানকে দলে-পিষে ছাঁচে ঢেলে হাজাররকমের যথোপযুক্ত রূপ দিতে হয়।

"এই রকমে আমাদের বুদ্ধির বৃত্তি স্থূল গতিবৃত্তির চেয়ে কম সৃষ্টিধর্মী নয়। আর এই কারণেই প্রজ্ঞা সর্বদাই শিক্ষা দিয়েছে যে সৃজনী ক্রিয়াবলীর মত চিন্তাবলীর ওপরেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।"

আমরা তাহলে দেখছি যে চিন্তা, যা হল সক্রিয়তার পরাকাষ্ঠা, তার আপন লোকে নিজের জন্য একখানি দেহ গড়ে তুলতে গঠনকারী শক্তিরূপে কাজ করে। সে কাজ করে লোহাচুম্বের উপর চুম্বকের মত। তার চরিত্র, তার মত প্রবণতা এবং তার লক্ষ্যের সঙ্গে

যেসব উপাদানের সহজ-সাদৃশ্য রয়েছে সেসবকে সে আকর্ষণ করে, আর এই উপাদানরাজি হল কোষ যত যারা তার দেহ গড়ে দিয়েছে, যে দেহকে আমি বলব তরলধর্মী—বেশি ব্যাখ্যার মধ্যে না গিয়ে। চিন্তা এইসব উপাদানকে সতেজ করে, প্রাণবন্ত করে, তাদেরকে ছাঁচে ঢালাই করে, তার নিজস্ব প্রকৃতির পক্ষে সবথেকে যথাযথ রূপ দেয় তাদের।

চিন্তার এই কাজ এবং আবিষ্কারকের, যে কোন ধরনের স্থপতির কাজের মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য আমরা খুঁজে পাব। উদাহরণস্বরূপ স্টীম এঞ্জিনের কথাই ধরা যাক। এঞ্জিনীয়ার একটি প্ল্যান তৈরি করেন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জিনিসেরও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে, সবকিছু হিসাব করে নিখিয়ে ধরেন, তারপর, তার এই পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণের পক্ষে যথোপযুক্ত উপাদান-উপকরণ বেছে নেন, নির্মাণকার্য পর্যবেক্ষণ করেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আর যখন এঞ্জিনটি কাজ শুরু করবে, গতির সহায়ে সত্তাকার এক জীবন্ত সত্তা হয়ে উঠে, তা হবে তাকে গড়ে তুলেছে যে চিন্তা তার যথাসম্ভব পূর্ণতম অভিব্যক্তি, তা দেবে এই চিন্তার শক্তির পূর্ণ পরিমাপ। (রেলএঞ্জিন, মোটরগাড়ী, জাহাজ প্রভৃতির সুপ্তোত্থিত নিশ্চেতনা।) গঠনকারী চিন্তাশক্তি, যা হল জীবন্ত সত্তা, তার নিজের জন্য মানুষের হাতে গড়া এই দেহকে প্রাণবন্ত করে তোলে। মনের রাজ্যেও রয়েছে সচেতন স্থপতিরা।

এমন সব লোক আছেন যাঁরা বিশেষ সহজাত গুণের অধিকারী হয়ে কিংবা তাঁদের মধ্যে অন্তর্বোধ কিছু বিকশিত করে সেই রাজ্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন প্রধানতঃ দর্শন ও স্পর্শের সহায়ে।

তখন বাহ্যঘটনার গতিবিধি লক্ষ্য করতে সমর্থ হয়ে, তাঁরা, গবেষণাগারে রসায়নবিদদের মত, উপাদানসমূহকে নিজের কাজে লাগাতে পারেন, পারেন বেছে নিতে, তাঁদের ইচ্ছাশক্তির সামর্থ্যে সেসবকে ছাঁচে ঢালাই করতে পারেন এবং তাঁদের চিন্তারাজিকে এমন রূপ দিতে পারেন যেগুলি সেইসব চিন্তারাজিকে পুরোপুরি প্রকাশ করে ধরতে সমর্থ।

তবে এ হল ব্যষ্টিগত প্রগতির বহুবিধ পন্থার অন্যতমের প্রান্তবিন্দু। এই পূর্ণ চেতনায় পৌঁছবার অনেক পূর্বেই শক্তিমান রূপ সব গড়ে তোলা সম্ভব। যাদেরই চিন্তা কিছুটা সবল ও কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী তারা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই অনবরত সব রূপ গড়ে চলে।

যদি মনে রাখ যে এইসব রূপ হল জীবন্ত সত্তা, কাজ করে চলে যে-চিন্তা তাদের জন্ম দিয়েছে সর্বদা তারই নির্দেশিত পথে, তাহলে এই মানস ক্রিয়াবলীর ফলাফল যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা সহজেই বুঝতে পারবে।

সৎ, শুভ, ন্যায়সম্মত, সমুচ্চ চিন্তা যতটা হতে পারে পরম উপকারী, পরশ্রীকাতর, নীচ, অশুভ, স্বার্থপর চিন্তা হতে পারে তেমনি অপকারী।

এ-বিষয়ে আমি তোমাদের কাছে 'ধম্মপদ'-এর অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে শোনাব, তা থেকে তোমাদের কিছুটা ধারণা হবে প্রাচীনকালের প্রজ্ঞা চিন্তার উপর কি বিপুল গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

"যারা পরস্পরকে ঘৃণা করে, যারা পরস্পরের শত্রু, তারা একে অপরের যত ক্ষতি করতে পারে, বিপথে চালিত চিন্তাশক্তি মানুষের ক্ষতি করতে পারে আরো বেশি।

মাতা, পিতা কিংবা অপর কোন আত্মীয়স্বজন যত মঙ্গলই করুক, সুপথে চালিত চিন্তাশক্তি মঙ্গল করে আরো বেশি।"

আর যদি ভেবে দেখ কত অসংখ্য চিন্তা প্রতিদিন ছড়িয়ে পড়ছে, তাহলে দেখতে পাবে তোমার কল্পনায় ফুটে উঠছে জটিল, চলমান, কম্পমান ও ভয়ঙ্কর এক চিত্র—বিভিন্ন পথ-গামী এই সকল রূপায়ণ সেখানে পরস্পর মুখোমুখী হয়, ধাক্কা খায়, সংগ্রাম করে, পরাভূত বা জয়ী হয় এতই ক্ষিপ্র এক স্পন্দমান গতিধারায় যে আমরা নিজেদের কাছে কদাচিৎ সে-ছবি ফুটিয়ে ধরতে পারি।

এখন তাহলে বুঝতে পার, প্যারিসের মত একটি শহরের মনোময় পরিবেশ কি হতে পারে যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক চিন্তা করছে আর কি সব চিন্তা! এই যে প্রচণ্ড ভিড় করা চলমান পুঞ্জ, এই যে ছাড়ানর অসাধ্য জট, এর ছবি নিজের কাছে ফুটিয়ে ধরতে পার। তবে দেখ, পরস্পরবিরোধী সব রকম প্রবণতা, সব রকম ইচ্ছা, সব রকমের অভিমত সত্ত্বেও এই স্পন্দনসমূহের মধ্যে গড়ে ওঠে এক ধরনের ঐক্য, একটা একরূপতা কারণ সবকিছুই, কয়েকটি সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া সবকিছুই প্রকট করে লালসা,—তার সকল রূপে, সকল দিকে, সকল স্তরে।

বিষয়ী লোক, যাদের লক্ষ্য শুধু স্থূল আমোদ-প্রমোদ ও চিত্তবিনোদন, তাদের সকল চিন্তাতেই লালসা ফুটে ওঠে।

প্রশংসা, খ্যাতি ও সম্মানের জন্য তৃষিত মননভ্রষ্ট বা শিল্পীদের সকল চিন্তাতেই প্রকাশ পায় লালসা।

আরও বেশি ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকামী শাসকশ্রেণী ও পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সকল চিন্তাতেই ফুটে ওঠে লালসা।

সকল কর্মজীবী ও শ্রমিক, সকল নিপীড়িত, হতভাগ্য, পদদলিত মানুষ, যারা সংগ্রাম করে চলেছে তাদের দুঃখের জীবনের উন্নতি সাধনকল্পে তাদের সকল চিন্তাতে ফুটে ওঠে লালসা।

আর সকলেই, ধনী বা গরীব, প্রবল কি দুর্বল, ভাগ্যমন্ত কি হতভাগ্য, বুদ্ধিমান কি নির্বোধ, জ্ঞানী বা অজ্ঞানী, সকলেই সোনা চায়, সর্বদাই যারো বেশি সোনা, তাদের মত লালসার পরিতৃপ্তির জন্য।

যদি কখনো এখানে ওখানে শুদ্ধ নিঃস্বার্থ চিন্তার, মঙ্গলকামী ইচ্ছার, অকপট সত্যৈষণার কোন স্ফুলিঙ্গ সহসা জ্বলে ওঠে, তখনি পিচ্ছিল পঙ্ক-সাগরের মত ধেয়ে আসা এই জড়স্রোত তাকে গ্রাস করে ফেলে।

তবুও আমাদের যেতে হবে নক্ষত্রের দীপমালা যারা একের পর এক আসবে আলোকিত করতে এই রাত্রিকে।

কিন্তু বর্তমানে আমরা তারই মধ্যে বাস করছি, তাই ভিতরে টেনে নিচ্ছি, কারণ স্থূল জড়ের ক্ষেত্রে যেমন তেমনি মনের ক্ষেত্রেও আমরা পরিবেশের সঙ্গে অবিরাম আদানপ্রদানে রত থাকি।

তোমাদের একথা বলার উদ্দেশ্য হল এই যে কি রকমে আমরা প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে সংক্রামিত হচ্ছি।

আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে বলতে পারে, সে কখনো লালসা অনুভব করেনি এবং আর কখনো করবে না? তাছাড়া, যে আবহাওয়ায় শ্বাস নিচ্ছি তা যখন লালসায় ভর-

পুর তখন কি করেই-বা লালসা অনুভব না করে পারা যাবে ? যেসব স্পন্দন আমরা গ্রহণ করি তা সকলই যখন বাসনায় গড়া, তখন কি করেই-বা রাশি রাশি বাসনা আবার মধ্যে জেগে উঠছে এ অনুভব না করে পারি ?...

আর তবুও যদি আমরা চাই যে আমাদের চিন্তা হোক বলকর ও ফলদায়ী, তাহলে আমাদের নিজেদেরকে এই দাসত্ব থেকে মুক্ত করতেই হবে।

এ তথ্যটির সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমেই তাহলে একটা ব্যবহারিক সিদ্ধান্তে আসা যাক : সবার প্রতি সবকিছুর প্রতি আমরা যেন অনুকূল মনোভাব রাখি কারণ প্রলোভন বড়ই প্রবল এবং মানুষী অজ্ঞানও বাস্তবিকই বিপুল পরিমাণের।

কিন্তু অন্যদের প্রতি যেমন আমাদের হতে হবে করুণাপূর্ণ ও সদাশয়, নিজেদের প্রতি তেমনি হতে হবে নিষ্করুণ ও কঠোর যেহেতু আমরা হয়ে উঠতে চাই অন্ধকারে আলো, রাত্রির বুকে মশাল।

কাজেই প্রাত্যহিক এই অশুদ্ধি সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করতে আমাদের শিখতে হবে।

সংক্রমণের বিপদ রয়েছে, এটি জানাই মুক্তির দিকে এক বিরাট পদক্ষেপ। তবে তাই যথেষ্ট নয়।

দুটি সম্ভাব্য বিজয় আমাদের লাভ করতে হবে একটি গোষ্ঠিগত, অপরটি ব্যষ্টিগত ; প্রথমটি বলা যায় ইতিবাচক, সক্রিয়, দ্বিতীয়টি নেতিবাচক, নিষ্ক্রিয়।

ইতিবাচক বিজয়টি লাভ করতে গেলে ভাবের বিরুদ্ধে ভাবের এক খোলাখুলি যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে, সংগ্রামে নিযুক্ত করতে হবে নিঃস্বার্থ, সমুচ্চ ও মহৎ সব চিন্তাকে স্বার্থপর, নীচ ও ইতর যত চিন্তার বিরুদ্ধে ; এ হল যেন সত্যকার হাতাহাতি, প্রতি মুহূর্তের লড়ালড়ি যার জন্য চাই যথেষ্ট মনের জোর ও স্বচ্ছদৃষ্টি। কারণ চিন্তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে প্রথমে তাদের স্বাগত জানিয়ে নিজের ভিতরে ঢুকতে দিতে হবে, স্বেচ্ছায় নিজেকে সংক্রামিত হতে দিতে হবে, নিজের ভিতরে অসুস্থতা টেনে নিতে হবে যাতে নিজেকে নিরাময় করার মধ্য দিয়ে এই মারাত্মক বীজাণু আরো ভালভাবে ধ্বংস করা যায়। এ হল এক সত্যকার যুদ্ধ যেখানে প্রতিমুহূর্তে মনের সাম্যাবস্থাকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, আর যুদ্ধের জন্য চাই যোদ্ধা সব। কাউকেই আমি এ-জিনিস অভ্যাস করতে বলব না। এ হল সেই ব্রতীদের স্বাধিকার যারা দীর্ঘকালব্যাপী এক কঠোর নিয়ম-সংযমের সহায়ে নিজেদের প্রস্তুত করে তুলেছে, এটা আমরা তাদের জন্যেই রেখে দেব।

আমরা খুশি থাকব যদি নিজেদের নির্বীজ রাখতে পারি যাতে করে সকল রকম সংক্রমণ থেকে আমরা রক্ষা পাব। আমাদের আশ্পৃহা হবে তাহলে ব্যষ্টিগত বিজয়লাভ, আর আমরা যদি তা লাভ করি তাহলে দেখব যে এইভাবে গোষ্ঠির জন্যে আমরা এতটাই করেছি যা প্রথমে আমরা ভাবতেই পারিনি।

এই বিজয় লাভ করতে হলে, আমাদের ঘিরে রয়েছে যে পরিবেশ তার বিপরীত এক মনোবৃত্তি আমাদের গড়ে তুলতে হবে নিজেদের মধ্যে। অল্পে অল্পে, দিনের পর দিন, আমাদের মস্তিষ্ককে ভরে তুলতে হবে সবচেয়ে উচ্চ, সবচেয়ে শুদ্ধ, সবচেয়ে নিঃস্বার্থ সেই সমস্ত চিন্তা দিয়ে যা আমাদের পক্ষে ধারণা করা সম্ভব ; আর আমাদের ধীর ও সতর্ক

যত্নের সহায়ে তাদের এতটাই প্রাণবন্ত করে তুলতে হবে যে বাইরে থেকে দুষ্ট চিন্তার কোন প্রলোভন এলেই তারা যেন আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে, তাদের সমুজ্জ্বল দীপ্তি নিয়ে দাঁড়ায় সেই ধূর্ত ছায়ার মুখোমুখী যা নিরন্তর ওত পেতে রয়েছে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে।

যে অগ্নি দিব্য মনীষার প্রতীক, যাকে প্রকাশ করা আমাদের কর্তব্য, এসো, সেই আদি বিশুদ্ধ অগ্নি আমাদের মধ্যে প্রজ্বলিত করি।

এ কাজ একদিনের নয়, এক মাসের নয়, এমনকি এক বছরেরও নয়। আমাদের চাইতে হবে, চাইতে হবে অধ্যবসায়ের সঙ্গে। তবে যেসব উপকার তা থেকে পাওয়া যায় তা জানতে পারলে, যে শান্তি যে পূর্ণ প্রসন্নতা ধীরে ধীরে, বাসনা থেকে উদ্ভূত আমাদের মধ্যেকার যত বিক্ষোভ, উদ্বেগ আর ভয়ের স্থান গ্রহণ করে, তা অনুভব করতে পারলে বিনা দ্বিধায় তুমি এই কাজে ব্রতী হয়ে যাবে।

তাছাড়া, শুদ্ধ ও শক্তিমান চিন্তারাজির এক সমন্বয় গড়ে তুললে তার ফলে যে শুধু আমরাই সুখী হব তা নয়। শিখা যত বেশি উজ্জ্বল যত বেশি উঁচু ততবেশি আলো ছড়ায় তার চারদিকে।

এই যে নক্ষত্র যাকে আমাদের ভিতর দিয়ে উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠতে দেব, সেটি তার দৃষ্টান্তে অনুরূপ নক্ষত্রদের ফুটে উঠতে সাহায্য করবে অন্ধকার ও অজ্ঞানই যে কেবল সংক্রামক তা নয়, সুখের বিষয়, আলোক আর জ্ঞানও হতে পারে সংক্রামক।

আরও, আমাদের সর্বোত্তম চিন্তাবলী সম্বন্ধে সচেতন থাকবার এই প্রয়াসই আমাদের বাধ্য করবে সেসবকে প্রতিনিয়ত পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা লাভ করতে। এই নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা লাভ করা যায় অল্পে অল্পে বিবিধ প্রক্রিয়ার সহায়ে, যার মোটামুটি বর্ণনা আমি তোমাদের দিয়েছি গত মাসে এই ভাষণের সূচনা পর্বে বিশ্লেষণ, মনন, ধ্যান, ইত্যাদি। আর যাঁরা তাঁদের মনের প্রভু হয়ে উঠতে পেরেছেন তাঁরা ইচ্ছামত তাঁদের বুদ্ধিশক্তির একটা বিশেষ অংশ বিকিরণ করতে পারেন, যেখানে তাঁরা ভাল মনে করেন সেখানে তা পাঠাতে পারেন সে-শক্তি সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন থেকেই।

এইসব বিকীর্ণ শক্তিদল হল সত্যকার বার্তাবহ; যেখানে কোন কারণে তোমার পক্ষে সশরীরে নিজে যাওয়া অসম্ভব, সেখানেই এরা তোমার পরিবর্তে স্থান গ্রহণ করবে।

এই সামর্থ্যের সুবিধাগুলি সহজেই তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সুকৌশলে চালিত স্বামী যে কোন চিন্তাই যেসব মস্তিষ্ক এখনো অন্ধকারে ঢাকা সেখানে চেতনার মধ্যে কিছুটা প্রজ্ঞার আলোকস্ফুরণ স্বাভাবিক টানের বশেই জাগিয়ে তুলতে পারে, আর এইভাবে তাদের চালিত করে নিত্যাগ্রসর বিবর্তনের পথযাত্রায়। কোন অসুস্থ লোকের নিরাময়ের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাণশক্তি তার দিকে টেনে আনবার ক্ষেত্রে এই চিন্তা মাধ্যম হিসাবে কাজ করতে পারে; সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারে প্রিয় বন্ধুর উপর, তার সমূহ বিপদ সব সরিয়ে দিতে পারে, মানস যোগাযোগের সহায়ে বা তার অন্তর্বোধের ভিতর দিয়ে তাকে সাবধান করেই হোক বা বিপদের হেতুর উপর সরাসরি ক্রিয়া করেই হোক।

দুঃখের বিষয়, বিপরীত পক্ষও সমান সত্য এবং কুচিন্তাবলীরও ক্রিয়াশক্তির অভাব নেই।

কল্পনাও করা যায় না, অশুভ চিন্তাসব গ্রহণ করে বা বাইরে ছড়িয়ে কি ক্ষতিই না আমরা করি,—ঘৃণা প্রতিশোধ পরশ্রীকাতরতা ও ঈর্ষা পরবশ এই যত চিন্তা, অমঙ্গল-কামী চিন্তা যত, যত নির্মম বিচার, যত সম্প্রদায়গত মূল্যায়ন...।

আমরা সকলেই জানি পরনিন্দা-পরচর্চায় কান দেওয়া বা তার পুনরাবৃত্তি করা কত ক্ষতিকর, কিন্তু গালগল্প থেকে বিরত হওয়াই যথেষ্ট নয়, এসব চিন্তা থেকেও বিরত হতে হবে।

আর, এর জন্য একটু মননই যথেষ্ট, কারণ আমরা সহজই বুঝতে পারব, আমাদের বিচার, আমাদের মূল্যায়ন সর্বদাই কি রকম হঠকারী।

বাস্তব ঘটনাবলী ও কৃতকর্ম প্রসঙ্গে কতবারই-না আমাদের নিজেদেরকে বলতে হয় যে সেসব স্বরূপতঃ ঠিক কেমন তা আমরা জানি না, আর, সে যাই হোক, এইসব কর্মরাজির পিছনে যেসব প্রেরণা, যেসব বিবিধ কারণ এদেরকে নিরূপিত করেছে, তারা প্রায় পুরো-পুরিই আমাদের নাগালের বাইরে রয়ে যায়।

আর দোষ-ত্রুটির কথা বলতে গেলে, আমরা কখনও যেন না ভুলি যে অন্যের মধ্যে যেসব দোষত্রুটি দেখে আমরা সবচেয়ে বিব্রত হই সাধারণতঃ সেগুলিই আমাদের নিজেদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রবল, আর, সে যাই হোক, আমাদের মধ্যে যদি সেসব দোষত্রুটির কোন বীজাণুই না থাকত তাহলে আমরা কোথাও তাদের দেখতে পেতাম না। তাছাড়া, যথার্থ দোষই-বা বলি কাকে? প্রায়শঃই তাহল একটি গুণের বিপরীত দিক, একটি সদ্‌গুণের অতিরিক্ত প্রাচুর্য যা কাজে লাগতে পারেনি, এমন কিছু যা তার যথাস্থানে নেই।

ব্যক্তিগতভাবে যেগুলি আমাদের আঘাত দেয়, সে-সম্বন্ধে আমাদের হতে হবে আরও বিচক্ষণ, এবং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পালন করে চলতে হবে একটি কঠোর নিয়ম: অন্যজন, সে যে-ই হোক না, তার জায়গায় যথাসম্ভব নৈর্ব্যক্তিকতার সঙ্গে নিজেকে আগে না বসিয়ে কখনও কিছু বিচার না করা, চেষ্টা করা সে যা অনুভব করেছে তা অনুভব করতে, যা দেখেছে তা দেখতে; আর যদি আমরা পুরোপুরি অকপট হই, তাহলে কতবারই-না দেখব আমাদের মূল্যায়ন হয়ে উঠেছে আরো কম কঠোর এবং আরো বেশি ন্যায়ধর্মী।

তাছাড়া, সাধারণভাবে, যার বিচার করতে চাই তাকে কোন্ আলোতে দেখব আমরা? কি হবে আমাদের মানদণ্ড? আমরা কি পরম প্রজ্ঞার, নিখুঁত ন্যায়ধর্মের অধিকারী বলে নিজেদের মনে করি যে নিঃসংশয়তার সঙ্গে বলতে পারব: এটা ভাল, ওটা মন্দ? আমরা কখনো যেন ভুলে না যাই যে আমাদের ভাল-মন্দের ধারণা পুরোপুরি আপেক্ষিক আর তা এতই অজ্ঞ যে, অন্যদের ব্যাপারে, প্রায়ই যে কাজ আমরা দোষের বলে দেখি, তাহল আমাদের নিজেদের জ্ঞানের চেয়েও অনেক বেশি মহত্তর জ্ঞানের পরিচায়ক।

সত্যকার বিজ্ঞান বিচার করে না বহুল-বিবিধ কার্য-কারণের পরিপ্রেক্ষিতে তা যথা-সাধ্য সঠিকভাবে বাহ্য ঘটনাবলীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলে; তা বলে, এটা ওটার নির্ধা-রক, "এটা" করবার আগে যা তুমি চাও তার সঙ্গে "ওটা" খাপ খায় কি না দেখে নাও। সে যাই হোক, ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমরা যদি এমন এক মানদণ্ডও গ্রহণ করতে পারি যা কম-বেশি আমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শের অনুরূপ—তার সবখানি তীব্রতা সবখানি ক্রোধোন্নত ভাস্বরতা নিয়ে, তবুও অন্যদের আছে এ-দাবি করবার আমাদের কোনই অধিকার

নেই যে আমাদের আপন আদর্শটি তাদের শিক্ষা করা উচিত, যদি-না আমরা জানি যে আমাদের আদর্শটি তাদের আদর্শের চেয়ে উচ্চতর ; কারণ সেক্ষেত্রে আমাদের পুরোপুরি নিঃসংশয় হতে হবে যে আমাদের আদর্শটি সব দিক দিয়েই পরম আদর্শের সঙ্গে, চরম আদর্শের সঙ্গে, বিশ্ব-পরিকল্পনার সঙ্গে অন্তরতম সারসত্তায় সমরূপ।

কিন্তু এরূপ লোকাতীত স্থিতি অর্জন করবার পূর্বে আমরা সর্বদাই স্মরণে রাখতে পারি যে, মানুষে মানুষে বিভেদের প্রধান কারণই হল তাদের দ্বারা ছড়িয়ে পড়ে যত দুষ্ট যত অনুদার চিন্তা ; এরাই তাদের মিলন প্রায় অসম্ভব করে তোলে, এমনকি তারা যখন তা সিদ্ধ করতে চায় তখনও।

স্থূল ক্রিয়াকর্মে যা অর্জন করতে আমরা নিরন্তর প্রয়াস করি, তাই আবার নিরন্তর বিঘ্নিত বা এমনকি ধ্বংস করে ফেলি আমাদের মানস-ক্রিয়ার ফলে।

অতএব, এস, আমরা সতর্ক দৃষ্টি রাখি আমাদের চিন্তাবলীর উপর, সুন্দর ও মহৎ সব চিন্তার পরিবেশ এক নিক্ষেপের জন্য গড়ে তুলতে প্রয়াসী হই আর তাহলেই পার্থিব সুসঙ্গতির আবির্ভাবলগ্ন ত্বরান্বিত করবার জন্য অনেক কিছু আমরা করে ফেলব।*

---

* বুলেটিন (এপ্রিল, '৭৭) হইতে অনূদিত। অনুবাদক শতদল

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

২১ জুলাই ১৯৫৪

গতবার কারা প্রশ্ন করেনি? প্রথম জন।

প্রশ্ন ("মা" বইটি থেকে) এতে লিখিত যে দিব্য সত্য আর আধ্যাত্মিক সত্য আর অতিমানস সত্য, এই তিনের মধ্যে কি তফাৎ?

উত্তর তুমি কি বলছ, স্পষ্ট করে শুনতে পেলে ভালো হয়।

(প্রশ্নকর্তা আরো জোরে চেঁচিয়ে প্রশ্নটি বললে)

উত্তর দিব্য সত্যের কথা?

প্রশ্ন আর আধ্যাত্মিক ও অতিমানস সত্য? তফাৎ কি?

উত্তর বেশি তফাৎ আছে মনে হয়না।

প্রশ্ন মধুময়ী মা এখানে "অকপট" বিশ্বাস কথাটার মানে কি?

উত্তর অকপট? মানে যা সহজ সরল আন্তরিক অকুণ্ঠ বিশ্বাস, যার মধ্যে কোনো দ্বিধা বা ফাঁকি নেই। ও কথা আমরা বলি সাধারণ শিশুদের সরল বিশ্বাসের বেলাতে, তার মধ্যে কোনো ফাঁকি নেই।

প্রশ্ন মধুময়ী মা, যতবারই আমরা ভুল কাজ করি ততবারই আমরা ভগবৎ কৃপাকে ঠেলে সরিয়ে দিই?

উত্তর অ্যাঁ? ভুল করলে কৃপা ফিরে যাওয়া? তা ভুল তো আছে দুই রকম। এক হলো অজ্ঞাতে অর্থাৎ না জেনে ভুল কিছু করা। ওতে তোমার ও কৃপার মাঝখানে পর্দার আড়াল পড়ে বটে, কিন্তু দোষটা হয়ে গেছে সে কথা না জেনে। যেমনি তুমি জানতে পারো যে কি ভুল করে ফেলেছ, অমনি সতর্ক হয়ে যাও যাতে পুনরায় আর তেমন না হয়। কারণ আবার তা হলেই আবার সেই কৃপার সামনে দেয়ালের আড়াল উঠবে। সুতরাং সাবধান হও।

ঐরকম অজ্ঞানে দোষ করা, আর জেনেশুনে দোষ করা, এই দুইএর মধ্যে বিস্তর তফাৎ। তেমন দোষকে বলা যায় তোমার সেটা একগুঁয়েমি, দোষ জেনেও করবো। ওর দায়িত্ব ও গুরুত্ব অনেক বেশি। চেতনা ওতে এত বেশি আচ্ছন্ন হয়ে যায় যে তখন আর দোষকে আর দোষ বলেই চিনতে পারো না। একটা ভুল কাজ করছ বলে আর মনেই হয় না। অপরাধকে অপরাধ বলে জ্ঞান হয় না। যে কাজটি সে করছে তার সমর্থনে এমন সব ন্যায়সঙ্গত যুক্তি এনে ফেলে যাতে মনে হয় যে ঠিক কাজ হচ্ছে, অন্যায় বলে বিশ্বাসই হয় না। এমন হলে তা খুবই মারাত্মক, কারণ তার সংশোধন করা অসম্ভব।

প্রশ্ন মা, গ্রহিষ্ণু হয়ে থাকা আর খোলা হয়ে থাকাতে কি তফাৎ?

উত্তর : সে কথা তো আগে বলা হয়ে গেছে, এর জবাব তো আগেই দিয়েছি। একই

জবাব দুবার ক'রে বলতে চাইনা। আমি চাই যে আমি যা বলে দিলাম সেটি স্মরণ রাখতে অভ্যাস করবে।

প্রশ্ন যা, "যে বিশ্বাস অহং সম্পর্কিত...উচ্চাকাঙ্ক্ষা দ্বারা মিশ্রিত ও দূষিত"—এর অর্থ কি?

উত্তর হাঁ, মনে করো কেউ একজন চাইছে যে সে একজন লোকমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে উঁচুদরের সাধু সন্ন্যাসী বা যোগী বলে আশপাশের সকলের কাছে সম্মান পাবে, তাহলে সেটি হলো উচ্চাকাঙ্ক্ষায় দূষিত বিশ্বাস। তুমি ভগবানকে ওতে বিশ্বাস করছ বটে, কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে তোমার ক্ষুদ্র অহমিকার ইচ্ছাপূরণের দাবি। তেমন বিশ্বাস বিশুদ্ধ বা খাঁটি ঐকান্তিক জিনিস নয়। তার মধ্যে তোমার নিজস্ব কিছু লাভ করার প্রশ্ন রইল। সেখানে নিজেকে সমর্পণের প্রশ্নই নেই কেবল রয়েছে যতটা সম্ভব নিজেরই শক্তি বাড়াবার চেষ্টা, অর্থাৎ ভগবৎ বিশ্বাসের যা প্রকৃত ক্রিয়া তার ঠিক উল্টা জিনিস। এই রকমের কাজই এত বেশি হয়ে থাকে যার সম্বন্ধে তোমাদের কোনো ধারণাই নেই। এই ধরণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে থাকে সত্তার খুবই গভীর স্থানে, আর তাই তোমাকে টানতে থাকে পিছন থেকে এমনি করে...চাবুক মেরে তার দিকে তোমাকে চালিয়ে নিয়ে যায় আর ওর মধ্যে থাকে প্রচ্ছন্ন একটা গর্বভাব।

প্রশ্ন মা, ভগবান যখন জানছেন যে তারা ঐকান্তিক নয়, তবুও তারা তাদের আকাঙ্খিত শক্তি লাভ করে কেন?

উত্তর তোমাকে বলি শোনো ছেলে, ভগবানের যা কর্মপদ্ধতি তা মানুষদের ধারণা-মাফিক নয়। এই কথাটি নিজের মাথার মধ্যে বিশেষ ক'রে ঢুকিয়ে রাখো। তিনি যা কিছু করেন তা সেই মানুষী বুদ্ধি অনুযায়ী হয় না যাকে আমরা ন্যায় যুক্তি বলে থাকি। যদিও তাঁর নিজের তরফের কোনো যুক্তি থাকে তা আমাদের এই যুক্তির মতো জিনিস নয়, অন্ততপক্ষে আমরা যাকে ন্যায়বিচার বলবো তেমন ধরণের নয়।

মনে করো, কেউ একজন ধনী হতে চেয়ে অন্য লোকেদের ঠকিয়ে পয়সা জমাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে তোমার বিচারে তার সম্পদ কেড়ে নিয়ে দরিদ্র ক'রে দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু বাস্তবের ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে তার উল্টো জিনিসই হচ্ছে। তবে সেটা দেখতে পাবে কেবল আপাতদৃষ্টিতে। তার পিছনে আরো কিছু থাকবে। যে সম্পদ সে পেয়েছে তা হতে পেরেছে অনেক কিছু সম্ভাবনার পরিবর্তে। অর্থই সে লাভ করেছে বটে কিন্তু বিবেক বলতে কিছু তার রইল না। আর এটাও দেখবে যে অর্থ থাকলেও সে তাতে সুখী নয়... যতই বেশি তার ধন বাড়ছে ততই বেশি সে অসুখী হচ্ছে। যে অর্থ সে পেয়েছে তার দ্বারাই মার খাচ্ছে।

বাহ্য সফলতা কিংবা বিফলতা দেখে কখনো যেন কিছু বিচার করতে যেও না। আমরা বলবো—যা বাস্তবিকই হয়ে থাকে—যে তুমি যেটা কামনা করলে তাই হয়তো ভগবান দিলেন, আর সেটা হলো তোমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। কারণ তোমার সে কামনা যদি হয় তামসিক, আত্মকেন্দ্রিক, অজ্ঞানপ্রযুক্ত, কামনা পূরণের দ্বারা সেগুলো আরো

বেশি বাড়বে, অর্থাৎ সত্যের আলো থেকে তোমাকে সরিয়ে সরিয়ে আরো বেশি তফাৎ ক'রে দেবে। ওতে ভগবানের থেকে তুমি অনেক সরে গেলে। সত্য চেতনা ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত হলে। ভগবানকে পাওয়া মানেই তাঁর সান্নিধ্য ও দিব্যচেতনা লাভ করা। যত বারই তুমি স্থূল বস্তুলাভের দিকে প্রচেষ্টা ও লক্ষ্য রাখো ততবারই তুমি বস্তু-সাফল্য পেয়েও আসল সাফল্য থেকে বঞ্চিত হও।

কিন্তু সত্যের পক্ষে অন্য সাফল্য পাওয়া তোমার বারাবর পরাজয়...সত্যের বদলে মিথ্যা পেলে।

কেবল বাইরের চেহারার জৌলুষে ভরা বাহ্য সাফল্য দেখে মুগ্ধ হওয়া হলো অজ্ঞানের ক্রিয়া। এমন কি যে লোকটি খুবই ধূর্তচিত্ত হয়ে সব রকম সাফল্য অর্জন করেছে, তারও একটা উল্টো পিঠ আছে। তার সেই কাঠিন্যের মেয়াল যতই পোক্ত ক'রে রাখুক, কোনো একদিন সে তার অন্তরের চেতনা ও সত্যের পীড়নে অস্থির হয়ে উঠবে। তার সেই বাহ্য সাফল্যের ক্ষতির রকম মূল্য তাকে দিতে হবে। (মায়ের কণ্ঠস্বর প্রগাঢ় হয়ে উঠল) এই সাফল্যকে অনাসক্ত ভাবে নিতে হলে খুবই মহৎ খুবই বিশুদ্ধ খুবই নির্লিপ্ত হওয়া ও উচ্চ আধ্যাত্মিক চেতনা লাভ করা দরকার। সাফল্যকে সইতে পারা খুবই কঠিন—বস্তুত সেইখানেই হবে তোমার জীবনের প্রকৃত পরীক্ষা।

সফল না হয়ে যখন তুমি বিফল হলে, তখন স্বভাবতই তুমি নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করো। আর যাদের মধ্যে চৈত্যের শিখা জেগেছে, তারা যদি প্রকৃতভাবে তৈরি হয়ে থাকে আর ভগবান চাইছেন তাদের সাফল্য দিতে, উন্নতির পথে অগ্রসর হতে যারা প্রস্তুত,—দেখা যায় যে কেবল তাদেরই উপরে যত আঘাতের পর আঘাত এসে পড়তে থাকে, কারণ বস্তুত ওতেই তাদেরকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করা হয়। সে সাহায্য সব চেয়ে তীব্র, সব চেয়ে প্রত্যক্ষ, আর সব চেয়ে উচ্চ ফলদায়ক। সফল হলে সতর্ক হবে, বলবে নিজেকে, "কী মূল্য দিয়ে, কোন দামের বিনিময়ে কিনেছি এই সাফল্য? আশা করি এই নয় সেই পদক্ষেপ..."

ঐ পরীক্ষা থেকে যারা উত্তীর্ণ হয়ে আপন আত্মার সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে, পুরোপুরি-ভাবে যারা সমর্পিত—যারা পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ, অনাসক্ত, কোনো কিছুর দ্বারাই প্রভাবিত ও স্পর্শিত হয়না, তাদের সম্পর্কে দেখা যাবে ভিন্ন ব্যবস্থা। সাফল্য মিলবে তার কিন্তু সেই সাফল্যকে বরদাস্ত ক'রে নেবার মতো উচ্চাবস্থা থাকা চাই। শেষ পরীক্ষারূপে এমন ব্যক্তিকে তিনি বলেন,—"এখন তুমি মহৎগুণ পেয়ে অহংশূন্য ও অনাসক্ত হয়েছ, এখন তুমি আমার, তোমাকে আমি তাই এবার বিজয়-সৌভাগ্য দিচ্ছি, দেখি তুমি সেটা ঠিক ভাবে নিতে ও রাখতে পারো কিনা।"

প্রশ্ন : ভগবানের শক্তি অসুরদের বিরুদ্ধে কি ভাবে কাজ করে?

উত্তর কিছুই শুনতে পেলাম না।...অসুরদের বিরুদ্ধে কাজ করে? তা জানতে চাও কেন?

প্রশ্ন : চিত্তাকর্ষক তা! (হাস্য)

উত্তর হয়তো ভগবানই তাদের সে শক্তি দিয়েছেন যারা চেয়েছে।...(নীরব থেকে)

আর সেই অসুরদের সমাপ্তিও ত্বরান্বিত হবে ওতেই। অসুর আছে রকম রকমের,... না, তা ঠিক নয়, অসুররা অসুরই আর তাদের থেকে পরে যারা জন্মায় এবং নিম্ন জাতের সত্তা আর যারা।

অসুরও একরূপ চেতনাসত্তা, সে জানে যে অস্তিত্ব তার চিরদিন থাকবে না। সে জানে যে বিশ্বের মধ্যে যে ভূমিকা নিয়ে কাজ করছে তারই ফলে তার ধ্বংস হবে। তবে মানুষের পরমায়ুর তুলনায় অসুরের পরমায়ু অনেক দীর্ঘ। তথাপি সে জানে যে যখন সে মূল শাশ্বতের আকর থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে তখন একদিন তার অস্তিত্ব ফুরোবেই। তাই সে তার শেষ নির্বাণের আগে নিজের কাজটা হাসিল করে তাড়াতাড়ি যথাসম্ভব পুরিয়ে নিতে চায়। আর সে ব্যগ্রতার ফলে তার পতন আরো তাড়াতাড়ি হবে। এই সব কারণেই দেখা যায় যে যখন তুমি কোনো বৃহৎ কাজে হাত লাগিয়েছ আর তা সফল হয়ে আসছে তখন এই সব বিরুদ্ধ শক্তিরা দুর্বার বিক্রমে উঠে পড়ে আক্রমণ করতে যেন তাদের ক্রিয়ার সুবিধার পক্ষে মুক্ত ভূমি পেয়েছে। এতেই বোঝা যায় তাদের কাল ফুরিয়ে এসেছে।

(অনেকক্ষণ নীরব থেকে) আর কিছু ?

প্রশ্ন মধুময়ী মা, মনের ঔদ্ধত্য কাকে বলা হয়েছে ?

উত্তর দেখ বাছা, সুস্পষ্টভাবে বলো। খুব চেঁচিয়ে বলা চাইনা, কিন্তু উচ্চারণ স্পষ্ট ক'রে বলবে।

(প্রশ্নটি আরো স্পষ্ট উচ্চারণে বলা হলো)

উত্তর মনের ঔদ্ধত্য ? তা তো...তোমাদের সকলেরই নিজের মধ্যে রয়েছে (হাস্য)

এমন কাউকে দেখি না যার মধ্যে ওটি নেই। কারো বা কম, কারো বা বেশি, কারো একদম পুরোপুরি...

মনের প্রকৃতিটাই এমনি একরোখা উদ্ধত। তার দৃঢ় ধারণা এই যে সে হলো সবজান্তা, সব কিছুরই সে বিচার করতে যায় আর বলে যে তার বিচারই সব চেয়ে সঠিক, নিজেকেও তার বিচার, আর অপরকেও, সকলকেই !

সম্প্রতিই একটা ব্যাপার হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দের একটি উক্তির যৌক্তিকতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ ক'রে একজন জানালে। কিন্তু আবার তার পরে সে বললে, "কিন্তু এ কথা আমরা যেন না ভুলি যে তাঁর বুদ্ধি আমার চেয়ে কম নয়।" (হাস্য) কেউ যখন অপরকে বিচার করতে যায় তখন যদি সে এই কথাটি মনে করে "ওরও বুদ্ধি আছে তা আমার চেয়ে কম নয়" তাহলে তারা কমই...

নিজেকে পর্যবেক্ষণ করতে অভ্যাস করবে, তাহলে দিনের মধ্যে একশোবার সেই মনটি ধরা পড়ে যাবে যে নিজেকে সবজান্তা ভাবছে, ভালোমন্দ সব কিছুর বিচারক ও বোদ্ধা হয়ে কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা, কোনটা ঠিক আর...তা ছাড়া কার কি করা উচিত ছিল, কোন সমস্যার কি মীমাংসা হওয়া উচিত...সবাই এমন ভাবে...শাসনের ও সৃষ্টি রক্ষার ভার যদি তার হাতে দেওয়া হয় তাহলে তার সমুচিত ব্যবস্থা সেই নিশ্চয় করতে পারবে... কিন্তু লোকে তা বোঝেনা...এই সব কথা !

নিজেকে যদি তুমি খুঁটিয়ে দেখ তাহলে নিজেই তখন নিজের কাছে ধরা পড়ে যাবে।...অবশ্য তাদের কথা বাদ দিচ্ছি যারা স্থির সিদ্ধান্ত করে রেখেছে যে ভগবান তাঁর সৃষ্টিতে যে সব বিশ্রী গাফিলতি করেছেন, তাদের হাতে ভার দিলে তারা সব কিছু শুধরে দিতে পারে। বুঝলে?

প্রশ্ন মা, ভগবৎ কৃপা লাভ করলে তখন বাধাবিপত্তিও কেমন ক'রে উন্নতির সহায়ক হতে পারবে?

উত্তর উন্নতির সুযোগ হওয়া? হ্যাঁ, সেটা তো হতেই পারে। মনে করো তুমি কিছু ভুল কাজ ক'রে খুবই মুশকিলে পড়েছ; তখন যদি তাঁর কৃপাতে পুরো বিশ্বাস থাকে ও নিভরতা থাকে তাহলে তখনই বুঝতে পারবে যে ওতে তোমার কিছু শিক্ষা পাওয়ার কাজ হচ্ছে, ঐ মুশকিলটি তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছে যে তোমার নিজের ভিতরেরই কোন দুর্বল জিনিসটা বদলাতে হবে, আর কৃপার প্রভাবে তা শীঘ্রই অপসারিতও হয়ে যাবে। এমনি ক'রে কিছু বিপত্তি এলে তাতে তোমাকে অনেকটা এগিয়ে দেয়। সর্বদাই তা হয়। শুধু পুরোপুরি ভাবে তোমার ঐকান্তিক হয়ে থাকা চাই, আর কৃপার উপর পুরো আস্থা রাখা চাই, যাতে তা নির্বিঘ্নে তার কাজ সফল করতে পারে এমন জটিলতা না হয় যে ভিতরে কেবল একটা অংশ তাই চাইছে আর অন্য অংশ বাধা দিচ্ছে...তাতেই মুশকিল বাধে।

সে সর্ববাই এই কথা বলে চলেছে ঐকান্তিক, অকপট ও খাঁটিভাবে। কারণ এক অংশ আশ্বস্ত করে, সান্ত্বনা করে, আর এক অংশ তেমনি আছে—অন্যান্য ছোটো বড়ো অংশগুলি তলার দিকে তলিয়ে থেকে গোপনে ও নিঃশব্দে থেকে অনবরতই বাধা দিয়ে চলেছে। তারা চাইছে যে তোমার মধ্যে অমন কোনো যেন পরিবর্তন না আসে। তাই তুমি ভাবো,—"হায় রে, আমি এত ঐকান্তিক আশ্বস্ত নিয়ে ভালো হতে চাইলাম, কিন্তু কিছুই তো হলো না।" কেন, কেন? আর একগুঁয়ে মনটা তাতে সায় দিয়ে বলে, "এত কিছু করেও যখন সাড়া পেলাম না, ভগবৎ কৃপা গ্রাহ্যই করলে না, একলা আমাকে ঠেলে দিলে" ইত্যাদি।

কিন্তু তাই তো ঠিক কথা নয়। তোমার ভিতরকার সেই সামান্য বেয়াড়া অংশটুকু যেন বাক্সের ভিতরে তলায় গুঁজে থাকা গুপ্ত আবর্জনার মতো দুমড়ে গুটিয়ে থেকে প্রতিবন্ধকতার কাজ করছে সেই অমন কিছু আশাভঙ্গের কথা বলছে। (মা কণ্ঠস্বরকে আরো নরম করে বললেন) সেই জন্যেই বলছি যে তোমার আশ্বস্ত ও আগ্রহ যখন কিছু শিথিল হয় তখনই জেনো যে ঐসব অংশ বাধা চাড়া দেয় আর ধীরে ধীরে তার প্রভাব বাড়িয়ে তুমি যা করতে চাওনা তাই তোমাকে দিয়ে করিয়ে নিতে থাকে—তুমি জানতেও পারোনা যে কখন কেমন করে তা হতে পারল। কিন্তু আসল কারণ আর কিছু নয়, সেই লুকনো বিরোধী অংশই সুযোগ পেয়ে জীবনের ছোট-বড় খুঁটিনাটি সকল বিষয়ে, জীবনলক্ষ্যের উপর কর্তৃত্ব খাটাচ্ছে।

এমন লোকও অনেক রয়েছে যারা সুস্পষ্টভাবে সব কিছু জেনে বুঝে এবং দেখেশুনেও কোনো কিছু বিহিত করতে পারেনা। আগের থেকে সব জানা থাকলেও কিছু প্রতিকার করা যায় না কেন? তার আসল কারণ ঐ বাঁকা অংশটি যা কোনো পরিবর্তন চাইছেনা,

আর নিজের মনোমত সুযোগকালের জন্য অপেক্ষা করে ওৎ পেতে আছে। ক্লান্তি শ্রান্তি, সুপ্তি, জড়তার মধ্যে যখন শৈথিল্যের জন্য ফাঁকটুকু মিলে যাবে, তখনই সে নিজ-মূর্তিতে প্রকাশ পেয়ে পূর্ণশক্তিতে কাজ করবে, আর তোমাকে দিয়ে তাই বলাবে যা তুমি চাওনা বলতে, তোমাকে দিয়ে কাজে ও চিন্তাতে তাই করাতে থাকবে যা তোমার ইচ্ছা ও পূর্বসংকল্পের ঠিক উল্টো জিনিস। আর তখন তুমি হতাশ হয়ে বলবে,—"হায় কি বিড়ম্বনা।" আবার কেউ বা বলবে "দুর্ভাগ্য"। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেখানে ভাগ্য দায়ী নয়, নিজেরাই ওর জন্য দায়ী। ...ওদের মধ্যে সেই আলোর বর্তিকা নেই, সেই আলোকে যথাস্থানে নিক্ষেপ করতে পারেনি। সত্তার ভিতরকার আনাচে কানাচে কোনো আলো ফেলে দেখেনি যে কোথায় কি বাধা গুঁজে রয়েছে। বরং সেই দিক থেকে অন্যদিকে ঘাড় ফিরিয়ে নিয়েছে (মা অনুরূপ ভঙ্গী করলেন)...এক একবার হঠাৎ "ঝপ্" করে যেন সে দোষটা ধরি ধরি হয়...অমনি বুকে একটা ব্যথা টন্‌টন্ করে ওঠে...আর কষ্ট পাচ্ছে দেখে মনকে তারা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়। সুযোগ এসেছিল, চলে গেল। আবার অন্য সুযোগ আসার অপেক্ষা করতে হবে। যখন আবার সুযোগ পেয়ে তার লেজটা বা কানটা বা নাকটা চেপে ধরবে তখন বলবে—"না, আর তোমাকে লুকিয়ে থাকতে দিচ্ছি না, চিনে ফেলেছি তোমাকে, হয় তুমি বিদেয় হও আর নয়তো বদ্‌লে যাও"।

এই দৃঢ়সংকল্পটিকে জোর করে আঁকড়ে থাকা চাই। সেই জাপানী সৈনিকের গল্পের মতো, যে হাঁটুতে ছুরি গেঁথে রাখতো যাতে ঘুমিয়ে না পড়ে...আর সে যখন দেখলে যে তবুও তার ঘুম আসছে তখন ছুরিটা আরো জোরে বিঁধিয়ে দিলে আরো বেশি ব্যথা পেতে, এমনি হওয়া চাই মনোভাব, যাকে বলে অটল স্থির সংকল্প। তুমি নির্দিষ্ট ভাবে জানবে কি করা চাই, আর নিশ্চিত ভাবে তাই করবে। এ হলো ঠিক কথা।

প্রশ্ন মা, আমি কি একটা প্রশ্ন করতে পারি?
উত্তর করো।

প্রশ্ন আপনি যে সেদিন বললেন কোন্‌সময়ে "রূপান্তর" নামের ফুলগুলি আপনি গুণে রাখতেন। তার অর্থ কতগুলি লোককে রূপান্তর দেওয়া হবে? অর্থটা আমি বুঝিনি।

উত্তর (কিছুক্ষণ নীরবে থেকে) ঐ সংখ্যার ব্যাপারটা নির্ভর করে আমি আগের থেকে কি ঠিক করি তারই উপরে। একদিন এক রকম, অন্যদিন অন্য রকম... একদিন হয়তো কেবল উপাদানগুলি কিংবা দেহকোষগুলি...কোনোদিন বা ব্যক্তিতে। যখন যেমন সম্ভাবনা দেখেছি আর সেই অনুযায়ী যখন যেমন ব্যবস্থা রেখেছি গোপার আগে।

কাউকে যখন নির্দিষ্ট সংখ্যার ফুল দিয়েছি তখন বলেছি, "তোমার সত্তার ভিতরকার এতগুলি ক্রিয়ার ও এতগুলি অংশের রূপান্তর হতে পারে।" কিন্তু আবার অন্য কোন লোককে বলতে চেয়েছি, "তোমার দ্বারা এতগুলি লোকের রূপান্তর এনে দেবার শক্তি আসুক।" সুতরাং দেখতে পাচ্ছ সকলের বেলাতেই একরকম কথা নয়। কিন্তু তবু সকল ক্ষেত্রেই সেই একই রূপান্তর সম্পর্কে প্রয়াস। হতে পারে তা ইচ্ছার রূপান্তর, কর্মের রূপান্তর, বস্তু-

সত্তার রূপান্তর বা তোমার গোটা সবটারই রূপান্তর...হয়তো বিশ্বের মধ্যে ঐ আকাশের তারাগুলিরও রূপান্তর...কত কিছুরই হতে পারে, নির্ভর করে যেমন যেমন লোক।

প্রশ্ন : মা, যখন কোনো মানুষের বেলাতে রূপান্তর ইচ্ছা করেন তখন কি তার সামগ্রিক সর্বাঙ্গীন রূপান্তর চান?

উত্তর : কখনো কখনো। আর প্রায়ই সেখানে অন্যরকম ফলেরও যোগ থাকে। কেউ হয়ত অন্যান্য দিক ছেড়ে কেবল বিশেষ একটা দিকেই খুব ভালো হলো। তাই সেই ভাবেই ফল নির্বাচন ও বন্টন করলাম যাতে...আর তাতে তার সর্বাঙ্গীন রূপান্তর আসুক বলা হলো। কিন্তু...

সময়ের দিকের প্রশ্নটাই কঠিন, সেখানেই যত বাধা জন্মায়। সব চেয়ে কঠিন কাজ হলো সময়কে বশ করতে পারা। তাই এক বছর লাগবে কি একশ বছর, তা বলা যায় না। ফলের মধ্যে সময়ের ঠিক পরিমাণ নির্দেশ দেবার সুযোগ আমি পাইনি, হয়তো তা সম্ভব নয়। হয়তো কোনো কালে তাও হতে পারে, কিন্তু আপাতত তা সহজগম্য জিনিস নয়।

প্রশ্ন : মধুময়ী মা, আপনি বললেন "তারাগুলিরও রূপান্তর"?

উত্তর : হাঁ, তার অর্থ জানতে চাও? কী তোমার প্রশ্ন? তারাগুলিরও রূপান্তরের কথা বলেছিলাম...তা সমগ্র বিশ্বের রূপান্তর হলে তখন ওদেরও তো হবে! কেবল পৃথিবীতেই রূপান্তর হবে, এমন কথা ভাবছো কেন?

প্রশ্ন : মা, এখানে এমন কয়েকজন থাকতো যাদের ছিল তীব্র আত্মস্পৃহা, কিন্তু তবুও তারা কোন কোন না কারণে বিদ্রোহ করছে এবং এখান থেকে ছেড়ে চলে গেছে। তারা কি আবার ফিরে আসবে?

উত্তর : আবার তাদের ফিরে আসা? (মা অনিশ্চিতের ভঙ্গী করলেন) ব্যক্তিগতভাবে এটুকু বলতে পারি—

অনেক কিছুর উপর তা নির্ভর করে...এই রকমে বলতে পারি প্রথমত—গীতাতেও এমন প্রশ্ন রয়েছে; আসুরিক সত্তারা হয় দুই রকমের। এক রকম আছে যাদের ধর্মান্তর হতে পারে এবং তা হবে, কোন বিরল মুহূর্তে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো যখন তারা নিজেরাও বোধ করবে রূপান্তরের সম্ভাবনা। আর বাকি যারা তারা নিশ্চিত জানে যে তারা বদলাবেনা, এইভাবেই থাকতে থাকতে একদিন তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত বিলীন হবে। সুতরাং যারা বিলোপ চায় তারা বিলুপ্ত হবে, আর যারা রূপান্তরিত হতে চায় তাদের বেলাতে তাই হবে। জীবনের ক্ষেত্রে এই রকমই হয়।

ওর মধ্যে কেউ বা মারা যায়, আর কেউবা আবার ফিরে আসে। তা একরকম জানা, একরকম ধারণাই থাকে। সুতরাং নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে ওরা মরবে। মরা মানে দেহ-ত্যাগ নয়, অর্থাৎ মরে যাওয়ার মানে এস্থলে এই যে তারা তাদের আত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। যান্ত্রিক জীবন ঠিকই থাকতে পারে—একটু আগে তো বলেছি—সে জীবনের মধ্যে তথাকথিত সাফল্যও মিলতে পারে, স্থূল জীবনের দিক থেকে যে অসুখী হবে এমন কথাও

নয়, বরং সেই সব দিক দিয়ে সুখীই হবে। আবার অন্যপক্ষে ওদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে যারা ভগবৎ কৃপার স্পর্শ পেয়েছে, তারা অসীম দুর্গতি ভুগতে ভুগতে শেষে বুঝতে পারে যে কতটা বোকামির কাজ তারা করেছে, আর এরাই আবার পরে ফিরে আসে।... বস্তুত এই সব জিনিস ব্যক্তি-বিশেষের উপর নির্ভর করে। যারা বাহ্য সাফল্যই পায়, তার মানে তারা এদিক থেকে বঞ্চিত ও বর্জিত; আর যারা সেদিকে সফল হলোনা, তার মানে ভগবানের কৃপা তাদের ত্যাগ করেনি।

কিন্তু প্রকৃত পার্থক্য ঘটে মৃত্যুর পরে। জীবনকালে যারা বিরোধী অদিব্য শক্তিকে সম্মতি দিয়ে তারই অধিকারে ছিল, মৃত্যুর পরে তারা পুরোপুরি ভাবেই সেই শক্তির দ্বারা কবলিত হয়। ইতিপূর্বেই তাদের চৈত্যসত্তা বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তাই তাদের চৈত্যপুরুষ অন্য জগতে দূরে কোথাও চলে গিয়েছে...অবশিষ্ট প্রাণসত্তাকে—যা এই সব শক্তির আধার—দেহচ্যুত হলে তখন বিরোধীশক্তি একেবারেই গ্রাস করে। মৃত্যুই হয় শেষ পরিণতি। জগতের কোনো শুভ পরিবর্তনের কাজে তারা লাগেনা।

প্রশ্ন মধুময়ী মা কিসে তাদের গ্রাস করে নেয়?

উত্তর ওর প্রাণশক্তির চেয়েও যে প্রাণশক্তি অনেক বড়ো তাতেই তাকে গ্রাস করে (হাস্য)। বিরোধী শক্তিদের অনেকরকম বিভূতি আছে তারাই সে ব্যক্তিকে দখল করে তার ইচ্ছামত কাজ করিয়ে নেয়,—তার বাস্তব জীবনে, কিন্তু যখন দেহত্যাগ ঘটে তখন তো সে প্রয়োজনই রইল না...সে প্রয়োজন ছিল সেই দেহীকে দিয়েই ভগবানের বিরোধিতা করবার জন্য। দেহ ত্যাগ হয়ে গেলে সেই বিরোধী শক্তিও তাকে পরিত্যাগ করে তখন তার প্রাণসত্তাকে গ্রাস করা হয়ে থাকে, আবার কখনো তেমনি রকমের কাজ করানোর সুযোগের আশায়।

বিরোধী শক্তিদের কাজই হলো তাই। নিজেদের শক্তিকে তারা ইচ্ছামত বাড়িয়ে দেয় আবার গুটিয়ে নেয়, মৃত্যু না আসা পর্যন্ত তাই চলতে থাকে এবং তাতে মৃত্যুও ত্বরান্বিত হয়। মৃত্যুর পরে সেই সত্তাকে তারা ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো ত্যাগ করে যায়। এই হয়। এতে তাদের উন্মাদ করে তোলে। অপঘাতে মৃত্যু ঘটলে, যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু, তখন অমনি খপ্ ক'রে তাকে গ্রাস ক'রে ফেলে, পরবর্তী সুযোগের প্রত্যাশায়। কেবল লক্ষ্য থাকে কে কখন তাদের দখলীকৃত হবার উপযোগী হয়ে খোলা অবস্থাতে রয়েছে, আর তখনই তাকে কবলিত করে।...আর কবলিত ব্যক্তি তখন ভাবে সে নিশ্চয় একজন খুব মস্ত লোক; কারণ সেই মনোভাবই তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তাই নিজেকে সর্বদা মনে করতে থাকে যে সে হলো অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন একজন বিশিষ্ট কেউ। তাই তার সেই প্রখর বিচারশক্তি নিয়ে দেখতে শুরু করে কোথায় কি দোষত্রুটি আছে যা আর কারো নজরে পড়ে না তারা তাই ভগবানের সৃষ্টির ব্যবস্থাতে পর্যন্ত অন্যায় জেনে তার সংশোধন ঘটাতে চায়।

এই ধরনের লোক আমার কাছে এসেছে যারা মুহূর্তের জন্য আন্তরিক ভাবাপন্ন হয়ে সেই বিরোধীশক্তির কবলমুক্ত হতে চেয়েছে। সেই আন্তরিকতার জোরে তখন বিরোধীশক্তিরা তাদের ছেড়ে দিয়েছে, তাতে তাদের প্রাণের কোনো ক্ষতি না করেও সেসবকে ধরে নষ্ট

করা গেছে। এমনি তার কিছুদিন বেশ আনন্দে কেটেছে, মুক্ত ও দীপ্তিপ্রাপ্ত বোধ করেছে,...কিন্তু তার কিছুদিন পরেই বলতে শুরু করেছে, "কিন্তু আমার তো আর কোনো শক্তি রইল না, কিছুই তো আর করতে পারি না, অতি সাধারণ লোকের মতো হয়ে গেছি। এর আগে তো বরং অনেক ভালো ছিল।" আর ওদিকে হাজার হাজার বিরোধী শক্তি এমনি ফাঁক পেয়ে ঢুকে পড়ে, আর সেই পূর্বাবস্থা ফিরে আসে। আরো বেশি জোরে তাদের মজার খেলা শুরু হয়।

কিন্তু আমি বলি যে আর নয়, ভালো একবারই, থাক না কেন তোমার সঙ্গে ঐ ক্ষুদ্র বিরোধী শক্তি: তুমি ওতে অতিরিক্ত আসক্ত। কাজ এখানে নিরর্থক। কিন্তু ঐ যে মনোভাব আসা যে হঠাৎ তুমি শক্তিহারা হলে পরিত্যক্ত হলে, ওটাই বিপজ্জনক। যাদের বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে, বিশেষ করে যারা চায় শক্তি, যারা চায় অন্যের উপর দাপট, যারা হতে চায় গুরু ওস্তাদ ভোজবাজির খেলোয়াড়, চায় অলৌকিক শক্তি...তাদেরই হয় এই পরিণতি।

সব চেয়ে ভাল হলো সহজ সরল মনোভাব রেখে যার যতটুকু সাধ্য করা, বৃহৎ কিছু করবো এ ইচ্ছা না রেখে সহজ আস্পৃহা রেখে ধীরে ধীরে আলোর দিকে এগোতে থাকা, আর পরমতম শক্তির হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে এই কামনা করা যে তিনিই তোমাকে দিয়ে যা করাবেন তাই তুমি করবে—দেখবে তখন আর দুশ্চিন্তা নেই, ওতেই তুমি সব চেয়ে বেশি আনন্দ লাভ করবে।

এই হলো সার কথা।*

—শ্রীমা

---

* Bulletin of S.A.I.C.E. থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

সোলঝেনিৎশিনের চারটি কবিতা

সমীরকান্ত গুপ্ত

রাত্তিরে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল আর এখন কালো মেঘের দল আকাশ পার হয়ে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির হাল্কা আবরণ নামিয়ে।

ফুলভারাক্রান্ত আপেলগাছের তলায় দাঁড়াই এবং নিঃশ্বাস নিই। শুধু আপেলগাছটিই নয়, তার চারদিকের বাসও আর্দ্রতায় ঝলমল করছে আকাশে বাতাসে যে সুগন্ধি ছড়িয়ে আছে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। যত পারি প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিই, আর সে সুরভি ছড়িয়ে গেল আমার সর্বসত্তায় চোখ খুলে নিঃশ্বাস নিই, চোখ বন্ধ করে নিঃশ্বাস নিই—বলতে পারব না কোনটাতে পাই বেশি আনন্দ।

আমার বিশ্বাস এইটেই সবচেয়ে মূল্যবান স্বাধীনতা যা কারাগার আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয় অবাধে নিঃশ্বাস নেবার স্বাধীনতা, যা এখন আমি পাচ্ছি। পৃথিবীর কোন আশ্চার্য, কোনো সুরা, কোন রমণীর চুম্বন এই ফুল, আর্দ্রতা ও সজীবতায় অভিসিঞ্চিত হৃদয়ের চেয়ে আমার কাছে মধুরতর নয়।

হোক না এটা ছোইট বাগান, চিড়িয়াখানার খাঁচার মতো পাঁচতলা বাড়ি দিয়ে চতুর্দিক ঘেরা। এখানে কানে আসে না মোটরসাইকেলের অনুৎক্ষিপ্ত ভট্‌ভট্ শব্দ, রেডিয়োর গোঙানি, লাউডস্পিকারের হল্লা। ততদিন এক পশলা বিষ্টির পরে আপেলগাছের তলায় নিঃশ্বাসে ভরে নেবার জন্য আছে টাটকা বায়ু ততদিন আরো একটু বাঁচতে পারব ভরসা আছে।

(নিঃশ্বাসের স্বাধীনতা)

আলানিকাঠ চিবচ্ছিলাম আমরা এমন সময়ে একটা এল্‌ম্‌গাছের গুঁড়ি পেয়ে বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলাম। পুরো একটি বছর আগে কেটেছিলাম গাছটা, ট্রাকটরে বেঁধে টেনে এনেছিলাম, তারপরে ঠেলে দিয়েছিলাম তেলা আর ওয়াগনের মধ্যে, গাদা করে, শেষে মাটিতে স্তূপীকৃত জমা রেখে—অথচ এই এল্‌ম্‌গাছ এখনো হাল ছাড়েনি। এর গায়ে নতুন সবুজ অঙ্কুরোদ্‌গম হয়েছে যার অর্থ একটি ঝাঁকড়া সপত্র শাখা কিংবা একটা রীতিমতো নূতন এল্‌ম্ গাছেরই সম্ভাবনা।

গুঁড়িটা কাঠগড়ায় চাপালাম, ঘাতকের মঞ্চের ওপরে যেন, কিন্তু এর গায়ে করাতের দাঁত বসাতে মন সরল না। কী করেই বা পারতাম? আমাদের মতোই দারুখণ্ড একান্ত ক'রে বাঁচতে চেয়েছিল; বস্তুতঃ এর বাঁচবার আগ্রহ আমাদের চেয়েও বেশি তীব্র ছিল।

(এল্‌ম্‌গাছের গুঁড়িকাঠ)

আমাদের বাড়ীর পেছন দিকের উঠানে একটি বালক তার কুকুর শারিককে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখে—একদলা তুলো, ছোটবেলা থেকেই যেমন বাঁধা।

একদিন তার কাছে আমি নিয়ে গেলাম মুরগীর হাড় কিছু—তখনো বেশ গরম আর গায়ে ভুরভুর। বালকটি সবে কুকুরটাকে খুলে দিয়েছে চক্করে একপাক ছুটতে। সেখানে বরফ পড়েছে গভীর এবং পালকের মতো নরম; শারিক চতৌপাটি করছিল খরগোশের মতো, প্রথমে পেছনের এবং পরে সামনের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে লাফিয়ে, উঠোনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত, এধার ওধার, বরফের মধ্যে নাকমুখ ডুবিয়ে।

সে ছুটে এল আমার দিকে, তার সারা গা এলোমেলো, লাফিয়ে উঠল আমার দিকে, ভুঁকে দেখল হাড়ক'খানি—পরক্ষণে ছুটে পালাল আবার, বরফের মধ্যে উদর পর্যন্ত চেপে বসে।

চাই না তোমার ওই হাড় ক'খানি, সে বলল। আমায় শুধু দাও আমার স্বাধীনতা...

(কুকুর ছানা)

ফুলে হলুদ হাঁসের একটি ছানা, হাস্যকরভাবে ভিজে ঘাসের ওপর সাদা পেট তর দিয়ে—দুর্বল পায়ে দাঁড়াবার সামর্থ্য তার প্রায় নেই—চটপট আমার সামনে এসে ডাকল পঁ্যাক পঁ্যাক "আমার মা কোথায়? কোথায় আমার আত্মীয়স্বজন?"

ওর মা নেই, ও পালিত হয়েছে মুরগীর কাছে হাঁসের ডিম তার বাসায় রাখা হয়েছিল, সেসবে তা দিয়ে নিজের ডিমের সঙ্গে সে ফুটিয়েছে। আবহাওয়ার দুর্যোগ থেকে রক্ষার জন্য তাদের বাসাটি উপুড়করা একটি ঝুড়ি—সরিয়ে নেওয়া হয়েছে একটা চালার আশ্রয়ে, ঢেকে দেওয়া হয়েছে চট দিয়ে। সবাই সেখানে, শুধু এইটিই হারিয়ে গেছে। এসো তাহলে, কুটিমণি, আমার হাতে তুলে নিই তোমাকে।

একে বাঁচিয়ে রেখেছে কোন বস্তু? এর ওজন কিছুই না; দানার মতো এর ছোট্ট কালো দুটি চোখ, চড়ুইপাখির পায়ের মতো পা দু'খানি, একটু জোরে টিপলেই গলে মিলিয়ে যাবে। তবু এ প্রাণের প্রবাহে উষ্ণ। ঠোঁটটা হাল্কা গোলাপী, একটু চাপ্টা, আঙুলে রঞ্জিত নখের মতো। দুটি পায়ের পাতা ইতিমধ্যেই জড়ানো থাবা, পালকের মধ্যে মধ্যে হলুদ রং, পালকযুক্ত ডানাজোড়া ঠেলে বেরুতে উদ্যত। বৈশাত্রের ভাইদের থেকে একে এর ব্যক্তিত্ব এখনই আলাদা করে ফেলেছে।

আর আমরা মানুষরা অচিরে উড়ে যাব গুরুগ্রহে; যদি আমাদের যাবতীয় উদ্যম একত্র করি তাহলে সারা পৃথিবী কুড়ি মিনিটে হলকর্ষিত করে ফেলতে পারি।

তবু, আমাদের সব আণবিক শক্তি সত্ত্বেও কোনো টেষ্টটিউবে এই হলুদ হাঁসছানার ক্ষীণ পুঁচকে কখনো বানাতে পারব না—কখখনো না! সব কটি হাড় আর পালক দেওয়া হলেও সেসব দিয়ে কোনোকালে এমন জীব তৈরী করতে পারব না।

(হাঁস ছানা)

মন্তব্য। সোলঝেনিৎসিনের কবিচিত্তে বা শিল্পীচেতনায় দু'টি মুখ্য বৃত্তি, দুটি ভাব সহজেই লক্ষনীয়। এক হল তাঁর দেশপ্রেম, তাঁর স্বকীয়ভাবে দেশকে ভালোবাসার অধিকার—কোনো দলনির্দিষ্ট বা মতবাদ প্ররোচিত ভঙ্গিতে নয়; অন্যটি হল, প্রায় এর পরিপূরক হিসাবে, ব্যক্তিস্বাধীনতা—আপন অন্তরে সত্যোপলব্ধির নিরপেক্ষ ও নির্বিঘ্ন অধিকার।

বলাবাহুল্য স্বদেশে এই অন্তরোপলব্ধির অনুকূল পরিবেশ লাভ তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি। তিনি সায় দিতে পারেন নি তাঁর অন্তরের রূপবোধ ও ভাবনিবেদন বহুমতের সমর্থন নিয়ে চলবে এই তত্ত্বে মানুষের অন্তরাত্মা হবে একটা ছকে বাঁধা, এই সিদ্ধান্তে। মতস্বাতন্ত্র্যের ব্যক্তিবাহাদুরের জন্য ধ্বজা তুলে লাভ হল তাঁর লাঞ্ছনা—অভিমানে দুঃখে সত্যপ্রকাশের দায়িত্বে দেশান্তরী হলেন তিনি, এই পদক্ষেপ নিতেও হৃদয় তাঁর চূর্ণ হয়েছে।

অথচ তাঁর শিল্পে তিক্ততার প্রশ্রয় নেই, অভিযোগের উচ্চকণ্ঠ নেই—যদিও প্রতিবাদ আছে, তা প্রায় মৃদুস্বরে বজ্রের ঘোষণা ধরে দেবার মতো (Cancer ward)। বস্তুত তাঁর রচনার প্রধান গুণ সারল্য ও মাধুর্য, একটা উদার প্রসাদের আবহাওয়া। এটি সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে নিবিড় দুঃখের অশ্রুতে ধুয়ে মুছে গিয়েছে তাঁর অন্তরের গ্লানি—তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন চেতনার এক পদবীতে যেখানে সামরস্য তাঁর অন্তরঙ্গ প্রাচীন গ্রীসের Katharsis অনুরূপ রসায়ন বা চিত্তরূপান্তরের তত্ত্ব ও রহস্য। এই যে 'আলকেমি' (alchemy) অপূর্ব রসনায়ণ যা দুঃখমন্থন থেকে অমৃত তুলে আনে তারও মূলে অন্তরাত্মার সাক্ষাৎ স্পর্শ ও দর্শন। সোলঝেনিৎসিন আত্মা-রসের রসিক হয়েছিলেন তা তাঁর রচনার বহুবিস্তার ও আলোকবিচ্ছুরণ থেকেই প্রত্যক্ষ হয়—ওই দুটি জিনিসই বাহিরে অন্তরাত্মার পরিচয় ধরে—প্রসঙ্গান্তরে ম্যাথু আর্ণল্ডও যেমন বলেছিলেন "sweetness and light"-এর কথা। সেই সংস্কৃতি অন্তরাত্মারই প্রতিফলন। আর অন্তরাত্মাকে ধরা যায়, তাতে পৌঁছান যায় হৃদয়ের পথ দিয়েই—সাধক মহাজনরা বলেছেন হৃদয়ের পিছনে বা হৃদয়ের ভিতরেই আত্মার নিবাস বা স্থিতি। এই হৃদয়ের উচ্চতা আন্তরিকতা সংবেদন তাঁর রচনা জুড়ে রয়েছে।

রুষভাষীরা বলেন তাঁর শিল্প রুশের সবুজ অসীম প্রান্তরের মতো—মুক্ত নিসর্গের মতো, মৃত্তিকাস্পর্শী কিন্তু আকাশমুখী।

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field
Sreepore Bagharghole
P.O. Bonhooghly, 24 Parganas

Head Office :
34: 1, Puddapukur Road
Calcutta-20

Phone 47-2869

With the best Compliments from :—

Ellora Enterprise

Paper & Board Merchants

57/2A, College Street
Calcutta-12

Phone: 34-3720

Our Homage to Sri Aurobindo and The Mother

Mitra Engineering & Construction Co.

(ENGINEERS OF REPUTE)

Phone 46-3957

Specialist In Insulation Work, Air Conditioning & Refrigeration, Electrical Engineers & Builders.

16/1, Chandranath Chatterjee Street
Calcutta—25

আমার দৃষ্টিতে

শ্রীঅরবিন্দের দি লাইফ ডিভাইন

শম্ভু গুহের অনুবাদ

প্রথম খণ্ড :	প্রথম চার অধ্যায়	দাম—২·০০
দ্বিতীয় খণ্ড :	পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়	২·০০
তৃতীয় খণ্ড :	সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়	২·০০
চতুর্থ খণ্ড :	নবম ও দশম অধ্যায়	২·০০
পঞ্চম খণ্ড :	একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়	২·০০
ষষ্ঠ খণ্ড :	ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়	২·০০
সপ্তম খণ্ড :	পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ অধ্যায়	২·০০
অষ্টম খণ্ড :	সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়	২·০০
	প্রথম খণ্ড থেকে অষ্টম খণ্ড একত্রে বাঁধাই	২০·০০

—প্রাপ্তিস্থান—

চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স

১-১-১ এ-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অথবা

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীমায়ের সমগ্র রচনা সংগ্রহ

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা–৭০০০৭৩

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ শ্রীমায়ের জন্ম-শতবার্ষিকী। শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির যথাভাবে শতবার্ষিকী জয়ন্তী পালন করবে। জয়ন্তীর একটি অংশ পালিত হবে শ্রীমায়ের সমগ্র রচনা প্রকাশনের মাধ্যমে। শ্রীমায়ের সমগ্র রচনা মূল ফরাসী এবং ইংরাজী থেকে বাংলায় অনূদিত ১৫ খণ্ডে প্রকাশ হবে। তাতে থাকবে তাঁর লেখা ধ্যান ও প্রার্থনা, পুরাণো লেখা, প্রশ্ন ও উত্তর, প্রবন্ধ, পত্রাবলী ইত্যাদি।

প্রাক প্রকাশনী মূল্য—৩০৲ টাকা (সডাক ৩৫৲ টাকা) (গ্রাহকদের জন্য)
প্রকাশ হবার পরবর্তী মূল্য—৪৫৲ টাকা (সডাক ৫০৲ টাকা)

[শ্রীমায়ের সমগ্র রচনা সংগ্রহ অনুরূপ ধারাবাহিক সংস্করণ মোট ১৫ খণ্ডে প্রকাশ করা হবে। লাইনো টাইপে ছাপা ও সুন্দর কাপড়ে মজবুত বাঁধাই হবে সুদৃশ্য জ্যাকেটে মোড়া হবে। খুব কম সংখ্যা ছাপানো হবে।]

—গ্রাহক হবার নিয়মাবলী—

১। ৩০৲ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে।
২। প্রতিটি খণ্ড প্রকাশ হলে গ্রাহকদের জানানো হবে এবং ২০৲ টাকা দিয়ে বই সংগ্রহ করতে হবে।
৩। শেষ দুই খণ্ড অর্থাৎ ১৪ ও ১৫ খণ্ড সংগ্রহ করবার সময় গ্রাহকের জমা ৩০৲ টাকার সঙ্গে হিসাবনিকাশ করা হবে।

৪। যোগাযোগ করার স্থান :—
(ক) শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির,
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা–৭০০০৭৩
(খ) শ্রীঅরবিন্দ ভবন,
শ্রীঅরবিন্দ-ভবন, ৮ শেক্সপীয়র সরণী, কলিকাতা–৭০০০৭১

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্তিকা

২৪শে নভেম্বর, ১৯৭৭

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

সাবিত্রী (অনুবাদ)	শ্রীঅরবিন্দ	৫
ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিমন্ত্র	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১১
মায়ের খেলার মাঠ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১৬
দানধর্ম	শ্রীমা	২২

বার্ত্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫টাকা। বৎসরের যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০		২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০		৫২০·০০
বাহিরের মলাট	২০০·০০		৬০০·০০

শাখা
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭৩

সম্পাদক
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by : Nolini Kanta Gupta
Published by : Sri Aurobindo Pathamandir
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-73
Printed by : Amiyo Ranjan Ganguli
At Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry-2

25-12-71

The time has come for the
rule of falsehood to end
In the Truth alone is
salvation

সাবিত্রী

শ্রীঅরবিন্দ

৮ম পর্ব—মৃত্যুপর্ব

৩য় সর্গ—অরণ্যে মৃত্যু*

এখন এখানে তবে হিরণ্ময় মহান উষার
সে রয়েছে তার ঘুমন্ত স্বামীর পাশে শয়ান—দৃষ্টিপাত করে
তার অতীতের দিকে মৃত্যুকালে যেন
তাকিয়ে দেখে ফিরে জীবনের সূর্যালোকদীপ্ত ক্ষেত্রাবলীপরে,
সেখানে আর সকলের সঙ্গে সত্যবানও ছুটে চলেছে, খেলাধূলা করেছে,
তখন সে মাথা তার তুলে দাঁড়িয়েছিল এই বিপুল অন্ধকার স্রোতস্বতীর ঊর্ধ্বে
এই যার গহ্বরতলে এখন চিরতরে হবে তার নিমজ্জন।
যা-কিছু ছিল সে যা-কিছু করেছিল সাবিত্রী পুনরায় চলে সে-জীবন ধরে।
পূর্ণ বৎসর একটি স্মৃতিমালা নিয়ে তীব্র বেগে ঘূর্ণিপ্রবাহে
ছুটে চলে তার অন্তর দিয়ে, মিলিয়ে যায়
চিরতরে লুপ্ত অতীতের গর্ভে।
নীরবে উঠে দাঁড়ায় তবে, ক্রিয়াকর্ম শেষ করে
লুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম জানায় সেই মহাদেবীর কাছে
মূর্তি যাঁর সরলরেখায় সত্যবান এঁকে রেখেছিল বনের এক পাথরের পরে।
কি প্রার্থনা ছিল তার জানে একমাত্র আত্মা তার আর দুর্গামাতা।
হয়তো অনুভব করে সে বিরাট ছায়াচ্ছন্ন অরণ্য
জগৎ-জননীরূপে তার আপন সন্তানকে রক্ষণাবেক্ষণ করে,
হয়তো-বা সেই অস্ফুট কণ্ঠ উচ্চারে কোন স্তব্ধ বাক্য।
অবশেষে উপনীত সে তার বিবর্ণ রাণীমাতার কাছে।
কহে কথা, সতর্ক ওষ্ঠাধর, আনন প্রশান্ত,
পাছে আচম্বিতে কোন কথা অথবা কোন বিমনা দৃষ্টি
অজ্ঞাতে মায়ের বক্ষতলে পথ করে দেয়
সর্বসুখনাশা জীবনের হতাশার,
আসন্ন দুঃখের নিদারুণ পূর্বানুভূতি।

---

* 'সাবিত্রী'র একটা পূর্বতন সংস্করণ ছিল, তার মধ্যে তৃতীয় সর্গ বলে একটি সর্গ ছিল। পুনঃসংস্করণের সময় এই সর্গটি বর্তমান নামের পর্বে ও অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পূর্বতন প্রথম সংস্করণের প্রায় সেইরূপই রাখা হয়েছে, সামান্য পরিবর্তন মাত্র করা হয়েছিল। এই পর্বে এই সর্গটি ছাড়া আর কিছু লেখা হয়নি।

যতটুকু বলা দরকার ততটুকু বলা এল তার :
অবশিষ্ট সব ঠেলে পিছনে সরিয়ে দিল বাধাক্লিষ্ট হৃদয়তলে,
কথার উপরে চাপিয়ে দিল একটা বাহ্য শান্তি :
"পূর্ণ এক বৎসর আমি সত্যবানের সঙ্গে বাস করেছি
বিপুল অরণ্যের এই সবুজ প্রান্তে,
চারিদিকে ঘিরে রেখেছে লৌহবলয় যেন বিরাট পর্বতচূড়া সব
বনভূমির আকাশে সুনীল সব ছিদ্রের দৃষ্টিতলে ;
আমি কখনও প্রবেশ করিনি এইসব নীরবতার মাঝে
বিপুল বনভূমিগর্ভে, আমার চিন্তারাজিকে ঘিরে যে রেখেছে
তার রহস্য দিয়ে, তার সব সবুজ অপরূপ ক্রিয়াকর্মমাঝে
করিনি ভ্রমণ—শুধু এই সামান্য পরিচ্ছিন্ন অঙ্গনটি ছিল আমার সমস্ত জগৎ।
প্রবল বাসনা এক অধিকার করেছে এখন সকল হৃদয় আমার
যাব সত্যবান সঙ্গে ধরে তার হাতখানি
এই যে জীবনখানি বেসেছে সে যাকে ভাল, স্পর্শ করব
সেই সব লতাগুল্ম যাদের উপর দিয়ে চলে সে গিয়েছে পায়ে হেঁটে,
জানব আরণ্য কুসুমসব
শুনব স্বচ্ছন্দে পাখীদের গান আর এই যত ধাবমান প্রাণধারা
শুরু হয়, লয় পায় যারা, তরুশাখাদের সুদূর সমুচ্চ মর্মরধ্বনি
আর এই যত অলৌকিক সূক্ষ্ম কণ্ঠ বনরাজির।
অনুমতি দাও, মাগো, শান্ত কর আমার হৃদয়।"
রাজ্ঞী বলেন উত্তরে "জ্ঞানী মন তোমার যেমন চায়, তাই কর তুমি,
শিশু-অধিকারিণী তুমি আমার, প্রশান্ত আঁখি তোমার আজ্ঞাদাত্রীর।
আমি তো মনে করি শক্তিময়ী দেবী তুমি এসেছ এখানে
আমাদের উষর দিনের প্রতি দয়া করে ; সেবা করে চলেছ
সেবাদাসীর মত, তবুও তো তুমি ঊর্ধ্বে আসীন
যা-কিছু কর, যা-কিছু বল আমাদের করে কল্পনা সকল ছাড়িয়ে
সমর্থ সূর্য যেমন পৃথিবীর সেবা করে ঊর্ধ্ব হতে।"
তারপর মৃত্যুমুখী পতি আর যে রমণী জানে সেকথা
চলে হাতে হাত দিয়ে অপরূপ জগতে সেই
যেখানে রয়েছে সৌন্দর্য আর মহিমা আর অনুক্ত স্বপ্ন যত,
যেখানে প্রকৃতির অলৌকিক নীরবতা অনুভূত হয় যেন
সংযোগ রেখে চলেছে ভগবানের রহস্যের সঙ্গে।
পাশে তার সত্যবান হেঁটে চলেছে পূর্ণ উল্লাসে,
সাবিত্রী চলেছে যে তার সঙ্গে তারই পরিচিত সবুজের বেলা পার হয়ে :
সত্যবান দেখিয়ে চলেছে বনের যত সম্পদ, ফুলরাজি
কত না বর্ণ তাদের কত না সুরভি,

কোমল ঘনবিন্যস্ত কত-না লাল ও সবুজ মতিকারাজি
আর কত রক্তনারি রঙের পালকে ভূষিত কত অপরূপ পাখীর দল,
দূরে শাখা হতে আসে কত মধুর আহ্বান, প্রত্যুত্তরে পায়
মধুরতর তীব্র আবেগধ্বনি।
যা-কিছু সে বেসেছে ভাল সবার কথা বলে যায় সত্যবান : সকলেই ছিল যে তারা
শৈশবের সঙ্গী আর খেলার সাথী,
তার জীবনের সহচর সমবয়সী এজগতে
তাদের প্রতিটি মতিগতি পরিচিত তার :
অন্যের কাছে তাদের চিন্তা অর্থহীন,
তার কিন্তু অন্তরঙ্গ, প্রতিটি উদ্দাম আবেগে
দেয় সাড়া। সাবিত্রী গভীর অন্তর দিয়ে শোনে, শোনে সেই কণ্ঠ
সন্ধানে যেখানে ফুটে উঠবে না আর কোমল কথা কোন,
ধরে রাখে অন্তরে প্রিয়, অতিপ্রিয় মধুর মূর্ছনা তার সব
একান্তে স্মৃতির তরে যখন কেউ তার সঙ্গে থাকবে না,
প্রিয়কণ্ঠ আর কথা বলবে না।
কিন্তু এসবের অর্থের উপরে কোন ধ্যান দেয় না মন তার,
এখন চিন্তার বিষয় তার মৃত্যু জীবন নয়, অথবা জীবনের সর্বশেষ প্রান্ত।
বুকের ভিতরে প্রেম আহত হয় বেদনার কর্কশ দংশনে
প্রতিপদে শোকাকুল যন্ত্রণায় বলে ওঠে
"এইবার, এইবার হয়তো-বা কণ্ঠ তার চিরতরে থেমে যাবে।"
অশরীরী স্পর্শে এক পীড়িত হয়ে কখনও-বা
চারিভিতে ফিরায় দৃষ্টি তার, আঁখির গোলকে
যদি-বা ধরা পড়ে সেই ছায়াচ্ছন্ন ভয়াবহ দেবতার আগমন।
সত্যবান দাঁড়াল ক্ষণতরে। এখানেই কাজ তার শেষ করে
দুজনে এখন সুখী, হাতে হাত দিয়ে, চিন্তাহীন
মুক্তভাবে বেড়াবে তারা সেই গভীর সবুজ
আদিকালের রহস্যভরা বনানীর বক্ষতলে।
কোন কথা নাই, নিকটে চলে সে লক্ষ্য করে,
এই প্রিয় দেহখানি এই সমুজ্জ্বল আননের এতটুকু ভঙ্গি চায় না সে
দৃষ্টি হতে হারাতে।
জীবনধারা এখন তার নিমেষের মধ্যে, প্রহরের মধ্যে নয়,
প্রতিমুহূর্ত সে জমিয়ে রাখে
হতাশ বণিক যেমন ঝুঁকে থাকে তার পশরার উপর,
কৃপণ যেন অবশিষ্ট স্বর্ণমুষ্টি ধরে রয়।
আর সত্যবান দুলায়ে চলেছে হর্ষে কুঠার তার।
উচ্চকণ্ঠে গায় সিদ্ধপুরুষের সেই গান

ঘোষণা করে মৃত্যু পদানত, দানবেরা নিহত,
আর মাঝে মাঝে থেমে যায় মধুর দুটি কথা
তার কানে শোনাবার তরে
প্রণয়ের চেয়েও কোমলতর রসপরিহাস :
মুখের কথা তার লুফে নেয় সে বাঘিনীর মত
তুলে রাখে তারে সযত্নে হৃদয়ের গুহাতলে।
কর্মে নিরত সে, নিয়তির হাত ধীরে এসে পড়ে তার 'পরে।
বেদনার হিংস্র বুভুক্ষু পশুদল যেন
দেহ তার ভেদ করে চলে যায় নিঃশব্দে,
কণ্টকিত অবরুদ্ধ শ্বাস তার ছিঁড়ে ফেলতে চায় যেন
জীবনের নিবিড় হৃদ্‌তন্ত্রী, চায় মুক্তি।
তারপর, হিংস্রপশু ছেড়ে গেল যেন তার শিকার ;
তাই বুকভরা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে
লভে যেন পুনরায় সামর্থ্য আর সহজ স্বস্তি, উঠে দাঁড়াল সে
নিকটে আশ্রয় তার করি
সহর্ষে পূর্ণ বিশ্বাসে শুরু করে কর্মভার তার
তবে কুঠারের আঘাত নিশ্চিত যেন নয় আর। কিন্তু সময় হয়েছে,
বিশ্বকাঠুরিয়া হানে আঘাত লক্ষ্য করে তারে, কর্মের অবসান তার
ঊর্ধ্বে তুলে বাহু তার দূরে ফেলে দেয় নির্মম কুঠারে,
অতি দূরে, বেদনার যন্ত্র যেন।
সাবিত্রী এসে দাঁড়ান পাশে তার নীরব যন্ত্রণায় আলিঙ্গনে বদ্ধ করে,
সত্যবান কহে উচ্চরবে "সাবিত্রী, কি যন্ত্রণা যেন
দ্বিখণ্ড করে চলে যায় আমার মাথা আর বুকের ভিতর দিয়ে
কুঠারই যেন ভেদ করে চলেছে তারে, জীবন্ত কোন তরুশাখারে নয়।
এমন যন্ত্রণা দীর্ণ করে আমারে, তরু স্বয়ং হয়তো যেমন অনুভব করে
যখন সে খণ্ডিত হয় আর হয় মৃত্যুমুখী।
এস, তোমার অঙ্কে রাখি মাথা,
তোমার বাহু ঘিরে ধরে রাখ আমারে পাপ-নিয়তি হতে রক্ষা ক'রে :
তুমি আমারে ছুঁয়ে রয়েছ, তাই হয়তো-বা মৃত্যু চলে যেতে পারে।"
সাবিত্রী তখন আসীন প্রসারিত তরুশাখাতলে
শীতল, সবুজ, সূর্যতাপ নাই যেখানে, তবে আহত তরুটি হতে দূরে
ছিন্ন করেছে যারে তার শাণিত কুঠার,—এড়িয়ে চলে তাকে ;
বিশাল ভাগ্যবান তরুমূলে এক অর্ধশায়িত
রক্ষা করে সত্যবানকে নিয়ে আপন বক্ষতলে, বুলিয়ে দেয়
তার বেদনাজর্জরিত কপাল আর দেহপরে কোমল তার হাত দুখানি।
নাই কোন শোক, নাই কোন ভীতি, মৃত সব অন্তরে এখন তার,

বিপুল প্রশান্তি এক ছেয়ে রয়েছে। বেদনা লাঘব করা
যন্ত্রণা সরিয়ে দেয়া একমাত্র ইচ্ছা তার, প্রেরণা তার—
মর্ত্যদেহে আর কোন অনুভব নাই তার। সয়ে যায় সে মুহূর্ত :
শোকশূন্য শক্তিমতী অপেক্ষায় সে রয় দেবতার মত।
কিন্তু এখন সত্যবানের মধুর পরিচিত গায়ের রঙটি পরিবর্তিত হয়ে গেল
একটা মলিন ধূসর বর্ণে আর তার চোখে
নেমে এল ছায়া এক, হারাল তারা সাবিত্রীর প্রিয় নির্মল আলো।
রয়ে গেল শুধু জড় স্থূল মনোবৃত্তি,
অন্তর্হিত সেখানে জাগ্রত অন্তশ্চেতনার জ্যোতির্ময় দৃষ্টি।
কিন্তু একবার পূর্ণ বিলুপ্তির পূর্বে
উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে শেষ হতাশা আঁকড়ে ধরে,
"সাবিত্রী, সাবিত্রী, শোন সাবিত্রী
কাছে এস, প্রাণ আমার, মুখে মুখ রাখ মরণের আগে।"
সাবিত্রী বিবর্ণ অধর তার রেখেছে কি না রেখেছে সত্যবানের অধরে
সত্যবান এলিয়ে পড়ল, হারিয়ে গেল তার শেষ মধুর সাড়া
গণ্ড তার চেপে রয় সাবিত্রীর সোনার বাহুপরে। সাবিত্রী
অনুসরণ করে তবু সত্যবানের অধরোষ্ঠ আপনার প্রাণবন্ত অধরোষ্ঠ দিয়ে
যেন ফিরিয়ে আনতে চায় তার অন্তরাত্মাকে আপন চুম্বনের বশে :
সহসা অনুভব হল তার তারা আর নিঃসঙ্গ নয়।
কি যেন এসেছে সেখানে, সচেতন, বিরাট, নির্মম।
নিকটে বোধ হল তার নির্বাক অতিকায় ছায়া এক
খর-মধ্যাহ্নকেও শীতল করে দিয়েছে সে তার পৃষ্ঠের ছায়ায় ঢেকে।
ভীতিকর স্তব্ধতা এক সর্বত্র ছড়িয়ে গেল :
পাখীদের কলরব নাই আর, নাই রব পশুদের।
আতঙ্ক এক মর্মন্তুদ বেদনা এক সারা জগৎ ভরে দিয়েছে,
শেষ প্রলয়ের অপচ্ছায়া যেন
ধরেছে ইন্দ্রিয়গোচর রূপ। বিশ্বব্যাপী মন এক
দৃষ্টি তার ছড়িয়ে দেয় সর্বত্র সেই ভয়ঙ্কর আঁখিযুগল থেকে
অভিশপ্ত করে ধরে সব যে তার অসহনীয় দৃষ্টিপাত দিয়ে,
তার অধর লোল জিহ্বাগ্রে আর বিরাট ললাটপ্রসারে
দেখে সে তার সর্বধ্বংসী বিশাল চিন্তাধারায়
সকল বস্তু সকল সত্তা করুণ এক স্বপ্ন যেন,
দূরে সরিয়ে দেয় প্রশান্ত ঘৃণাভরে প্রকৃতির পুলক যত,
তার গভীর দৃষ্টির নির্বাক অর্থ
ঘোষণা করে বিশ্বের, জীবনের অনন্তি
যে জীবনধারা চলবে চিরকাল কিন্তু ছিল না কখনও,—

ক্ষণস্থায়ী মিথ্যার নিরন্তর পুনরাবর্তন তার
যেন অরূপ অনাদ্য মহান নীরবতা হতে
বিপুল ছায়া এক নেমেছে সুদূরের উদাসীন দেবতার এক
তারই আপন নাস্তির সঙ্গে বেঁধে দিয়েছে এই মায়াময় বিশ্বের নিয়তি,
খণ্ডন করে দিয়েছে কালধারার সকল ভাবনা আর সকল ক্রিয়ার
বাহ্য প্রকাশ, চিরন্তনের সকল অনুকরণ।
জানে সাবিত্রী, মৃত্যু সাক্ষাৎ দাঁড়িয়ে সম্মুখে
আর সত্যবান তার আলিঙ্গন হতে সরে চলে গিয়েছে।

তৃতীয় সর্গ অষ্টম পর্ব সমাপ্ত
দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিমন্ত্র

(ঋগ্বেদ)

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

৩য় মণ্ডল—৬ষ্ঠ সূক্ত

১। প্র কারবো মনসা বচ্যমানা দেবব্রীচীং নয়ত দেবয়ন্তঃ।
দক্ষিণাবাড়াজিনী প্রাচ্যেতি হবির্ভরন্ত্যগ্নয়ে ঘৃতাচী ॥১॥

প্র (+নয়ত)—প্রচালিত করে
কারবঃ—কর্মী, কর্মকৃৎ
মনসা—মননের সহায়ে, চিন্তার সহায়ে
বচ্যমানাঃ—ব্যক্ত করতে আত্মপ্রকাশ করতে চায় যারা
দেবব্রীচীম্—দেবত্বের অভিমুখে
নয়ত (প্র+)—প্রচালিত করে
দেবয়ন্তঃ—দেবকর্মকারীরা, দেবত্বকাঙ্ক্ষীরা
দক্ষিণাবাট্—সুবুদ্ধিবাহক
বাজিনী—পূর্ণতাময়ী
প্রাচী—সম্মুখভাগে
এতি—চলেছে
হবিঃ—আহুতিকে
ভরন্তী—বহন করে
অগ্নয়ে—অগ্নির জন্য
ঘৃতাচী—তেজস্বিনী

কর্মকৃৎ সকলে দেবত্বকামী যারা, মনঃশক্তির সহায়ে নিজেদের অভিব্যক্ত করে, তাকে নিয়ে চলে দেবত্বের অভিমুখে, পূর্ণতাময়ী সুবুদ্ধিকে বহন করে চলে, তেজস্বিনী সে অগ্নির জন্য আহুতি আহরণ করে সম্মুখে এগিয়ে চলেছে ॥১॥

২। আ রোদসী অপৃণা জায়মান উত প্র রিক্থা অধ নু প্রযজ্যো।
দিবশ্চিদগ্নে মহিনা পৃথিব্যা বচস্যাং তে বহ্নয়ঃ সপ্তজিহ্বাঃ ॥২॥

আ—সর্বত্র
রোদসী—দ্যুলোক-ভূলোক
অপৃণাঃ (আ+)—সর্বত্র পূর্ণ করে রয়েছ
জায়মানঃ—যখন জন্ম নিয়েছ
উত—আর
প্র-রিক্থাঃ—অতিক্রম করে গিয়েছ.
অধ—তারপর, অনন্তর
নু—নিশ্চয়
প্রযজ্যো—হে যজ্ঞচালক
দিবঃ—দ্যুলোকের
চিৎ—আবার, আর
অগ্নে—হে অগ্নি
মহিনা—মহিমার সহায়ে
পৃথিব্যাঃ—পৃথিবীর
বচস্যান্—সত্য বাক্ কহে যেন
তে—তোমার
বহ্নয়ঃ—বহনকারীরা
সপ্তজিহ্বাঃ—সপ্তজিহ্বা

জন্ম হতেই তুমি দ্যুলোক-ভূলোক সর্বথা পূর্ণ করে রয়েছ, পরে তাদেরও অতিক্রম করে গিয়েছ, হে যজ্ঞচালক, স্বর্গের পৃথিবীর মহিমাকে আশ্রয় করে তোমার বাহক জিহ্বা-সপ্তক লাভ করে যেন সত্যবাক্ ॥২॥

৩। দ্যৌশ্চ বা পৃথিবী যজ্ঞিয়াসো নি হোতারং সাদয়তে দমায়।
যদী বিশো মানুষীর্দেবয়ন্তীঃ প্রযস্বতীরীড়তে শুক্রবর্চিঃ ॥৩॥

দ্যৌঃ—দ্যুলোক
চ—আর
বা—তোমাকে
পৃথিবী—পৃথিবী
যজ্ঞিয়াসঃ—যজ্ঞাধিপতি
নি—অন্তরে
হোতারম্—আহ্বাতাকে
সাদয়তে(নি+)—(আমাদের) অন্তরে স্থাপন করে
দমায়—গৃহের উদ্দেশ্যে
যদি (যৎ+ই)—যখন
বিশঃ—জনসংঘ
মানুষীঃ—মানুষী
দেবয়ন্তীঃ—দেবত্বকামী
প্রযস্বতীঃ—প্রেমময়ী
ঈড়তে—ভজনা করে, যাচ্ঞা করে
শুক্রম্—শুভ্র
বর্চিঃ—কিরণলেখাকে

যজ্ঞের অধিপতি দ্যুলোক আর ভূলোক তোমাকে আহ্বাতা করে আমাদের অন্তরে তোমার গৃহরূপে আসন করে দেয় তখন যখন দেবত্বকামী মানুষী জনসংঘ পরম তৃপ্তিপূর্ণ হয়ে ভজনা করে শুভ্র কিরণলেখাকে ॥৩॥

৪। মহান্‌ৎসধস্থে ধ্রুব আ নিষত্তোরুর্দ্যাবা মাহিনে হর্যমাণঃ।
আসেকু সপত্নী অজরে অমৃক্তে সবর্দুঘে উরুগায়স্য ধেনূ ॥৪॥

মহান্—মহান
সধস্থে—স্বকীয় স্থানে (সাধণ)
ধ্রুবঃ—ধ্রুব, অচল হয়ে
আ+নিসত্তঃ—আসীন রয়েছে
অন্তঃ—মধ্যে
দ্যাবা—দ্যুলোক-ভূলোকের
মাহিনে—মহত্বে
হর্যমাণঃ—সানন্দে, হর্ষভরে
আসেকু—সংযুক্ত
সপত্নী—পত্নীযুগল
অজরে—অজর, জরাহীন
অমৃক্তে—অক্ষত
সবর্দুঘে—ক্ষীরদাত্রী
উরুগায়স্য—বিশালচারীর
ধেনূ—ধেনুযুগল, গাভীযুগল

মহান তিনি, আপনার গৃহে ধ্রুবপদে আসীন তিনি, হর্ষাপ্লুত দ্যুলোক ও ভূলোকের মহত্বের মাঝখানে—সংযুক্ত যুগল পত্নী তারা, মহাকাশচারী দেবতার অজর অক্ষত ক্ষীরদাত্রী যুগল ধেনু যেন ॥৪॥

৫। ব্রতা তে অগ্নে মহতো মহানি তব ক্রত্বা রোদসী আ ততন্থ।
ত্বং দূতো অভবো জায়মানস্ত্বং নেতা বৃষভ চর্ষণীনাম্ ॥৫॥

ব্রতা—কর্মধারাসব
তে—তোমার
অগ্নে—হে অগ্নি
মহতঃ—মহান (তোমার)
ত্বম্—তুমি
দূতঃ—দূত
অভবঃ—হয়েছ
জায়মানঃ—জন্মমাত্র

মহানি—মহত্ত্বময়
ত্বম্—তুমি
তব—তোমার
নেতা—নেতা
ক্রত্বা—ইচ্ছাশক্তি দিয়ে
বৃষভ—হে পুরুষবর
রোদসী—লোকদ্বয় (দ্যুলোক-ভূলোক)
চর্ষণীনাম্—দৃষ্টিবানদের
আ+ততন্থ—প্রসারিত করে ধরেছ

হে অগ্নি, মহান তুমি, মহান তোমার কর্মধারা, তোমার ইচ্ছাশক্তি দিয়ে তুমি লোকদ্বয়কে সর্বত্র প্রসারিত করে ধরেছ, জন্ম হতেই তুমি দেবব্রত হয়েছ, হে পুরুষবর, দৃষ্টিবানদের তুমি হলে দিশারী ॥৫॥

৬। ঋতস্য বা কেশিনা যোগ্যাভির্ঘৃতস্নূবা রোহিতা ধুরি ধিষ্ব।
অথা বহ দেবানেষ বিশ্বান্ৎসুধ্যবরা কৃণুহি জাতবেদঃ ॥৬॥

ঋতস্য—সত্যের
অথ—তারপর
বা—অথবা
আ+বহ—বহন করে নিয়ে এস
কেশিনা—কেশরস্থ (যুগল অশ্ব)
দেবান্—দেবতাদের
যোগ্যাভিঃ—রশ্মিযুক্ত, রজ্জুযুক্ত
দেব—হে দেব
ঘৃতস্নূবা—তেজস্করস্থ
বিশ্বান্—যাবতীয়, সকল
রোহিতা—রক্তবর্ণ
সু-অধ্বরা—সুষ্ঠু যজ্ঞযাত্রা
ধুরি—জোয়ালে
কৃণুহি—করে তোল
ধিষ্ব—যুক্ত কর, আবদ্ধ কর
জাতবেদঃ—হে জাতবেদ, হে জাতিস্মর

সত্যের যে কেশরময় তেজস্করস্থ রক্তবর্ণ অশ্বযুগল জোয়ালে যুক্ত কর তাদের, তারপর হে দেব, বিশ্বদেবতাকে এখানে নিয়ে এস, যজ্ঞযাত্রাকে সুষ্ঠু করে তোল, হে জন্মজ্ঞানী ॥৬॥

৭। দিবশ্চিদা তে রুচয়ন্ত রোকা উষো বিভাতীরনু ভাসি পূর্বীঃ।
অপো যদগ্ন উশধগ্বনেষু হোতুর্মন্দ্রস্য পনয়ন্ত দেবাঃ ॥৭॥

দিবঃ+চিৎ—স্বর্গ হতেই
অপঃ—কর্ম
আ (+রুচয়ন্ত)—উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে
যৎ—যখন
তে—তোমার
অগ্নে—হে অগ্নি
রুচয়ন্ত (আ+)—উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে
উশধক্—আবেগে সমিদ্ধ হয়ে
রোকাঃ—দীপ্তিরাজি
বনেষু—বনের মধ্যে
উষঃ—উষার
হোতুঃ—হোতার
বিভাতীঃ—ভাস্বর
মন্দ্রস্য—আনন্দময়ের
অনু—অনুসরণে
পনয়ন্ত—ক্রিয়াশীল হয়, (কর্ম) সাধন করে চলে
ভাসি—দীপ্ত হয়েছ, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছ
পূর্বীঃ—বহুল
দেবাঃ—দেবতারা

স্বর্গ হতেই তোমার দীপ্তিসকল উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, বহুল প্রোজ্জ্বল উষার অনুসরণে তুমি উদ্ভাসিত, হে অগ্নি, বনের মধ্যে তুমি যখন আবেগে সমিদ্ধ হয়ে উঠেছ, দেবতারা তখন আনন্দময় হোতার কর্ম সাধন করে চলে ॥৭॥

৮। উরৌ বা যে অন্তরিক্ষে মদন্তি দিবো বা যে রোচনে সন্তি দেবাঃ।
উষা বা যে সুহবাসো যজত্রা আয়েমিরে রথ্যো অগ্নে অশ্বাঃ ॥৮॥

উরৌ—বিশাল, বিস্তৃত
বা—অথবা
যে—যারা
অন্তরিক্ষে—অন্তরিক্ষে
মদন্তি—আনন্দ করে
দিবঃ—স্বর্গের
বা—অথবা
যে—যারা
রোচনে—জ্যোতির্ময় লোকে
সন্তি—রয়েছে
দেবাঃ—দেবতারা
উষাঃ—উষা নামক
বা—অথবা
যে—যারা
সুহবাসঃ—সহজে আহ্বানীয়
যজত্রাঃ—যজনীয়
আয়েমিরে—উপস্থিত হয়েছে, বহন করে নিয়ে এসেছে
রথ্যঃ—রথযুক্ত
অগ্নে—হে অগ্নি
অশ্বাঃ—অশ্বেরা

বিপুল অন্তরিক্ষে যে দেবতারা আনন্দভোগ করে অথবা যে দেবতারা স্বর্গের জ্যোতির্ময় লোকে আসীন অথবা আর যারা সহজে আহ্বানীয়, যজনীয় তাদের বহন করে এনেছে, হে অগ্নি, রথযুক্ত অশ্বেরা ॥৮॥

৯। এভিরগ্নে সরথং যাহ্যর্বাঙ্ নানারথং বা বিভবো হ্যশ্বাঃ।
পত্নীবতস্ত্রিংশতং ত্রীংশ্চ দেবাননুস্বধমা বহ মাদয়স্ব ॥৯॥

আ (+যাহি)—এস
এভিঃ—এই সব
অগ্নে—হে অগ্নি
সরথম্—একই রথে
যাহি (আ+)—এস
অর্বাঙ্—নিম্নে, এখানে
নানারথম্—বহুল রথে
বা—অথবা
বিভবঃ—ছড়িয়ে রয়েছে, চারিদিকে রয়েছে
হি—নিশ্চয়
অশ্বাঃ—অশ্বেরা
পত্নীবতঃ—পত্নীদের সহ
ত্রিংশতম্—ত্রিংশত
ত্রীন্—তিন
চ—আর
দেবান্—দেবতাদের
অনু-স্বধম্—তোমার স্বধর্ম অনুসারে
আ-বহ—নিয়ে এস
মাদয়স্ব—মধু পান করাও তাদের

এদের সঙ্গে, হে অগ্নি, নেমে এস তুমি একই রথে বা বিবিধ রথে, তোমার অশ্বেরা চারিদিকে রয়েছে। পত্নীদের সঙ্গে তিনশত তিন দেবতাদের তুমি তোমার আপন ধর্ম অনুসারে নিয়ে এস, মধুমত্ত কর তাদের ॥৯॥

১০। স হোতা যস্য রোদসী চিদুর্বী যজ্ঞং যজ্ঞমভি বৃধে গৃণীতঃ।
প্রাচী অধ্বরেব তস্থতুঃ সুমেকে ঋতাবরী ঋতজাতস্য সত্যে ॥১০॥

সঃ—সে
হোতা—আহ্বায়ক পুরোহিত
যস্য—যার
রোদসী—স্বর্গ-পৃথিবী
চিৎ—এমনকি
উর্বী—বিশাল
যজ্ঞম্-যজ্ঞম্—যজ্ঞ হতে যজ্ঞান্তরে
অভি-বৃধে—অভিবৃদ্ধির জন্য
গৃণীতঃ—মন্ত্র উচ্চারণ করে, বাক্যে প্রকাশ করে ধরে
প্রাচী—পরস্পরে মুখবর্তী, পরস্পরের সম্মুখে
অধ্বরা-ইব—যজ্ঞযাত্রার
তস্থতুঃ—স্থাপন করেছে
সুমেকে—স্থিরপ্রতিষ্ঠ করে
ঋতাবরী—ঋতময়
ঋতজাতস্য—ঋতজাতের
সত্যে—সত্যে

তিনি হলেন আহ্বানের পুরোহিত যার অভিবৃদ্ধির জন্য যজ্ঞ হতে যজ্ঞান্তরে পৃথিবী এবং স্বর্গ মন্ত্র উচ্চারণ করেন, মুখোমুখি হয়ে পরস্পরে তাঁরা যজ্ঞযাত্রায় দুইপ্রান্তের মত স্থিরপ্রতিষ্ঠ, সত্যকে তাঁরা ধরে রাখেন সত্য হতে জন্ম যার তারই মধ্যে ॥১০॥

১১। ইলামগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ।
স্যান্ন সূনুস্তনয়ো বিজাবাগ্নে সা তে সুমতির্ভূত্বস্মে ॥১১॥

ইলাম্—দৃষ্টিময় বাক্
অগ্নে—হে অগ্নি
পুরুদংসম্—বহুল কর্মময়
সনিম্—বিজয়
গোঃ—জ্যোতির
শশ্বত্তমম্—পরম চিরন্তন
হবমানায়—আহুতিকার বা আহ্বাতার জন্য
সাধ—সাধন কর, অর্জন কর
স্যাৎ—হয় যেন
নঃ—আমাদের
সূনুঃ—পুত্র
তনয়ঃ—আত্মজ
বিজাবা—সর্বত্রজাত
অগ্নে—হে অগ্নি
সা—সেই
তে—তোমার
সুমতিঃ—সত্যচিন্তা
ভূতু—সৃষ্ট হয় যেন
অস্মে—আমাদের মধ্যে

হে অগ্নি, আমরা আহ্বান করি তোমাকে, আমাদের জন্য নিয়ে এস চক্ষুষ্মান বাক্ আর সেই চিরন্তনী আলোকবিজয়ী বহুমুখী কর্মধারা, হে অগ্নি, আমাদের আপন আত্মজ পুত্র হয় যেন, আমাদের মধ্যে সৃষ্ট হয় যেন তোমারই সত্য মতি ॥১১॥

মায়ের খেলার মাঠ

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

গতবার আমি তোমাদের বলেছিলাম এমন একটি ঘটনা সম্বন্ধে যা ঘটত খেলার মাঠে—বেশ উল্লেখযোগ্য অসাধারণ ঘটনাই। এবার আমি তোমাদের বলতে যাচ্ছি আমাদের খেলার মাঠের কথাই—এও একটা অসাধারণ ঘটনা, মায়ের হাতে সৃষ্টি।

তোমাদের হয়তো মনে আছে, আমরা থিয়েটারে একটা নাটক দেখেছিলাম আমাদের ছাত্রছাত্রীদের করা। তার বিষয় ছিল: কয়েকটি তরুণ অভিযাত্রীর অভিজ্ঞতা—তারা যখন ঘর ছেড়ে বাইরে বেড়াতে বেরুল। শেষে তারা একটা বাড়িতে এল, তাদের একজন হঠাৎ বাড়িটির একটা দরজা খুলে ফেলল—সকলেই সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করল সেখানে—আবিষ্কার করল তারা সেটি এক পরীর রাজ্য। তারা বিস্মিত, স্তম্ভিত আবিষ্কার করেছে যে তারা পিছনে ফেলে এসেছে পুরাতন জগৎ, এসে গেছে এক নূতন অপরিচিত মনোহারী পরীর দেশে।

ঠিক এই অভিজ্ঞতাটিই হয় খেলার মাঠের দরজাটি খুললে, তার মধ্যে প্রবেশ করলে। অন্তত সেই প্রথম যুগে সেই সব দিনে আমাদের এমনি অভিজ্ঞতাই হত। যে মুহূর্তে খেলার মাঠে পা দিতাম, একটা নূতন আবহাওয়া ঘিরে ধরত আমাদের, একটা নূতন জীবন, ভরা আনন্দে আর সুখে, উল্লাসে আর স্বাধীনতায়। আমরা যখন আমাদের খেলার মাঠের গ্রুপের পোশাক পরতাম তখন নিজেদের সম্পূর্ণ বিভিন্ন মনে হত সচরাচর আমরা যে মানুষটি থাকতাম তার থেকে। বয়সী জনেরা আমাদের দলের তাদের নীল পোশাক পরে—তাঁরা সত্যসত্যই বয়সী বৃদ্ধ (?)—তাঁরা অনুভব করতেন যেন তাঁরা অত্যন্ত তরুণ হয়ে গেছেন— যৌবনবন্ত—তাঁরা চারিদিকে লাফিয়ে ছুটে বেড়াতেন যেন তাঁদের বয়সটাকে তার সকল চিন্তাভাবনা সমেত পিছনে ফেলে দিয়ে এসেছেন। আর তরুণেরা, সবচেয়ে ছোটরা, তাদের কি আগ্রহ গ্রুপে যোগ দেবার, সবুজ পোশাক পরবার। তাদের মধ্যে কতজন তাদের সবুজ প্যান্ট পরে ছুটে আসত আমার কাছে, মহা-উৎসাহে বলত—"আজ আমি খেলার পোশাক পেয়েছি, আমি আজ থেকে গ্রুপে যাচ্ছি।" কি খুশী, কি মুক্ত, আনন্দে ভরপুর—তাদের দেখলেও আনন্দ হয়।

এখন খেলার মাঠের সংগঠন বা দলগঠনের সম্বন্ধে একটা কথা বলি তবে। স্বভাবতঃই বয়স, ক্ষমতা ও স্ত্রী-পুরুষভেদে যে পার্থক্য তার দিকে কিছু নজর রাখতেই হত; কিন্তু নীতিহিসাবে সাধারণভাবে। আদর্শ হিসাবে যেটি দলভাগের পিছনে থাকত এবং যা সেটির উপর খুব জোর দিতেন, সেটি হল—বয়সের কোন ব্যবধান নেই, বিশেষ করে স্ত্রীপুরুষে কোন তফাত নেই; সকল মানুষী জীবন মূলতঃ একই প্রকৃতির। বিশেষতঃ শারীরশিক্ষার যে সব প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হত মাঝে মাঝে, তাতে সব দল অল্প-বেশি মিশিয়ে দেওয়া হত—সবুজ, লাল, নীল এবং আরও যত রঙের দল মিশে একটা বর্ণসমাহার হত যেন। আজকাল এটা একটু অন্যরকম হয়, কিন্তু তখনকার দিনে এটি এইভাবেই হত। বিশেষত্ব ও পার্থক্য মাপবার জন্য একটি বিষয়ই প্রধানতঃ বিবেচনা করা হত, সেটি ক্ষমতা বা

সামর্থ্য এবং সেটি হত অত্যন্ত সাধারণ ও শিথিলভাবে। আমিও একজন বর্ষীয়ান ব্যক্তি তখন—বৃদ্ধ আর বললাম না। দৌড়েছি, ব্যায়াম করেছি তরুণদের সঙ্গে—খুবই তরুণ ছেলেদের ও মেয়েদেরও সঙ্গে—এবং তা করেছি কৌতুক বা রসিকতা করে নয়, দস্তুরমত মন দিয়ে দায়িত্বপূর্ণ ভাবে। এসব বলছি তোমাদের দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাতে যে তোমাদের মনে, তোমাদের চেতনায় কোন পার্থক্যবোধ, কোন হীনমন্যতা বা আত্মসচেতনতা থাকা উচিৎ নয় বয়স বা স্ত্রীপুরুষ ভেদের তফাতের জন্য, এমনকি অনেকাংশে ক্ষমতার ক্ষেত্রেও নয়।

সেই একেবারে প্রথম যুগে, আমরা যখন সংখ্যায় কতিপয় ছিলাম—জন পঞ্চাশেক হবে, সে সময় আমরা পরস্পরকে নাম ধরে ডাকতাম—নিছক নামটুকু ধরে, তার সঙ্গে কোন 'দাদা' বা 'দিদি'র লেজুড় থাকত না নলিনী, পবিত্র, সাহানা, ললিতা, বাসু, ওইটুকুই নির্ভেজাল সরল। কাজেই বাইরে থেকে লোকেরা যারা এখানে আসত, তাদের কাছে এটা একটু অদ্ভুতই লাগত : "এদের বয়সেরপ্রতি কোন শ্রদ্ধা নেই, বয়োজ্যেষ্ঠদের কোন সমীহ করে না, মহিলাদের জন্য কোন বিশেষ বিবেচনা নেই, এরা একে অন্যকে স্রেফ নাম ধরে ডাকে।" কিন্তু বস্তুতঃ বাইরে থেকে যাই মনে হোক, এর পিছনে চেতনাটি, মনোভাবটি ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এবং এমন অনেকে ছিল যারা এটা অনুভব করত এবং তাতে মুগ্ধ হত। এইভাবে যখন আশ্রমে কেউ আমাকে আমার নাম ধরে ডাকত, কিংবা কোন বর্ষীয়সী মহিলাকে তাঁর নাম ধরে ডাকত, তার পিছনে যে মনোবৃত্তি তা শ্রদ্ধা ও সমীহে এমনকি ভালবাসায় পূর্ণ থাকত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেবল সম্বোধনের ধরনটি ছিল অমনই নিরাড়ম্বর, বিশেষণহীন। এমনকি বাইরের একজন এটা লক্ষ্য করেছিল এবং ঠিক ঠিক সুবিচারও করেছিল। সে আশ্রম সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখে, তাতে আশ্রমের এই আচরণ-প্রথাটি উল্লেখ করেছিল খুব আশ্চর্যের বিষয় যে ছোটরা সেখানে বৃদ্ধদের নিছক নাম ধরে ডাকে অথচ তা এত সুন্দর ও স্বাভাবিক শোনায় যখন তা উচ্চারিত হয় তাদের মুখে।

সুতরাং যে আদর্শ অনুযায়ী আমাদের শরীর-শিক্ষা সংগঠন চালিত হয় তা তোমরা জান : প্রথমতঃ ছেলে ও মেয়েতে কোন তফাত থাকবে না, তাদের সবাইকে একই ব্যায়াম-আদি করতে হবে এবং একই কর্মসূচী অনুসরণ করতে হবে। এ নিয়ম ছিল এবং এখন পর্যন্ত রয়েছে অবশ্যকর্তব্য ছোটদের দলগুলির জন্য, সবুজ ও লাল দল এবং তাদের একটু উপরে যারা তাদের জন্যও। কিন্তু প্রায়ই প্রশ্ন করা হয়ে থাকে, তাদের দেহ তো বিভিন্ন বিশেষ করে স্ত্রী-পুরুষ ভেদে, কাজেই এইটাই কি স্বাভাবিক নয় যে তাদের জন্য পৃথক কর্মসূচী দেওয়া হবে? কিন্তু আসলে তাদের মধ্যে দেহগত পার্থক্য গড়ে উঠেছে কারণ চেতনা তাদের বিবর্তনের ও ক্রমপরিণতির লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে এই পার্থক্যটির উপর জোর দিয়ে এসেছে। এ শুধু এখনই এই যুগে অবস্থার একটু পরিবর্তন হতে আরম্ভ করেছে। তোমাদের কারও কারও হয়তো মনে আছে, বিশেষ করে বড় যারা তাদের মধ্যে, খেলার মাঠে ব্যায়াম করার জন্য মেয়েদের শার্ট ও হাফপ্যান্ট পরাতে মাকে কত কষ্ট করতে হয়েছে। তাঁকে ধীরে ধীরে একটু একটু করে আরম্ভ করতে হয়েছে অতি সন্তর্পণে। গোড়াতে মেয়েরা প্রথমে ট্রাউজার পরতে শিখল, ট্রাউজার পরেই তারা কুচকাওয়াজ ও ব্যায়ামাদি করত। এমনকি এখনও বাইরের জগতে বিশেষ করে ভারতবর্ষে আমরা দেখতে পাই, মেয়েরা, মহিলারা

শাড়ি পরে কুচকাওয়াজ করছে, মহড়া দিচ্ছে। আমাদের মহিলা-পুলিশরা আজকের দিনেও শাড়ি পরে পাহারা দেয়, কর্ম করে। সামাজিক অভ্যাস অত্যন্ত সবল, এ দিক দিয়ে আমরা দাবি করতে পারি যে মেয়েদের মুক্তিসংগ্রামের—ছেলেদের সঙ্গে সমান শরীর স্বাধীনতার আন্দোলনের আমরাই পুরোধা। এ শিক্ষার পাঠ না দিয়েছেন।

বহুদিন আগে, প্রায় পঁচিশ বছর হবে, ভারতবর্ষের এক সুবিখ্যাত নেতা, এক বিরাট শিক্ষাবিদ এসেছিলেন এবং আমাদের খেলার মাঠের ক্রিয়াকলাপ দেখে মন্তব্য করেছিলেন "আমি সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছি, বহু বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেখেছি, মেয়েদের জিমনাস্টিক করতে দেখেছি কিন্তু এই প্রথম দেখলাম আশ্রমের মেয়েদের ডিগবাজি (vaulting) খেতে, বিশেষ করে প্যারালাল বারের উপর।" অবশ্য বলা বাহুল্য সার্কাসের মেয়েদের কথা স্বতন্ত্র। অন্যকথায় বলা চলে লোকের ধারণা ছিল ডিগবাজি খাওয়াটা একটা পুরুষ-ধর্ম এবং ওই দলেই পড়ে আরও অনেক খেলা ও ব্যায়ামও। আজকার দিনে ক্রমেই দেখা যাচ্ছে যে এটা একটা কুসংস্কার, পূর্বতন বিচারটি ভুল। উইম্বলডনের বিজয়িনীরা তার সাক্ষ্যপ্রমাণ বহন করছে। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথা হল, তোমার মনোভাবটি পরিবর্তন করতে হবে, তোমাকে তোমার চেতনা পরিবর্তন করতে হবে। অবশ্যই এর জন্য পথে অনেক বাধাবিপত্তির মুখোমুখি হবে, অভ্যাসের শক্তি, রংশধারার শক্তি এসব হল তোমার চেতনার পক্ষে অর্থাৎ তোমার নূতন চেতনার পক্ষে একটা অধিকন্তু দায়, বোঝা। এখানে যা করা হয় এবং বাইরে অনাত্র যা করা হয়—এই মেয়েদের এবং তরুণদের স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য—তার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। সে কথাই বলব এবার। মা প্রায়ই বলতেন, বারে বারে বলতেন এখানে যে স্বাধীনতা যে মুক্তির সুযোগ উপভোগ কর তোমরা তা অসাধারণ, বিরল, তোমাদের স্বাধীনতার এখানে কোন সীমা নেই প্রায়। তার অর্থ কিন্তু বলা চলে, এ হল বিপজ্জনক কারণ স্বাধীনতার নির্বাধ ব্যবহার অর্থ প্রায়ই হয়ে ওঠে স্বাধীনতার অপব্যবহার। কিন্তু মা যে ঝুঁকি নিয়েছিলেন কারণ তাই হল আমূল পরিবর্তনের, সম্পূর্ণ সমাধানের একমাত্র পন্থা, অন্যথায় তা হয় একটা অর্ধসমাপ্ত আপোষ মাত্র। একমাত্র যখন তুমি স্বাধীন, সম্পূর্ণ ভাবে একান্তভাবে স্বাধীন তখনই কেবল তুমি বেছে নিতে পার ভাল বা মন্দ একটিকে, এবং তুমি ভাল বেছে নাও তোমার নিজের ইচ্ছায়, তখনই সে 'ভাল'র সত্যকার মূল্য থাকে তোমার পক্ষে, তোমার চেতনার, তোমার ক্রমপরিণতির পক্ষে। অন্যথায় তুমি যা ভাল তার গ্রহণ ও অনুসরণ কর বাধ্য হয়ে, ভয়ে বা সামাজিক শালীনতার দায়ে। কিন্তু তোমার নিজের স্বার্থে 'ভাল হওয়া'র জন্য অহঙ্কারের বশে অর্থাৎ ভাল হওয়ার জন্য তুমি কিছু নিয়ম মেনে চল এবং অনুভব কর তুমি খুব ধার্মিক সাধু, খুব কর্তব্যপরায়ণ, সেক্ষেত্রে এটি কিন্তু ঠিক পন্থা নয়, সঠিক মনোভাব বা সঠিক চেতনা নয়। সত্যকার চেতনা হল যখন তুমি ঠিক জিনিসটি কর তোমার তা করা কর্তব্য বলে নয়, কিংবা সেটা করার যোগ্য বলেও নয়, অথবা তুমি এটি করবে অন্যে এমন প্রত্যাশা করে বলেও নয়, তুমি তা কর কারণ তোমার স্বভাব তোমাকে তা করতে প্রণোদিত করে। ফুল ফোটে স্বভাবতঃই কোন কর্তব্যবোধে নয়। তার কোন কর্তব্যবোধই নেই, তার প্রকৃতিই ফুটে ওঠা, সুন্দর হওয়া। মানুষও এমনই হতে পারে, স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক তার সব কর্মে ও আচরণে। যখন তুমি একটা বিরাট কিছু কর, তুমি বোধ কর না যে তুমি একটা আশ্চর্য কিছু করছ অথবা তুমি তোমার

শক্তির প্রয়োগ করছ, তাকে প্রসারিত করে দিচ্ছ। তোমার কর্তব্য বলে তুমি তখন কিছু কর না, তুমি যা কর তা কর কারণ তোমার স্বভাবই হল তা করা, তা না করে তুমি পার না। একটা উদাহরণ দিই। তোমরা তো ইংরেজীর ছাত্র, ইংরেজী ব্যাকরণ পড়। বল তো এই দুটি উক্তির মধ্যে তফাত কি? "I have to do the thing" আর "I am to do the thing"। "I have to do the thing মানে "এটা করতে আমি বাধ্য, আমাকে এটা করতেই হবে, অন্যথা করতে আমি অক্ষম"। আর "I am to do the thing" মানে "আমি এটা করছি, আমার করণীয় এটা, তাই আমি এটা করব অর্থাৎ আমার স্বভাবই এটা করা।" এই ধরনের একটা শিক্ষা গীতাতেও দেওয়া হয়েছে—কর্তব্যকর্ম এবং নিষ্কাম কর্ম অথবা আপন স্বধর্মের আদর্শ। কর্তব্য বলতে সাধারণতঃ duty ধরা হয় কিন্তু তা ঠিক নয়। কর্তব্য হল প্রত্যেকের স্বধর্ম, তার প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ—যা করণীয়, যা করতে বাধ্য তা নয়। মা তাঁর ছেলেমেয়েদের এই অপরিসীম স্বাধীনতা দিয়েছিলেন কারণ সেটিই হল একমাত্র পন্থা নূতন প্রকৃতি সৃষ্টি করবার এবং স্বাধীনতার সঠিক ব্যবহার এবং তার অপব্যবহারের মধ্যে পার্থক্যটিও দেখিয়েছেন। এর অপব্যবহার দেখা যায় বাইরের জগতে সাধারণ জীবনে স্বাধীনতা ব্যবহারের সর্বক্ষেত্রেই—তা সে ছাত্র-আন্দোলনেই হোক অথবা স্ত্রীস্বাধীনতা-আন্দোলনেই হোক। এই ধর, মেয়েরা যখন তাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে, তাদের ধারণা তারা মেয়ে, ছেলেদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে। "আমরা নারী, তোমরা পুরুষ, তোমরা সব রকম সুযোগ ও অধিকার ভোগ করছ, আমাদের তা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছ, আমরা সেসব সুযোগ ও অধিকার চাই, আমরা তা দাবি করছি।" যুব-আন্দোলনেও তরুণেরা বলে: যত ক্ষমতা বৃদ্ধেরা ভোগ করছে—সম্মান, পদমর্যাদা, তা চলবে না। বুড়োদের সঙ্গে আমরাও তার ভাগ চাই। মা বলেন, "না, ওটি ঠিক মনোভাব নয়।" তোমাকে একটু আসন পরিবর্তন করতে হবে, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে। ঝগড়া করতে যাওয়া, লড়াই করতে যাওয়া অর্থ তোমরা নিজেদের স্বতন্ত্র জীব মনে কর—স্বতন্ত্র ক্ষমতা, স্বতন্ত্র সামর্থ্য, স্বতন্ত্র বিধিবিধান ইত্যাদি সহ। কিন্তু সবার আগে তোমাকে বিবেচনা করতে হবে তোমরা সকলে দুই পক্ষই মানুষ, দুটি বিভিন্ন জীব নও। ইদানীং এটা কিছু কিছু স্বীকৃত হচ্ছে তবু সেটা যথেষ্ট নয়, মা বলেন। আমরা যদি মানুষ হয়েই তুষ্ট থাকি, নিছক মানুষী জীব, তাহলে এই বিভেদ বারেবারেই মাথা তুলবে—সামান্য বিভেদ নয় গুরুতর বিভেদ সব। মানুষী প্রকৃতিই গড়া এই সব বিভেদ নিয়ে, সংস্কৃতি ও সভ্যতা এদেরই একটা আপোষ বই আর কিছু নয়। ফল হয়েছে সমাধানের জন্য আমরা খুব বেশিদূর এগোইনি। একটা গভীরতর সত্য আবিষ্কার করতে হবে, একটা উর্ধ্বতর এবং আরও শক্তিধর সত্য। আমাদের উঠে দাঁড়াতে হবে একটা উচ্চতর স্তরে—মা সর্বদাই বলতেন, সত্যে—তোমার অন্তরাত্মার সত্যে। তোমার আত্মার সত্যের কাছে, তোমার আত্মার সত্যে তুমি পুরুষও নও, নারীও নও, তুমি যুবাও নও, বৃদ্ধও নও—ঘন কুমার উত বা কুমারী ঘন জীর্ণা... ও সব তুমি কেবল বাহ্যরূপে, তুমি এসবের অধিক কিছু কিংবা এসব থেকে স্বতন্ত্র কিছু।

তোমাকে উঠে দাঁড়াতে হবে তোমার অন্তরাত্মায়—এই শিক্ষাটিই মা দিতে চেষ্টা করছিলেন খেলার মাঠের শিক্ষাধারায়। যতদিন তুমি সাধারণ চেতনায় রয়েছ—যে চেতনা

প্রতিষ্ঠিত তোমার দেহের চেতনায় এবং সেখান থেকে সবকিছু দেখছ, ততদিন তোমার জীবনও গড়ে উঠবে দেহের চেতনা হতে সৃষ্ট ধরনে। এবং সেই ধরনে জীবন এগিয়ে চলতে পারে একমাত্র বিভেদ ও স্বাতন্ত্র্যের মধ্য দিয়ে, বৈপরীত্য ও পরস্পরবিরোধিতার সাহায্যে সংঘাত ও বিরোধের আশ্রয়ে। যতদিন তুমি এই অভ্যস্ত আসনটি আঁকড়ে থাকবে, ততদিন এমনই হবে; এর থেকে আরোগ্যের পথ আমূল মুক্তি তা হল তোমার স্থান অর্থাৎ চেতনার প্রতিষ্ঠাভূমি পরিবর্তন করা। পায়ের উপর না দাঁড়িয়ে মাথায় ভর করে দাঁড়াতে হবে, তখন তুমি দেখতে পাবে তোমার চলবার পথ সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে নয়, সহযোগিতার মধ্য দিয়ে, বিচ্ছেদের মধ্যে নয়, একত্বের মধ্যে, বিভেদে নয়, একাত্মতায়। যতক্ষণ তুমি নিছক মানুষী জীব, এ আত্মার একাত্মতা পেতে পার না। তোমাকে এই পার্থক্যই ভুলতে হবে...নাম্বের খেলার মাঠের ক্লাসে আলোচনার সময় কেউ একজন মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল এই যে মূলগত পার্থক্য—একজন পুরুষ, অন্যজন নারী—এ কেমন করে ভোলা যায়? মা উত্তরে বললেন কি করে এমন কথা বল তুমি? দেখ, আমি যখন তোমার সঙ্গে কথা বলি তুমি কি মনে কর যে আমি সব সময় তোমাকে মেয়ে মনে করে সেই মত কথা বলছি? মা যোগ দিতে পারতেন "আর যখন তোমার সঙ্গে কথা বলি তখন একজন পুরুষের সঙ্গে কথা বলি?" এই প্রসঙ্গে আমি আমার নিজেকে নিয়ে একটা ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ করতে পারি। একবার একজন মাকে জানাল যে তারা আমার জন্মদিন—বোধহয় অশীতিতম জন্মদিন হবে—পালন করতে চায় খুব সুন্দর করে অর্থাৎ মহা-সমারোহে। মা গর্জন করে উঠেছিলেন "না, না, তোমরা আমার কাজ পণ্ড করছ। আমি সর্বদা চেষ্টা করছি তাকে তার বয়সের কথা ভুলিয়ে দিতে, আর তোমরা কি না তার বয়সের উপরই জোর দিচ্ছ।" বয়সও একটি বস্তু যা ভুলে যেতে হবে। জন্মদিন পালন অর্থ জীবনে বৎসরের প্রগতি রেকর্ড করা, কেমন করে বৎসরের পর বৎসর ধরে এগিয়ে চলেছি, কেমন করে বুড়ো হচ্ছি...না, তা নয়, এর উদ্দেশ্য আন্তর সত্তায় ও চেতনায় কি উন্নতি হচ্ছে তাই লক্ষ্য করা। প্রতিটি জন্মদিন হচ্ছে তোমার চেতনার অগ্রগতির পরিমাপ চিহ্ন, তোমার পাকাচুলের পরিমাপ নয়। তোমার অন্তরাত্মার স্পর্শ তোমাকে শুধু সত্যকার আন্তর গতিবিধির ক্ষেত্রে ঠিক ঠিক চলবার অনুপ্রেরণা দেবে না, তোমাকে পরিচালিত করবে সঠিক শারীর অনুশীলনেও এবং তা ঠিক ভাবে করতেও। শিখতে হবে তোমার অন্তরে অন্তরাত্মায় ফিরে যাওয়া, তখন দেখবে সেখানে পাবে তুমি যা-কিছু পাওয়ার যোগ্য: স্বাধীনতা, আনন্দ, সম্পত্তি এমনকি অজ্ঞাতপূর্ব সামর্থ্য।

বাইরে থেকে যারা আসে তারা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করত, এমনকি এখনও করে—দেশের জন্য, পৃথিবীর জন্য আশ্রম কি করছে? তোমাদের কাজ মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে মাত্র নিয়ে, এর কোন সার্থকতা আছে? মা শুধু বলতেন: "আমি এমন কিছু করছি যা পৃথিবীর অন্য কোথাও করা হয় না, তা হল আমার ছেলেমেয়েদের অন্তরাত্মাকে জাগিয়ে তোলা, একমাত্র এই আত্মাই রক্ষা করতে পারে আর কোন কিছু নয়। বাইরের লোকেদের আমরা বলি যদি তুমি এখানে আস, দেখবার চোখ নিয়ে এস, দেখ, দেখ এখানকার মানুষদের অন্তরাত্মাকে। তারা কি শিখছে বা কি করছে বা কি বলছে তা দেখো না, তাদের অন্তরে দেখ, দেখ তাদের অন্তরের গভীরে রয়েছে কি বস্তু। এখনও আমি বলি, "মা রয়েছেন তোমাদের অন্তরে,

তাঁর কাজ বন্ধ হয়নি। বরং তাঁর কাজের গতি যতদূর সম্ভব জীবন্ত ও সবল, তার ফলাফল ক্রমেই অধিক হতে অধিকতর স্বচ্ছ ও প্রকট হয়ে উঠবে।

আমি সংক্ষেপে আবার বলি : আত্মা ছেলেও নয় মেয়েও নয়, বৃদ্ধও নয় ; মানুষী দেহের বরং বলি পশুদেহের বৈশিষ্ট্য সব তার নয় ; তার অর্থ নয় তার দেহ নেই, তা বাস্তবিক বাস্তীয় ধোঁয়াটে কিছু। মোটেই নয়, আত্মারও দেহ আছে, তার নিজস্বতা স্থূল দেহের মত সুপ্রকট, সুনির্দিষ্ট, এমনকি তার একটা জড়দেহই রয়েছে তবে সে জড় ভিন্ন পর্যায়ের। পশ্চিমের মনীষীরা বলতে শুরু করেছেন না, এক অজড় জড়ের কথা অর্থাৎ নেতি-জড়ের (anti-matter) কথা ? সেই অন্তরাত্মার দেহ,এখনও তুমি ধারণ করে আছ তোমার জড়দেহের অন্তরে। তুমি তাকে দেখতে পার, বাহ্যদেহের মতই জীবন্ত, সুনির্দিষ্ট অনুভব করতে পার। তোমার মধ্যে যা তাকে ধরে আছেন, মায়ের সংস্পর্শের মাধ্যমে তার সংস্পর্শে আসতে পার তুমি। মাকে ভালবাস, তাঁর সঙ্গে এক হয়ে ওঠ, তুমি আবিষ্কার করবে এবং হয়ে উঠবে তোমার এই জীবন্ত আত্মাই।

দানধর্ম

শ্রীমা

সব থেকে সাধারণ অর্থে, দানধর্মের সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে যার যা অভাব তাকে তাই দেবার ক্রিয়াটি।

অর্থাৎ, শেষ বিশ্লেষণে দাঁড়ায়, প্রত্যেকটি জিনিস তার যথাযথ স্থানটিতে স্থাপন করা, যার ফল হবে পৃথিবীতে ন্যায়ধর্মের প্রতিষ্ঠা।

তত্ত্বটি হল এই, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দানধর্মকে মনে করা যেতে পারে সেই পথ বলে যা ন্যায়ধর্মের অভিমুখে অনিশ্চিত পদে এগিয়ে চলার সময় মানুষের অনুসরণ করা উচিত।

কারণ, বিবর্তনের বর্তমান অবস্থায়, মানুষ তার পার্থিব অধিষ্ঠানে ন্যায়ধর্ম উপলব্ধি করতে শুধু নয়, তার সারমর্ম যথাযথ অবধারণেও অক্ষম। এই অক্ষমতার অন্তত স্বীকৃতি হল দানশীলতা।

বস্তুত, সত্যকার ন্যায়ধর্ম যা সুসঙ্গতি, সুসাম্য এবং পূর্ণ শৃঙ্খলার সঙ্গে এক অভিন্ন, সে-সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান অজ্ঞতার লক্ষণ, আমাদের পক্ষে সব থেকে সুবুদ্ধির কাজ হল প্রেমের পথ, দানধর্মের পথ নেওয়া যে দানধর্ম হঠ-বিচারে অনিচ্ছুক।

দানশীলতাকে যারা সর্বদাই ন্যায়ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড় করায় তাদের মনোভাবের স্বপক্ষে যুক্তি হল এই। তাদের চোখে ন্যায়ধর্ম হল নির্মম কঠোর, আর দানশীলতা চাই তার অত্যধিক তীব্রতাকে হ্রাস করতে।

ভাগবত বিচার সম্বন্ধে তারা নিশ্চয়ই এ ধরনের কথা বলতে পারে না, কিন্তু, হ্যাঁ, তা বলতে পারে মানুষের কিংবা সমাজের বিচার সম্বন্ধে, যে স্বার্থপর বিচারের কাজই হল কম-বেশি ব্যাপক দলীয় স্বার্থকে রক্ষা করে চলা, আর আঁধার যতটা আলোর বিরোধী ততটাই সত্যকার ন্যায়বিচারের বিরুদ্ধে তা।

আমরা যখন তথাকথিত সভ্যদেশগুলিতে প্রবর্তিত বিচারব্যবস্থার কথা বলি, তাকে কঠোর ও নির্মম না বলে বলা উচিত উদ্ভট ও অন্ধ, তার অন্ধ ভণ্ডতায় দানবীয়।

তাই তার মারাত্মক সব ফলাফলের পর্যাপ্ত প্রতিবিধান আমরা কখনই করতে পারি না, আর সেখানেই দানধর্ম সাফল্যের সঙ্গে নিজেকে কাজে লাগাবার একটা সুযোগ পায়।

কিন্তু এটি হল প্রশ্নটির একটি দিক মাত্র, এবং আমাদের আলোচ্য বিষয়টির আরও গভীরে প্রবেশ করবার আগে আমি তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে অন্যান্য মানুষী ক্রিয়াকলাপের মতই দানধর্মও চারটি স্বতন্ত্র ধারা অনুসারে প্রযুক্ত হয় এবং তার ক্রিয়া সর্বাঙ্গীণ ও সত্যসত্যই কার্যকরী হতে গেলে তাদের প্রয়োগ হতে হবে যুগপৎ। আমি বলতে চাই যে কোন দানধর্মই পূর্ণাঙ্গ হয় না যদি তা সেই একই সঙ্গে বস্তুগত, বুদ্ধিগত, নীতিগত বা অধ্যাত্ম এবং সর্বোপরি প্রেমাভিষিক্ত না হয়, কারণ দানধর্মের সারবস্তুই হল প্রেম।

বর্তমানে দানধর্ম বিবেচিত হয় প্রায় পুরোপুরি বহিরঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, আর শব্দটি, জীবনে বঞ্চিত যারা তাদের মধ্যে নিজের সম্পদের কিছু অংশ ভাগ করে দেওয়ার সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা এখনই দেখব যে শুধুমাত্র বস্তুগত ক্ষেত্রে নিবদ্ধ রাখলেও এই ধারণা কত হীন।

দানধর্মের অপর তিনটি ক্রিয়াধারা সুন্দরভাবে মোটামুটি বর্ণিত হয়েছে শিষ্যদের কাছে প্রদত্ত বুদ্ধদেবের এই উপদেশের মধ্যে :

"যাও, করুণায় পরিপ্লুত হৃদয় নিয়ে ; বেদনার্দীর্ণ এই জগতের মধ্যে হয়ে ওঠ আচার্য, আর যেখানেই অজ্ঞানের অন্ধকার রাজত্ব করছে, সেখানে জ্বালিয়ে ধর একটি মশাল।"

যারা কম জানে তাদের উপদেশ দেওয়া, যারা অধর্মে লিপ্ত তাদের ভ্রান্তি থেকে বেরিয়ে আসবার শক্তি দেওয়া, যারা আর্ত তাদের সান্ত্বনা দেওয়া, এ সমস্তই ঠিকভাবে বুঝলে দান-ধর্মেরই সব বৃত্তি।

তাহলে, ব্যষ্টিগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দানধর্ম হল প্রত্যেকের পক্ষে তার সামর্থ্যের অনুপাতে অন্যদের যা প্রয়োজন তা দেওয়া।

এ থেকে আমরা দুটি জিনিস লক্ষ্য করতে পারি।

প্রথমটি হল, তোমার অধিকারে যা নেই তা তুমি দিতে পার না।

বস্তুগতভাবে এটা এত সুস্পষ্ট যে এ সম্বন্ধে বেশি কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বুদ্ধির ক্ষেত্রে, অধ্যাত্মের ক্ষেত্রে, এই একই নিয়ম খাটে।

বাস্তবিক, যা তুমি নিজে জান না তা অপরকে শেখাবে কি করে ? নিজে প্রজ্ঞার পথে না চললে সে পথে তাদের নিয়ে যাবে কি করে যারা শক্তিহীন ? নিজের ভিতরে প্রেম না থাকলে তা বিতরণ করবে কি করে ?

আর পরম দানশীলতা, যা হল পার্থিব পুনরুজ্জীবনের মহাব্রতে অর্ঘও আত্মদান, তা বলতে প্রথমেই বোঝায় যে তুমি যা দিতে চাও তা দেবার ক্ষমতা তোমার আছে, অর্থাৎ, তুমি স্বরাট হয়ে উঠেছ।

যার রয়েছে পূর্ণ আত্মসংযম সে-ই শুধু পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে মহাব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে কারণ একমাত্র সে-ই জানে যে কোন বিপরীত টান, কোন অপ্রত্যাশিত আবেগই আর আসবে না তার কর্মে বিঘ্ন ঘটাতে, তাকে অন্তর্দ্বন্দ্বে ফেলে তার প্রয়াসকে ব্যাহত করতে।

এই তথ্যটির মধ্যেই রয়েছে সেই প্রাচীন প্রবাদটির যৌক্তিকতা যা বলে "সুনিয়ন্ত্রিত দানশীলতার সূচনা হয় নিজেকে দিয়েই।"

এই সদুপদেশটি যতরকম অহংভাবকে সহজ করে তোলে বলে মনে হয়, তবুও যে এটি ভালভাবে বোঝে তার পক্ষে এটি হল এক মহা জ্ঞানের প্রকাশ।

যেহেতু দানশীল লোকেরা এই নীতি অনুযায়ী চলতে ব্যর্থ হয়, তারই জন্য তাদের প্রচেষ্টা সব প্রায়ই নিষ্ফল থেকে যায়, তাদের শুভবুদ্ধি প্রায়শঃই বিকৃত হয়ে পড়ে তার ফলাফলে, আর, পরিমাণে, তারা এ ধরনের দানধর্ম ত্যাগ করতেই বাধ্য হয় যা ঠিকভাবে প্রয়োগ না করার দরুণ শুধু বিশৃঙ্খলা, বেদনা আর বঞ্চনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এই নীতিবাক্যটির স্পষ্টতঃই ভুল অর্থ করা হয় যখন বলা হয় "আগে তো সঞ্চয় করি ধন, বুদ্ধি, স্বাস্থ্য, প্রেম, যতরকমের শক্তিসামর্থ্য, তারপর সেসব বিতরণ করব।"

কারণ, বস্তুগত দিক থেকে কখন ঘটবে সঞ্চয়ের সমাপ্তি ? যে সঞ্চয়ের অভ্যাসের বশে পড়ে, সে দেখে যে তার সঞ্চয় কখনই যথেষ্ট নয়।

এমনকি এ বিষয়ে আমি এও লক্ষ্য করেছি যে, বেশির ভাগ লোকের ক্ষেত্রেই বদান্যতা রয়েছে মনে হয় তাদের আর্থিক সঙ্গতির বিপরীত অনুপাতে।

শ্রমজীবী, অভাবগ্রস্ত এবং যত ভাগ্যহীনদের ক্রিয়াধারা পর্যবেক্ষণ করে আমি এ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে বাধ্য হয়েছি যে সৌভাগ্যশালীদের চেয়ে দরিদ্রেরাই অনেক বেশি দানশীল, তাদের আর্ত সঙ্গী-সাথীদের সাহায্যে এগিয়ে যেতে অনেক বেশি প্রস্তুত। যত কিছু দেখেছি তার বিস্তারিত আলোচনা করবার মত সময় আমার নেই, কিন্তু তোমাদের স্পষ্ট বলছি যে তা শিক্ষাপ্রদ। সে যাই হোক, আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে ধনীরা যদি তাদের যা আছে সেই অনুপাতে গরীবরা যতটা দেয় ততটা দিত, তাহলে শীঘ্রই এই পৃথিবীতে আর একটি লোকও উপবাসী থাকত না।

তাই, অর্থ যেন কেনে আনে আরো অর্থ, আর, আগে তো সম্পদ সংগ্রহ করি পরে বিতরণ করব—এমন ইচ্ছার থেকে ক্ষতিকর আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু আবার, হঠকারী অমিতব্যয়িতার চেয়ে ক্ষতিকরও আর কিছু নেই, তাতে, বিচার-বিবেচনার অভাবে, যথেচ্ছ টাকা ছড়ানো হয় অথচ কারোই উপকারে আসে না।

নিরাসক্তি, যা হল সত্যকার দানধর্মের অন্যতম বিধি, তার সঙ্গে আমরা যেন অলস শিথিলতা থেকে আসে যে উদ্বেগহীনতা তাকে কখনও গুলিয়ে না ফেলি।

সুতরাং আমরা যাকিছু পেতে বা অর্জন করতে পারি তা যেন সদ্ব্যবহার করতে শিখি, আমাদের ব্যক্তিত্বকে যথাসম্ভব কম জাহির ক'রে ; আর সর্বোপরি আমরা যেন ভুলে না যাই যে দানধর্মকে বস্তুগত সাহায্যের ক্ষেত্রেই আবদ্ধ করে রাখা উচিত নয়।

শক্তির ব্যাপারেও সত্য। অসম্ভব, কারণ গ্রহণসামর্থ্য আসে ব্যয়ের অনুপাতে যত বেশি সার্থকভাবে ব্যয় করা যায়, তত বেশি হওয়া যায় গ্রহণ-সমর্থ। তাই বুঝি ততখানিই অর্জন করা যায় যে অনুপাতে তা কাজে লাগান হয়। কিন্তু পরিণাম বুদ্ধিগত শক্তিকে অতিব্যক্ত করবার জন্য আমরা গঠিত, কিন্তু আমরা যদি মনের দিক দিয়ে আমাদের উন্মুক্ত করে তুলি, যদি আমাদের মস্তিষ্ককে কাজে লাগাই, যদি নিয়মিত মননের অভ্যাস করি এবং সর্বোপরি, যত সামান্যই হোক, যদি আমাদের প্রয়াসের ফলভাগী করে তুলি অন্য, তাহলে আরও অধিক পরিমাণে নিয়ত গভীরতর ও উচ্চতর বুদ্ধিগত শক্তি গ্রহণ করবার সামর্থ্য আমাদের জন্মাবে। প্রেম ও আধ্যাত্মিকতার বেলাতেও সেই একই কথা।

আমরা যেন বারিবাহিকার মত তারা যা পেয়েছে তা যদি অবাধে বয়ে চলতে না না দিই তাহলে তারা যে অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে এবং আর কিছু গ্রহণ করতে পারবে না শুধু তাই নয়, তাদের যা আছে তাও নষ্ট হয়ে যাবে। বিপরীতপক্ষে, আমরা যদি প্রাণের, বুদ্ধির ও অধ্যাত্মের শক্তিরাজির এইসব স্রোতধারাকে অজস্রধারে বয়ে যেতে দিই, নিজেদের নির্ব্যক্তিক করে আমরা যদি আমাদের ক্ষুদ্র ব্যষ্টিকে বিপুল বিশ্ব-প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করে ধরতে জানি, তাহলে আমরা যা দেব তার শতগুণ আমরা ফিরে পাব।

বিপুল বিশ্ব-প্রবাহ থেকে কেবল করে নিজেকে বিচ্ছিন্ন না করা যায়, যে শৃঙ্খলকে কিছুতেই ছিন্ন করা চলবে না তার একটি কলয় হয়ে ওঠা যায়, তা জানাই হল দানধর্মের সত্যকার বিজ্ঞান, তার যেন চাবিকাঠি।

দুর্ভাগ্যবশতঃ, একটি ভ্রান্তি খুবই ব্যাপক যা এই জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের পথে গুরুতর বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

এই ভ্রান্তির উৎস হল সেই বিশ্বাস যে বিশ্বের যেকোন জিনিসই আমার নিজস্ব সম্পত্তি হতে পারে। সবকিছুই সবার, আর "এটি আমার"—একথা বলা বা ভাবা অর্থই হল এক বিচ্ছিন্নতা বা বিভাগের সৃষ্টি করা বাস্তবে যার অস্তিত্বই নেই।

সবকিছুই সবার, এমনকি যে পদার্থ দিয়ে আমরা গঠিত তাও, যা হল নিরন্তর চলমান একদল পরমাণুর এক ঘূর্ণি যা সাময়িকভাবে পড়ে তোলে আমাদের এই দেহ তার মধ্যে চিরতরে বাঁধা না থেকে, আর যা আগামীকাল গড়ে তুলবে আর একটি দেহ।

এটা সত্য যে কিছু লোক বিপুল পার্থিব সম্পদের অধিকারী। কিন্তু বিশ্ব-বিধানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে গেলে তাদের ভাবা উচিত যেন তারা সেই সম্পত্তির রক্ষক বা তত্ত্বাবধায়ক মাত্র। তাদের জানা উচিত যে এই ধনসম্পদ তাদের রক্ষণে রাখা হয়েছে যাতে তারা সর্বজনের সর্বোত্তম স্বার্থে তা কাজে লাগাতে পারে।

জীবনের পথে যেসব ভাগ্যহীনেরা আমাদের সামনে এসে পড়ে, আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা আছে তার সামান্য কিছু তাদের দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ দানশীলতার যে সংকীর্ণ ধারণা তা থেকে আমরা অনেকদূরে এসে পড়েছি! আর, বস্তুগত সম্পদ সম্বন্ধে যা বলি, আধ্যাত্মিক সম্পদ সম্পর্কেও তাই বলতে হবে।

যারা বলে "এই ভাবটি আমার" এবং অপরকে তার লাভভাগী করে মনে করে যেন তারা হল খুবই বদান্য, তারা নির্বোধ।

ভালোর উৎস সবারই, বুদ্ধি-শক্তি একটা বিশ্বগত শক্তি।

একথা সত্য যে কিছু লোক এই ভাবরাজ্যের সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপন এবং সচেতন মস্তিষ্ক-ক্রিয়ার ভিতর দিয়ে তা অভিব্যক্ত করার ব্যাপারে অন্যদের চেয়ে অধিকতর সমর্থ। কিন্তু তা তাদের পক্ষে শুধু এক উপরি দায়িত্ব যেহেতু তারা এইসব ধনসম্পদের অধিকারী, তারাই এর ব্যবস্থাপক এবং তাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সর্বাধিক লোকের মঙ্গলের জন্য তা কাজে লাগান হয়।

এই একই কথা অন্যান্য বিশ্বগত শক্তির পক্ষেও প্রযোজ্য। সবকিছুর সঙ্গে সকলের সঙ্গে পূর্ণ মিলনের বোধ পূর্ণ অভেদজ্ঞানই সত্যকার দানধর্মে পৌঁছে দিতে পারে।

কিন্তু প্রয়োগবিধির প্রসঙ্গে ফিরে আসতে গেলে, দানধর্মের পূর্ণ ও সার্থক অভিব্যক্তির পথে কিন্তু আরও একটি গুরুতর বাধা রয়েছে।

বেশির ভাগ লোকের কাছেই দানধর্ম হল যে কেউকে যে কোন জিনিস দেওয়া, এমনকি যাকে দেওয়া হচ্ছে তার প্রয়োজন আছে কিনা তাও না জেনেই। এমনি করে দানধর্মকে ভাবপ্রবণ দুর্বলতা আর অযৌক্তিক অপব্যয়ের সমার্থক করে তোলা হয়।

এই গুণটির সারতত্ত্বের এর থেকে বেশি বিপরীত আর কিছু নেই।

বাস্তবিক যার যেটাতে প্রয়োজন নেই তাকে তা দেওয়া তার প্রয়োজনের জিনিসটি তাকে না দেওয়ার মতই দানশীলতার অভাবের পরিচায়ক।

আর একথা শারীরস্তরের বস্তুর ক্ষেত্রে যেমন মানসস্তরের বস্তুর ক্ষেত্রেও তেমনি প্রযোজ্য।

বস্তুগত ধনসম্পদের ত্রুটিপূর্ণ বিতরণের ফলে কোন কোন ব্যক্তির অধঃপতন ত্বরান্বিত করা যায়, কর্মপ্রচেষ্টায় উদ্দীপ্ত করে উন্নতির সহায় হবার পরিবর্তে তাদের অলসতায় প্রশ্রয় দিয়ে।

বুদ্ধিবৃত্তি আর ভালবাসার ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। কাউকে এমন সব জ্ঞান দেওয়া যা তার পক্ষে অতীব প্রবল, এমনসব চিন্তা যা সে আপন করে নিতে পারে না—এর অর্থ হল চিরতরে যদি না-ও হয় দীর্ঘকালের জন্য নিজে নিজে চিন্তা করবার সম্ভাবনা থেকে তাকে বঞ্চিত করা।

ঠিক তেমনি কারো উপর এমন স্নেহ, এমন ভালবাসা চাপিয়ে দেওয়া যার প্রয়োজনই সে অনুভব করে না—এর অর্থ প্রায়ই হল তার পক্ষে দুর্বহ এক ভার তাকে বইতে বাধ্য করা।

এই ভুলের পেছনে রয়েছে দুটি প্রধান কারণ যার সঙ্গে অন্য সবগুলি সংযুক্ত হতে পারে—সে দুটি হল অজ্ঞান ও অহংকার।

কোন একটি কাজ শুভপ্রদ কিনা এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হলে তার আশু ও সুদূর পরিণাম সব জানতে হবে, আর দানধ্যানও এই নিয়মের বাইরে পড়ে না।

ভাল করতে চাওয়াই যথেষ্ট নয়, তা জানতেও হবে।

সত্যকার ভাব থেকে বিচ্যুত এবং ফলাফলের দিক দিয়ে পুরোপুরি মিথ্যা হয়ে গিয়েছে যে দানধর্ম তার নামে জগতে কত অমঙ্গলই না করা হয়েছে!

আমি তোমাদের এমন বহু দৃষ্টান্ত দিতে পারি যেখানে গভীরভাবে বিবেচনা, বিচারণা, সম্যক অবধারণা, স্বচ্ছদৃষ্টি ছাড়া সম্পন্ন করার ফলে অনেক দানধ্যান পরিণামে হয়েছিল খুবই সর্বনাশা।

আর-সব জিনিসের মতই দানধর্মকেও হতে হবে আমাদের এক সচেতন ও যুক্তিসম্মত ইচ্ছার ফল, কারণ আবেগ হল ভ্রান্তির এবং সর্বোপরি অহংকারেরই নামান্তর।

দুঃখের বিষয়, এ সত্য স্বীকার করতেই হবে যে একেবারে নিঃস্বার্থ দানশীলতা খুবই বিরল।

আমি সে ধরনের দানশীলতার কথা বলতে চাই না যা কোন দেবশক্তির অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায় বা চিরন্তন সুখের অধিকারী হবার উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে।

এই একেবারে হীন ধরনের দান হল সব থেকে খারাপ ব্যবসাদারী আর একে দানশীলতা নাম দিলে সে-নামকে কলঙ্কিতই করা হয়।

কিন্তু আমি বলতে চাই সেই দানধ্যানের কথা, যা লোকে করে তাতে তৃপ্তি পায় বলে, আর যা এখনও সব রকম দয়দ বা বিদ্বেষ, অনুরাগ বা বিরাগের বশীভূত।

এমন দানশীলতা খুবই বিরল যা বিনিময়ে কৃতজ্ঞতাও চায় না, আর এ ধরনের প্রত্যাশা যে কোন কাজকে তার পূর্ণ মূল্য দেবার পক্ষে প্রয়োজনীয় নিরপেক্ষ অলোকদৃষ্টিকে সর্বদা ক্ষুণ্ণ করে দেয়।

আর সর্বত্র যেমন দানধর্মের ক্ষেত্রেও তেমনি রয়েছে এক বিজ্ঞতা যা তার অপচয়কে স্বল্পতম করে তুলতে পারে।

তাই সত্যসত্যই দানশীল হতে গেলে হতে হবে নৈর্ব্যক্তিক।

আর আমরা আবার দেখতে পেলাম যে মানবপ্রগতির সকল ধারাই শেষে একই প্রয়ো-

জনে গিয়ে পৌঁছল পরিপূর্ণ আত্মজয়, নবজীবনে সত্যকার জীবনে জন্ম নেবার জন্য অহং-এর আত্মবিলোপ।

যে পরিমাণে আমরা সবকিছুকেই নিজের স্বার্থদৃষ্টি দিয়ে দেখার অভ্যাস থেকে মুক্ত হই সেই পরিমাণে আমরা এমন এক দানধর্মকে প্রয়োগ করতে পারি যা সত্যসত্যই ফলদায়ী, যা প্রেমেরই সার্থক।

তাছাড়া, এমন এক উচ্চতা রয়েছে যেখানে সকল সদ্‌গুণ পরস্পর পুনর্মিলিত হয় এবং পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে ওঠে : প্রেম, দয়া, করুণা, আনুকূল্য, দানধর্ম—এ সবই মূলতঃ এক অভিন্ন।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দানধর্মকে গণ্য করা যেতে পারে এক বাহ্য, প্রত্যক্ষ, ব্যবহারিক ক্রিয়া বলে যে-ক্রিয়া নিরূপিত হয় প্রেমধর্মের সক্রিয়তার ফলে।

কারণ এমন এক শক্তি আছে যা সকলকে সর্বদা দান করা যায়, যদি তা দেওয়া যায় মন থেকে নৈর্ব্যক্তিকরূপে সে শক্তিটি হল প্রেম, সেই প্রেম, যার মধ্যে বিধৃত রয়েছে জ্যোতি ও জীবন, অর্থাৎ বুদ্ধি, স্বাস্থ্য ও প্রস্ফুরণের সকল সম্ভাবনা।

হাঁ, এমন এক সুবহান দানশীলতা আছে যা আসে সুখী হৃদয়, প্রসন্ন চিত্ত হতে।

যিনিই আন্তর শান্তি অর্জন করেছেন তিনি যেখানেই যান সর্বত্র হন মুক্তির বোধক, আশা ও আনন্দের বাহক। দীন আর্ত মানবজাতির পক্ষে ওইটিই কি সবচেয়ে প্রয়োজনীয় নয়?

হাঁ, এমন সব মানুষ আছেন যাঁদের সকল চিন্তাই হল প্রেম, যাঁরা ছড়িয়ে দেন প্রেমের দীপ্তি, আর এইসব সত্তার শুধুমাত্র সান্নিধ্যই হল এমন এক দানধর্ম যা অন্যসবের চেয়ে অধিকতর সক্রিয়, অধিকতর সত্যময়।

তাঁরা কোন কথা না বললেও, তাদের কোন ভঙ্গি ব্যতিরেকেই পীড়িতেরা হয় নিরাময়, অশান্তেরা শান্ত, অন্ধরা হয় জ্ঞানদীপ্ত, দুষ্টেরা শিষ্ট, দুঃখীরা পায় সান্ত্বনা আর সকলেরই ঘটে সেই গভীর রূপান্তর যা তাদের সামনে খুলে দেবে নব নব দিগন্ত সব, অন্তহীন অগ্রগতির পথে নিঃসন্দেহে তাদের করাবে সুনিশ্চিত একটি পদক্ষেপ।

এইসব সত্তারা, যাঁরা প্রেমের বশে সবার জন্য নিজেদের বিলিয়ে দেন, সবার সেবক হয়ে ওঠেন, তাঁরাই হলেন পরম দানধর্মের জীবন্ত প্রতীক।

ভ্রাতৃবর্গ, এখানে তোমরা সবাই, যারা দানশীল হতে চাও, তারা কি এই ব্রতের সংকল্প প্রকাশ করতে আমার চিন্তার সঙ্গে তোমাদের চিন্তাকে মিলিয়ে ধরতে চাও না আমরা যেন তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণে প্রতিদিন আরও একটু বেশি করে সচেষ্ট হই যাতে জগতের বুকে তাঁদের মত জ্যোতি ও প্রেমের দূত হয়ে উঠি।*

* 'বুলেটিন' থেকে অনূদিত। অনুবাদক : শতদল

Our Homage to Sri Aurobindo and The Mother

Mitra Engineering & Construction Co.

(ENGINEERS OF REPUTE)

Phone 46-3957

Specialist in Insulation Work, Air Conditioning & Refrigeration, Electrical Engineers & Builders.

16/1, Chandranath Chatterjee Street
Calcutta—25

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field :
Sreepore Bagharghole
P.O. Bonhooghly, 24 Parganas

Head Office
34: 1, Puddapukur Road
Calcutta-20

Phone : 47-2869

With the best Compliments from :—

Ellora Enterprise

Paper & Board Merchants

57/2A, College Street
Calcutta-12

Phone: 34-3720

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরের প্রকাশিত পুস্তকাবলী

Tales of Prison Life	Sri Aurobindo	In Press
Words of Sri Aurobindo	1st Series	2·50
Words of Sri Aurobindo	2nd Series	4·00
	3rd	5·00
	4th ,,	5·00
যোগসাধনা ও যোগের উদ্দেশ্য	শ্রীঅরবিন্দ	১·৫০
শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর আশ্রম		২·০০
গীতার ভূমিকা	শ্রীঅরবিন্দ	২·৫০
মৃত্যু ও মৃত্যুর পরে	শ্রীঅরবিন্দ	০·৭৫
যোগসাধনার ভিত্তি	শ্রীঅরবিন্দ	৩·৫০
মানবজাতির ভবিষ্যৎ বিবর্তন	শ্রীঅরবিন্দ	৯·০০
মায়ের আলাপ	শ্রীমা	৩·০০
শিক্ষা	শ্রীমা	২·০০
শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর বাণী		২·০০
যোগসমন্বয় প্রসঙ্গ	অনির্বাণ	১৫·০০
মা কি বলেন	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৩·০০
শতাব্দীর প্রণাম		৩·৫০
স্মৃতির পাতা ১ম পর্যায়		৬·০০
স্মৃতির পাতা ২য় পর্যায়		৪·০০
শ্রীঅরবিন্দায়ন (সচিত্র শ্রীঅরবিন্দের জীবন বাণী ও সাধনা)	নীরদবরণ	৪·০০
শ্রীঅরবিন্দ-প্রসঙ্গ	দীনেন্দ্রকুমার রায়	১·৮০
শ্রীমা-প্রসঙ্গ	কে, আর, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার	২·৮০
শ্রীঅরবিন্দ—জীবন ও যোগ	প্রবোধকুমার সেন	৭·০০
বিশ্বমানবের এগিয়ে চলা	চারুচন্দ্র দত্ত	৩·৫০
কে এই মা ?	পশুপতি ভট্টাচার্য	৭·০০
দিব্য জীবনের সন্ধানে		৪·০০
শ্রীঅরবিন্দ ও মায়ের নূতন বার্তা	,, ,,	১·৫০
মা আজও আছেন	,,	৪·০০
শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্মযোগ	সুধা বসু	৫·০০
Sri Aurobindo on Man	D. P. Chattopadhyaya	1·80
শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ		৭·০০

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট

কলিকাতা–৭০০০৭৩

ফোন : ৩৪-২৩৭৬

আমার দৃষ্টিতে

শ্রীঅরবিন্দের দি লাইফ ডিভাইন

শম্ভু ভদ্রের অনুবাদ

প্রথম খণ্ড :	প্রথম চার অধ্যায়	দাম—	২·০০
দ্বিতীয় খণ্ড :	পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়		২·০০
তৃতীয় খণ্ড :	সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়		২·০০
চতুর্থ খণ্ড :	নবম ও দশম অধ্যায়		২·০০
পঞ্চম খণ্ড :	একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়		২·০০
ষষ্ঠ খণ্ড :	ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়		২·০০
সপ্তম খণ্ড :	পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ অধ্যায়		২·০০
অষ্টম খণ্ড	সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়		২·০০
	প্রথম খণ্ড থেকে অষ্টম খণ্ড একত্রে বাঁধাই		২০·০০

—প্রাপ্তিস্থান—

চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স

১-১-১ এ-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অথবা

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২